গাছপালা

রায়-সাহেব
শ্রীজগদানন্দ রায়
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্,
এলাহাবাদ

১৯২৯

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য আড়াই টাকা।

নিবেদন

ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কোনো বই বাংলা ভাষায় নাই। তাই বাংলা দেশেরই সাধারণ গাছপালার পরিচয় দিয়া বইখানি রচনা করিয়াছি। ইহাতে গাছের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহাদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই। বইখানি পড়িয়া যাহাতে ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, পুস্তক রচনার সময়ে সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। যাহাদের জন্য পুস্তকখানি লিখিলাম, তাহারা উহা পড়িয়া শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

পুস্তকের অধিকাংশ ছবিই শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র-কৃষ্ণ দেববর্ম্মা এবং অন্নদাকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। তা' ছাড়া স্যাক্‌স্ ও ষ্ট্রাস্‌বর্গার পুস্তক হইতে কতকগুলি ছবি গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদার মহাশয়দ্বয়ও কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে পুস্তকপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটিত। তাই এই সুযোগে ইঁহাদের সকলের নিকটে এবং প্রকাশক মহাশয়দিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
শান্তিনিকেতন
আশ্বিন, ১৩২৮।

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক

অপরাজিতা

গাছপালা

প্রথম কথা

রোজ ভোরে উঠিয়া আমরা ইট-কাঠ, ঘর-বাড়ী, কুকুর-বিড়াল, গাছপালা কত কি জিনিস যে দেখি, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে,—এই জিনিসগুলার সকলেই জ্যান্ত নয়। যাহারা কিছু খায় না, যাহারা আপনা হইতেই বড় হয় না এবং যাহাদের বাচ্চা হয় না, তাহারা জ্যান্ত নয়। যে-সব জিনিস জ্যান্ত নয় তাহাদিগকে জড় বলা হয়। ইট-পাথর, কাগজ-কলম, ছুরি-কাঁচি, শ্লেট্-বই, শিশি-বোতল, তেল-জল, —এই রকম সব জিনিসই জড়। ইহারা কিছু খায় না, গরু-বাছুরের মত বাড়ে না, ইহাদের বাচ্চাও হয় না। কিন্তু ছাগল-ভেড়া, কাক-শালিক, বিছে-ব্যাঙ, কুকুর-শেয়াল, আম গাছ, কাঁটাল গাছ, সে-রকম নয়। ইহারা খাবার খায়, একটু একটু করিয়া বড় হয়। তার পরে তাহাদের বাচ্চা হয়

এবং শেষে মরিয়া যায়। কাজেই, এগুলি জ্যান্ত। এই রকম জ্যান্ত জিনিসকে জীব বলা হয়।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমরা চারিদিকে রোজ যে-সব জিনিস দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে দুইটা দল আছে। এক দল জড় এবং আর এক দল জীব।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, আম গাছ, কাঁটাল গাছ ও বাগানের ফুল গাছদের বুঝি জীবন নাই, তাহারা বুঝি জ্যান্ত নয়। কিন্তু তাহা নয়—ইহারা তোমাদের পোষা কুকুরের বাচ্চাটির মতই জ্যান্ত। বাচ্চাটির কাছে এক বাটি দুধ রাখিলে সে চক্-চক্ করিয়া দুধটুকু খাইয়া ফেলে। গাছের কাছে এক থালা ভাত বা এক পেয়ালা দুধ রাখিলে সে তাহা সে-রকমে খায় না বটে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকার জন্য তাহার খাবারের দরকার হয়। তোমাদের বাগানের তরকারির গাছপালা দিন দিন কি-রকমে বাড়ে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? গাছপালারা শিকড় দিয়া, পাতা দিয়া মাটি ও বাতাস হইতে মনের মত খাবার চুষিয়া খায়, তাই তাহারা দিনে দিনে বড় হয়। তার পরে গরু-ঘোড়া, বিছে-ব্যাঙের যে-রকম বাচ্চা হয়, ইহাদেরো সে-রকম ছোটা ছোটো চারা হয়। শেষে তাহারা মরিয়া যায়।

তাহা হইলে দেখ, জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে গাছপালাদের এ-সব বিষয়ে বিশেষ তফাৎ নাই। কিন্তু অন্য বিষয়ে অনেক তফাৎ আছে। জন্তু-জানোয়ারদের যেমন চোখ, কান, পা আছে, গাছপালাদের সে-সব কিছুই নাই। তা-ছাড়া শরীরের

ভিতরকার যে-সব যন্ত্র দিয়া জন্তুদের জীবনের কাজ চলে, ইহাদের শরীরের ভিতরে ঠিক্ সে-রকম যন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই, গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারকে একই রকমের জীব বলা যায় না। তাই পণ্ডিতরা জন্তু-জানোয়ারদের প্রাণী নাম দিয়াছেন এবং গাছপালাদের উদ্ভিদ্ বলিয়াছেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, জীবদের মধ্যেও দুইটা দল আছে। এক দলের নাম প্রাণী এবং আরএকদলের নাম উদ্ভিদ্।

যাহা হউক, প্রাণীদের কোনো কথা এই বইয়ে বলিব না। উদ্ভিদ্রা অর্থাৎ গাছপালারা কি-রকমে জন্মে, কি-রকমে খায়, কি-রকমে তাহাদের ফুল-ফল হয়, সেই সব বিষয় একে একে তোমাদের বলিব। তোমাদের বাগানে কত ফুলের গাছ, কত ফলের গাছ, কত তরি-তরকারির গাছ রহিয়াছে। সেগুলিতে কত সুন্দর ফুল ফোটে, কত ভালো ভালো ফল ফলে। তাহারা কি-রকমে বাঁচিয়া থাকে, কি-রকমে ফুল ফোটায়, কি-রকমে ফল ধরায়,—এ-সব কথা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? চাল, দাল, তেল, তরি-তরকারি, কাঠ, কয়লা—সকল জিনিসই আমরা গাছপালার কাছ হইতে পাই। ইহাদের সুখদুঃখের এবং জীবনের কথা আমাদের জানা উচিত। প্রাণীদের যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, মশা, মাছি প্রভৃতি নানা জাতি আছে, গাছদের মধ্যেও সেই রকম নানা জাতি দেখা যায়। পৃথিবীতে মোট দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার রকমের গাছ আছে।

গাছ

গাছ বলিলেই বট, অশথ, তাল, বেল, খেজুর, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সবুজ রঙের গাছের কথা আমাদের মনে হয়। কিন্তু কেবল এগুলি লইয়াই গাছ নয়। গাছ যে কত রকম আছে, তাহা তোমরা গুণিয়াই শেষ করিতে পারিবে না। যাহার শিকড় নাই, পাতা নাই, এ-রকম গাছও হাজার হাজার আছে। ঝাউ গাছ, বট গাছ, কত বড় হয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় উঁচু না করিলে, এ-সব গাছের মাথা নজরে পড়ে না। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না, এ-রকম ছোটো গাছও অনেক আছে। সেগুলিকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। ফুল ফল বীজ অনেক গাছেরই হয়। কিন্তু যাহাদের ফুল হয় না, ফলও হয় না, এ-রকম গাছও শত শত আছে। তোমরা কেবল সবুজ রঙের গাছই দেখিতে পাও। ঘাসের রঙ্ সবুজ, ধানের ক্ষেতের রঙ্ সবুজ, আম কাঁটাল জাম নেবু সব গাছেরই রঙ্ সবুজ। যাহাদের গায়ে সবুজ রঙের একটুও ছাপ নাই, এ-রকম গাছও অনেক আছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই সব সৃষ্টি-ছাড়া গাছ বুঝি খুব দূরদেশের বন-জঙ্গলে হয়। কিন্তু তা' নয়, আমাদের দেশে, আমাদেরি চারি পাশে এই সব গাছ শত শত আছে। আমরা হয় ত এই সব গাছ পায়ে

মাড়াইয়াও চলি, তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না। তোমরা একে একে এই সব গাছের কথা জানিতে পারিবে।

যে-সব গাছের রঙ্ সবুজ, যাহাদের ফুল-ফল হয়, আমরা তাহাদের কথা প্রথমে বলিব। পণ্ডিতরা পৃথিবীতে এই রকম প্রায় এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ভিন্ন ভিন্ন গাছ দেখিতে পাইয়াছেন। এখনো খোঁজ করা শেষ হয় নাই। ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে, হয় ত আরো এক লক্ষ নূতন গাছের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সুতরাং, সব গাছের কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। যে-সব গাছ তোমাদের বাগানে বা বাড়ীর কাছের জঙ্গলে আছে, তাহাদেরি কতকগুলির পরিচয় দিব।

গাছের দেহ

তোমাদের পোষা বিড়ালটির নাম কি, তাহা জানি না। তোমরা হয় ত তাহাকে পুষি বা মেনি বলিয়া ডাকিয়া থাক। পুষির শরীরটা কি-রকম, জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা হয় ত চট্‌পট্ বলিয়া দিবে,—তাহার চারিখানা পা আছে, একটা মাথা আছে, এবং মাথায় দু'টা চোখ, দু'টা কান, একটা মুখ, একটা নাক আছে। তার পরে বলিবে,—তাহার পিছনে একটা লম্বা লেজ আছে। কোন্ কোন্ অঙ্গ লইয়া মানুষের দেহ হইয়াছে, তাহাও তোমরা জানো। কাগজে মানুষের একটা ছবি আঁকিয়া তোমরা তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া

দিতে পারিবে। কিন্তু কোন্ কোন্ অংশ লইয়া গাছের দেহ হইয়াছে, ইহা তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? বোধ হয় এ-সম্বন্ধে কোনো খোঁজই কর নাই। আজ এক সময়ে তোমাদের বাগানের আম গাছ, কাঁটাল গাছ, গোলাপ গাছ, তুলসী গাছ প্রভৃতি যে-কোনো গাছ লইয়া দেখিয়ো; দেখিবে, জন্তু-জানোয়ারদের শরীরে যেমন মাথা, ধড়, হাত, পা প্রভৃতি কতকগুলো অংশ আছে, ইহাদেরো শরীরে সেই রকম শিকড়, গুঁড়ি, পাতা, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি অনেক অংশ রহিয়াছে। এইগুলি লইয়াই গাছের শরীর।

জন্তুদের শরীরের ভিতরে যে হাড়-গোড়ের কাঠামো থাকে, তাহাই উহাদের দেহকে মাটির উপরে শক্ত করিয়া দাঁড় করায়। কেঁচো ও কৃমির শরীরে হাড় নাই, তাই তাহারা মাটির উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। গুঁড়ি ও শিকড় গাছদের হাড়-গোড়ের মতোই কাজ করে। মাটির খুব নীচে শিকড় চালাইয়া ইহাদের গুঁড়ি খুঁটির মতো শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, তার পরে তাহা হইতে কত ডাল, কত পাতা, কত ফুল-ফল জন্মিতে থাকে।

গাছের শিকড় কখনই মাটি ছাড়িয়া উপর দিকে বাড়ে না এবং তাহার গুঁড়িও কখনো উপর ছাড়িয়া মাটির নীচে নামে না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। তোমাদের বাগানে যে-সব গাছ আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়ো; প্রত্যেক গাছেই ইহা দেখিতে পাইবে। শিকড় নীচের দিকে বাড়ে বলিয়াই, গাছ

শক্ত হইয়া মাটির উপরে দাঁড়াইতে পারে এবং গুঁড়ি উপর দিকে বাড়ে বলিয়াই তাহারা এত লম্বা হইয়া পাতাগুলিকে রৌদ্রে ও বাতাসে মেলিয়া রাখিতে পারে।

তোমরা একটি ছোটো বিস্কুটের বাক্সে কিছু ভিজে মাটি রাখিয়া তাহাতে কয়েকটি মটরের বীজ পুতিয়া পরীক্ষা করিয়ো। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে দেখিবে, তাহার গুঁড়ি উপর দিকে বাড়িতেছে এবং শিকড় নীচের দিকে নামিতেছে।

গাছের আয়ু

মানুষ আশী-নব্বুই বৎসর বাঁচে। কেহ কেহ একশত বৎসরেরও বেশি বাঁচিয়াছে, শুনিয়াছি। কুকুর দশ বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। গরু কুড়ি-বাইশ বৎসরের বেশী বাঁচে না। ছাগল তেব বৎসরেই বুড়া হয় এবং তার পরেই মারা যায়। গাছ কত দিন বাঁচে, তোমরা বলিতে পার কি? ইহার ঠিক জবাব তোমরা দিতে পারিবে না, আমরাও দিতে পারিব না। এক-এক রকম গাছের এক-এক রকম পরমায়ু। হাজার দু'হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছে, এমন গাছ আফ্রিকা ও আমেরিকার জঙ্গলে অনেক রহিয়াছে। ঢাকা জেলায় গজারিয়া নামে যে গাছটি আছে, তা' নাকি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সময় হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, ইহার বয়স এখন সাত শত বৎসরেরও বেশি। লঙ্কা দ্বীপে

বুদ্ধদেবের একটি খুব পুরাণো ভাঙা মন্দির আছে, সেখানে নাকি একটি অশথ গাছ দু'-হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। সত্তর আশী বৎসর বাঁচিয়া আছে, এ-রকম তেঁতুল ও আম গাছ আমরা অনেক দেখিয়াছি। তিন চারি শত বৎসরের বট গাছ আমাদের দেশেই অনেক আছে। কাজেই, পোকা-মাকড়ের বা ব্যারামের উৎপাতে না মরিলে কত বয়সে গাছেরা বুড়ো হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না।

কোথায় কোন্ গাছটি কত দিন ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, আমাদের দেশের কেহই তাহার খবর রাখে না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকেরা তাহাদের গ্রামের কাছের বুড়ো গাছগুলি কতদিন বাঁচিয়া আছে, তাহার হিসাব রাখিয়াছে। ওয়েলবেক্ গির্জ্জার কাছে একটা দেড় হাজার বৎসরের ওক গাছ আছে। ডরসেট্ সায়ারের একটা ওক্ গাছের বয়স এখন অন্তত দুই হাজার বৎসর। সুতরাং বলিতে হয়, গাছের বয়সের সীমা ঠিক্ করা যায় না।

গাছ যে কত বড় হয়, ইহাও ঠিক করিয়া বলা কঠিন। আমরা একটা বড় শিমুল গাছ দেখিলে মনে করি, বুঝি ইহার চেয়ে বড় গাছ আর নাই। যে-সব গাছ পৃথিবীর মধ্যে বড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদের কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। ওয়েলবেক্ গির্জ্জার কাছের যে গাছটির কথা বলিলাম, তাহার গুঁড়িতে অনায়াসে আট হাত চওড়া এবং পাঁচ হাত উঁচু সুড়ঙ্গ করা যায় এবং সেই সুড়ঙ্গের ভিতর

দিয়া ঘোড়ার গাড়ি চালানো যায়। ডরসেট্ সায়ারের গাছটির গুঁড়িতে কোটর তৈয়ারি করিলে সেখানে সত্তর জন লোক অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, এই গাছের বেড় কত। ইংলণ্ডের বড় কবি মিল্টন প্রায় তিন শত বৎসর আগে নিজের হাতে যে তুঁত গাছটি পুতিয়াছিলেন, তাহা আজো জীবিত আছে। ইহাও একটা খুব বড় গাছ। আমেরিকায় একটা খুব বড় গাছ আছে। ইহার বেড় প্রায় চল্লিশ হাত। সে-গাছটি এখনো জীবিত রহিয়াছে।

কিন্তু কতকগুলি ছোট গাছ কত বড় হইবে এবং কত দিন বাঁচিবে তাহা আমরা আগে থাকিতেই বলিয়া দিতে পারি। মটর, সীম, জিনিয়া, দোপাটি, তিসি, ধান, গম, কুমড়া প্রভৃতি গাছ তোমরা সকলই দেখিয়াছ। এই গাছগুলি কখনই এক বৎসরের বেশি বাঁচে না। ইহাদের ফুল হইতে যে ফল হয়, তাহা পাকিয়া গেলেই গাছ মরিয়া যায়। এই সব গাছদের বর্ষজীবী গাছ বলা হয়। আম, কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় গাছের ডালপালা ও গুঁড়িতে যে শক্ত কাঠ থাকে, বর্ষজীবী গাছে তাহার নাম-গন্ধ থাকে না। তোমাদের বাগানের লাউ বা কুমড়ার গাছ পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহাদের ডালপালা কত নরম এবং শাঁস-ওয়ালা। এই সব গাছে কাঠ হয় না।

কেবল দুই বৎসর মাত্র বাঁচে এ-রকম গাছও অনেক আছে। কলা, মূলা প্রভৃতি গাছকে তোমরা দুই বৎসর

বাঁচিতে দেখিবে। আমরা বাগানের মূলা গাছগুলিকে মাঘ মাসেই উপ্‌ড়াইয়া ফেলি। তাই মনে হয় বুঝি, তাহারা এক বৎসর বাঁচে, কিন্তু সত্যই তাহা নয়। প্রথম বৎসরে শিকড়ে যে খাবার সঞ্চয় করিয়া রাখে, শীতপ্রধান দেশে দ্বিতীয় বৎসরে তাহা খাইয়া উহারা জীবিত থাকে। যে-সব গাছ দুই বৎসর বাঁচে তাহাদিগকে দ্বিবর্ষজীবী গাছ বলা হয়।

যাহা হউক, একবর্ষজীবী এবং দ্বিবর্ষজীবী গাছের সংখ্যা খুবই কম,—যাহারা অনেক বৎসর বাঁচে এই রকম গাছই বেশি। এই রকম গাছকে বহুবর্ষজীবী নাম দেওয়া যাইতে পারে।

শিকড়

মাটির তলায় গাছের শিকড় কি-রকম থাকে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি ? আমরা যখন তোমাদের মত ছোটো ছিলাম তখন জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম খাইয়া তাহার আঁটি আঙিনার কোণে মাটি চাপা দিয়া রাখিতাম। তার পরে আষাঢ় মাসে বৃষ্টির জল পাইয়া যখন আঁটি হইতে গাছ বাহির হইত, তখন গাছগুলি উপ্‌ড়াইয়া তাহার গোড়ার পুঁয়ে দিয়া বাঁশি তৈয়ার করিতাম। তোমরা এ-রকম আম পুঁয়ের বাঁশি বাজাও নাই কি ? তাহা হইতে পোঁ-পাঁ কত রকম রকম শব্দ বাহির হইত; বাড়ীর লোকে তাহাতে অস্থির হইয়া পড়িত। মা বলিতেন,—"আম-পুঁয়ে মুখে দিস্‌ না, আঁটির ভিতরে পুঁয়ে সাপ আছে।" ঠাকুর-মা অস্থির হইয়া বলিতেন —"ওরে আর বাজাস্‌ নে,—আম-পুঁয়ের শব্দে ঘরে মশা আসে।" কিন্তু বাঁশি থামিত না।

যাহা হউক, শিকড়গুলি মাটির তলায় কি-রকমে থাকে, আমরা আমের নূতন চারা উপ্‌ড়াইবার সময়ে প্রথমে দেখিয়াছিলাম। আমের আঁটি, তেঁতুল-বীচি, মটর বা অন্য কোনো বীজ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়ো এবং সেগুলি হইতে চারা বাহির হইলে, চারাগুলিকে সাবধানে মাটি হইতে উঠাইয়া

পরীক্ষা করিয়ো ; তাহা হইলে গাছের শিকড় মাটির তলায় কি-রকমে থাকে, তাহা বেশ দেখিতে পাইবে।
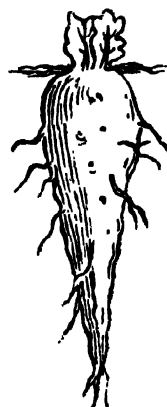
মূলা

আমের চারা

আমরা এখানে একটা ছোটো আমের চারার ও মূলার ছবি দিলাম। দেখ, একটা মোটা শিকড় গাছের গোড়া হইতে নীচের দিকে নামিয়াছে। এই প্রধান শিকড়টাকে মূল-শিকড় বলা হয়। সব গাছেরই মূল-শিকড়ের গা হইতে অনেক ছোটো ছোটো সরু শিকড় বাহির হয়। ছবিতে তোমরা তাহাও দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক, তোমরা চারিদিকে যে-সব গাছ দেখিতে পাও, তাহাদের অনেকেরি মূল-শিকড় আছে। কিন্তু যে গাছ

অনেক দিনের, তাহাদের মূল-শিকড় প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গাছ যেমন বুড়ো হইতে আরম্ভ করে, অমনি মূল-শিকড়ের গায়ের শিকড়গুলিই জোরালো হইয়া দাঁড়ায়, তখন কোন্‌টা মূল-শিকড় এবং কোন্‌টাই বা গায়ের শিকড় তাহা চিনিয়া লওয়া যায় না।

এখানে ধান-গাছের শিকড়ের একটা ছবি দিলাম। দেখ, আমের শিকড়ের মত ইহার মূল শিকড় নাই। ইহা দেখিলেই মনে হয়, কে যেন লম্বা চুল বা সূতার গোছা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে মাথার জটার মতো বলিয়া, এই রকম শিকড়কে জটা-শিকড় বলা হয়। তোমাদের বাগানে এবং খেলিবার মাঠে যে রকম-রকম ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরি জটা-শিকড় আছে। তা'ছাড়া গম, যব, ভুট্টা, বাঁশ, নারিকেল, তাল প্রভৃতি অনেক গাছেরই তোমরা জটা-শিকড় দেখিতে পাইবে।

ধান গাছের শিকড়

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, কোন্ গাছে মূল-শিকড় আছে এবং কোন্ গাছে জটা-শিকড় আছে, তাহা গাছ উপ্‌ড়াইয়া না দেখিলে জানা যায় না। কিন্তু, তাহা নয়,—গাছের মূল কি-রকম হইবে তাহা ঠিক্ করিবার একটা মজার নিয়ম আছে।

তোমরা যদি এই নিয়মটা মনে করিয়া রাখ, তাহা হইলে শিকড়ের আকৃতি কি-রকম, গাছ না উপ্‌ড়াইয়াই বলিয়া দিতে পারিবে।

আম, কুমড়া, মটর, কড়াই প্রভৃতি বীজের ছাল উঠাইয়া ফেলিলেই বীজগুলি দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। তোমরা কয়েকটি বড় মটর এক বেলা জলে ভিজাইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, উপরকার ছাল উঠাইবামাত্র, সেগুলি দুই ভাগে ভাগ হইয়া যাইতেছে। এই দুইটি অংশকে বীজদল বলে। কুমড়া, লাউ, ঝিঙে, কাঁকুড় প্রভৃতির বীজ হইতে প্রথমে যে-সব চারা বাহির হয়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? এই-সব গাছে প্রথমে দুইটা করিয়া মোটা পাতা বাহির হয়। সেগুলি প্রথমে শাদা থাকে, তার পরে সবুজ হইয়া যায়। এইগুলিই তাহাদের বীজের ভিতরকার সেই বীজপত্র। আমের আঁটির ভিতরে যে দুইটি জোড়া পুঁয়ে থাকে, তাহাই উহার বীজ-দল। গাছ বাহির হইবার সময়ে আমের বীজদল মাটিতে ঢাকা থাকে বলিয়া, তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। যে-সব গাছের অঙ্কুরে প্রথমে ঐ-রকম দুইটি পাতা বাহির হয়,—সেগুলিকে দ্বি-বীজপত্রী গাছ বলা হয়।

ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ হইতে প্রথমে কি-রকমে চারা বাহির হয়, তোমরা দেখ নাই কি? যে-কোনো ভিজে জায়গায় কয়েকটি ধান ছড়াইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের প্রথম অঙ্কুরে কখনই দু'টা পাতা বাহির হয়

না —সলিতার মতো জড়ানো একটি পাতাই তাহাদের বীজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে। ইহাই তাহাদের বীজপত্র। কাজেই, ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতির গাছকে দ্বি-বীজপত্রী বলা যায় না; ইহারা এক-বীজপত্রী।

পণ্ডিতরা অনেক খোঁজ-খবর লইয়া দেখিয়াছেন, মূল-শিকড় দ্বি-বীজপত্রী গাছপালাদেরই থাকে এবং জটা-শিকড় থাকে কেবল এক-বীজপত্রী গাছদের। দ্বি-বীজপত্রী গাছের জটা-শিকড় হইয়াছে এবং এক-বীজপত্রী গাছের তলায় মূল-শিকড় রহিয়াছে, ইহা তোমরা কখনই দেখিতে পাইবে না।

এই নিয়মটি বেশ মজার নয় কি? গাছের প্রথম অঙ্কুরে একটি পাতা বাহির হয়, কি তুইটি পাতা বাহির হয়, ইহা জানিয়া তোমরা এখন নিজেরাই গাছের শিকড়ের আকৃতির কথা বলিয়া দিতে পারিবে।

মূল-শিকড় ও জটা-শিকড় ছাড়া অন্য রকমেরও শিকড় আছে। তোমাদের তাহা হয় ত মনে পড়িতেছে না। তোমাদের গ্রামে যে বুড়ো বট গাছটি আছে, তাহার কথা মনে করিয়া দেখ,—তাহার ডালপালা হইতে হাজার হাজার ঝুরি দড়ি-দড়ার মতো ঝুলিয়া আছে। এগুলি কি ডাল? ডাল নয়, ইহা বট গাছের শিকড়। বটের ঝুরি খুব লম্বা হইয়া যখন মাটিতে পুতিয়া যায়, তখন তাহাই একাট নূতন গাছ হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতার অপর পারে শিবপুরের বাগানে যে বড় বট গাছটি আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ

হয় ত তাহা দেখিয়াছ। ইহার ঝুরি নামিয়া এত নূতন গাছের স্বষ্টি করিয়াছে যে, কোন্‌টা প্রথম গাছ, তাহার খোঁজই পাওয়া যায় না। তাহা হইলে দেখ, শিকড় যে কেবল মাটির তলাতেই থাকে তাহা নয়, গাছের ডালেও শিকড় থাকে
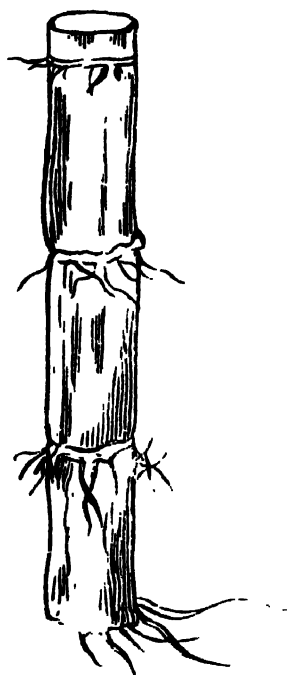
আকেব বায়ব শিকড

ছাল ফেলিয়া দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া তোমরা আক খাইয়া থাক। লাঠির মতো লম্বা লম্বা গোটা আক তোমরা দেখ নাই কি? এই রকম আকের গোড়ার দিকে প্রত্যেক গাঁটে ছোটো ছোটো শিকড় থাকে। বাঁশ ও ভুট্টা গাছের গাঁটেও তোমরা এই রকম শিকড় দেখিতে পাইবে। এগুলিও মাটির তলার শিকড় নয়।

এখানে আকের শিকড়ের একটা ছবি দিলাম। ইহার প্রত্যেক গাঁটেই শিকড় দেখিতে পাইবে।

বাঁশ, আক, ভুট্টা ছাড়া তোমাদের বাগানে যদি পটোল, কুমড়া ও রাঙা-আলুর গাছ থাকে, তবে তাহা পরীক্ষা করিয়ো; সেগুলির গাঁটেও অনেক শিকড় দেখিতে পাইবে।

মাটির সঙ্গে এই সব শিকড়ের কোনো সম্বন্ধই থাকে না, —মাটির উপরে বাতাসে তাহারা বাড়িতে থাকে। তার পরে যদি কাছে মাটি পায়, তবে সেগুলি মাটির তলায় আশ্রয় লয়। এইজন্য ইহাদিগকে বায়ব শিকড় বলা হয়।

তোমরা আলোক-লতার গাছ দেখিয়াছ কি? আমাদের দেশের বন-জঙ্গলে ছোটো ছোটো গাছের উপরে শীতকালের শেষে আলোক-লতা দেখা যায়। হল্‌দে রঙের সরু সরু লতায় গাছটিকে যেন আলো করিয়া থাকে। আলোক-লতার কোনো শিকড়ই মাটিতে পোতা থাকে না,—ইহার সব শিকড়ই আশ্রিত গাছের রস চুষিয়া লয়। এই জন্য এই প্রকার মূলকে বলা হয় শোষক মূল। রাস্না এবং পরগাছা মান্দাও শোষক মূল দিয়া আশ্রয় গাছের রস টানিয়া লয়।

পাথরকুচির পাতা

গোলাপ, মল্লিকা, টগর, জবা, করবী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি গাছের ডাল ভিজে মাটিতে পুতিয়া রাখিলে তাহাদের মাটির তলার গাঁট হইতে শিকড় বাহির হয়। এই রকমে ডাল পুতিয়া আমরা অনেক নূতন গাছ তৈয়ারি
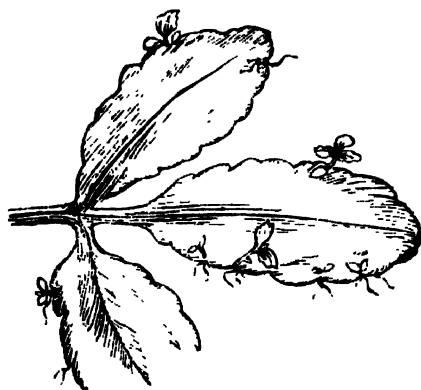
করিয়াছি, তোমরাও বোধ হয় করিয়াছ। আগে যে-সব শিকড়ের কথা বলিয়াছি, তাহাদের কোনোটিরই সঙ্গে, এই রকম শিকড়ের মিল দেখা যায় না। এইজন্য বৈজ্ঞানিকরা একটা পৃথক্ নাম দিয়া এই রকম শিকড়কে আকস্মিক বা অপ্রকৃত শিকড় বলিয়াছেন। গাছের ডাল বা গুঁড়ি মাটি চাপা পড়িলেই হঠাৎ শিকড় বাহির হয়। তাই ঐ-সব শিকড়ের অপ্রকৃত শিকড় নাম দেওয়া হইয়াছে। পাথরকুচি (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবি দেখ) এবং কয়েকটি পাতাবাহার গাছের পাতাকে কয়েক দিন মাটি দিয়া রাখিলেও সেগুলি হইতে অপ্রকৃত শিকড় বাহির হয়।

শিকড়ের কাজ

শিকড়-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন যে-কোনো গাছের শিকড় দেখিলে, উহা কোন্ রকমের শিকড়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনো এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে বাকি আছে—সেগুলি একে একে বলিব।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, গাছকে মাটিতে আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য শিকড়ের দরকার। কিন্তু কেবল ইহার জন্যই কি গাছের তলায় শিকড় থাকে? তাহা নয়। ছাগল, ভেড়া, পাখী প্রভৃতি জন্তুরা সমস্ত দিন চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কত কষ্টে খাবার সংগ্রহ করিয়া পেট ভরায়, তোমরা

তাহা দেখ নাই কি? যেখানে দু'টা কাঁচা ঘাস থাকে, গরু-ছাগলেরা ছুটিয়া গিয়া তাহা খাইয়া আসে। ধূলা বালির মধ্যে দু'টা সরিষা বা ধান পড়িয়া থাকিলে পাখীরা খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া তাহা খাইয়া ফেলে। এই-রকমে সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া পেট ভরায় বলিয়াই জন্তুরা বাঁচিয়া থাকে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গাছদেরও খাওয়া দরকার। কিন্তু খাবার জোগাড় করিবার জন্য তাহারা ছুটাছুটি করিতে পারে না। তাই গাছদের শিকড়ই মাটির তলায় চলাফেরা করিয়া খাবার জোগাড় করে এবং তাহা খাইয়া গাছরা বাঁচিয়া থাকে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন মাটিতে রস থাকে না, তখন অনেক দূরের গাছের শিকড় মাটির তলায় লুকাইয়া লুকাইয়া পাতকূয়া বা পুকুরের দিকে ছুটিয়া চলে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? আমরা চারি-পাঁচ শত হাত দূরের বটগাছের শিকড়কে, পাতকূয়ার দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াছি। এই-রকমে অনেক শিকড় জমা হইয়া কূয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও দেখা গিয়াছে।

তাহা হইলে দেখ, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গাছের শিকড় মাটির তলায় লুকাইয়া কতই ছুটাছুটি করে।

কেবল ঢক্-ঢক্ করিয়া কতকগুলো জল খাইলে পেট ভরে না এবং তাহাতে শরীরও পুষ্ট হয় না। তাই জল ছাড়া আরো অনেক খাবার না খাইলে আমাদের শরীর টিকে না। গাছদের অবস্থাও ঠিক আমাদের মতো। তাহারা কেবল

জল খাইলে বাঁচে না, জলের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্য খাবার চায়—তাহাদের অনেক খাবারই মাটির সহিত মিশানো থাকে, শিকড়ই সেই সব মাটি হইতে চুষিয়া লইয়া গাছকে খাওয়ায়। ইহাতেই গাছের গায়ে জোর হয় এবং তাহারা বড় হইয়া ফুল-ফল ধরাইতে আরম্ভ করে।

যাহা হউক, মাটি হইতে খাবার জোগাড় করিবার জন্য শিকড়দের কম ছুটাছুটি করিতে হয় না। মনে কর, তোমাদের বাড়ীর কাছে দোকান নাই,—দোকান এক ক্রোশ তফাতে। এদিকে তোমাদের ভাণ্ডারের খাবার ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন তোমরা কি কর? মা তোমাদের সেই চাকরটির হাতে টুক্‌রি দিয়া এক ক্রোশ তফাতের দোকান হইতে খাবার আনিতে পাঠাইয়া দেন। খাবার আসে, তার পরে রান্না হয়। কতকগুলি গাছ খাবার জোগাড়ের জন্য ঠিক্ এই রকমই করে। কাছের মাটিতে যে-সব খাবার থাকে তাহা ফুরাইয়া গেলে, দূরের মাটি হইতে খাবার আনিবার জন্য তাহারা শিকড়দের পাঠাইয়া দেয়। শিকড়রা অনেক কষ্টে সেই সব জাগায় গিয়া খাবার জোগাড় করে।

গাছের শিকড় প্রায়ই সোজা হয় না। একটি ছোটো গাছ সাবধানে শিকড়সুদ্ধ উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ছড়ির মতো এবং সুতার মতো শিকড়গুলি জটলা করিয়া রহিয়াছে—তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আঁকা-বাঁকা;

গাছের শিকড় কেন এ-রকম আঁকা-বাঁকা হয়, বলিতে পার কি ? বোধ হয়, পার না।

আচ্ছা, মনে কর, যেন তুমি বিকালে মাঠের মাঝ দিয়া ফুটবল্ খেলার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছ এবং তোমার পথের সম্মুখে যেন একটা প্রকাণ্ড কাঁটা-ঝোপ আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় তুমি কি কর ? কাঁটা মাড়াইয়া ঢিবি ডিঙ্গাইয়া তোমার যাওয়া হয় না ; কাঁটা-ঝোপটিকে এবং ঢিবিকে পাশে ফেলিয়া তুমি বাঁকিয়া খেলার মাঠের দিকে ছুটিতে থাক। গাছের শিকড় যখন জল ও খাবার জোগাড় করিবার জন্য মাটির তলায় ছুটিয়া চলে, তখন তাহার অবস্থাও প্রায় তোমার মতোই হয়। মাটির তলায় ইট পাথর কাঁকর ও বালির অভাব নাই। মাটির ভিতরে চলিতে চলিতে যখন শিকড় এই-রকম কোনো শক্ত জিনিসের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন সেগুলি আর সোজাসুজি যাইতে পারে না, কাজেই, মুখ ফিরাইয়া তাহাকে বাঁকিয়া চলিতে হয়। এই-রকমেই গাছের শিকড় আঁকা-বাঁকা হইয়া পড়ে।

গাছের শিকড়ের ডগা বড় নরম জিনিস। একটু ঘা লাগিলেই তাহা মুট্ করিয়া ভাঙিয়া যায়, যেন কোনো জিনিসের গায়ে ঘ্যাস্ লাগিলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। তাই শিকড় মাত্রেরই ডগায় একটি টুপির মতো অংশ লাগানো থাকে। সেলাই করিবার সময়ে পাছে আঙুলে ছুঁচের খোঁচা লাগে, এই ভয়ে আমরা আঙ্গুলে আঙ্গ্স্ত্রাণা লাগাইয়া তবে সেলাই

করি। পাছে ইট পাথর কাঁকরের খোঁচা মাথায় লাগে এই ভয়ে শিকড়গুলিও মাথায় টুপি লাগাইয়া মাটির তলায় চলে। এই টুপিকে বৈজ্ঞানিকরা মূলত্রাণ (Root Cap) নাম দিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় শিকড়ের মাথার এই অংশটি কখনো দেখ নাই। বটগাছের ঝুরি এবং টোপা পানার শিকড়ের আগায় তোমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ইহার রঙ্ কতকটা বাদামী

শিকড়ের খাদ্য

আমরা আগেই বলিয়াছি, গাছরা শিকড় দিয়া জল ও মাটিতে মিশানো অনেক খাবার চুষিয়া লয়। এই সব খাবার যে কি, তোমাদিগকে এখন তাহাই বলিব।

শুক্‌না কাঠ বা শুক্‌না খড়ে আগুন দিলে কি হয়, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া সেগুলিকে পোড়াইয়া ফেলে। শেষে একটু কয়লা বা একমুঠো শাদা ছাই ভিন্ন তাহাদের আর কোনো চিহ্নই থাকে না। ছাইকে খুব গন্‌গনে আগুনে ফেলিয়া পোড়াইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়ো; দেখিবে, তাহাকে আর পোড়ান যায় না। বৈজ্ঞানিকরা এই ছাই পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়ম, গন্ধক, লোহা, পোটাসিয়াম্, ক্যাল্‌সিয়ম্, ফস্‌ফরস্ এবং ক্লোরিন্-ঘটিত অনেক জিনিস বাহির করিয়াছেন। এ-গুলির নাম

হয় ত তোমরা এই প্রথম শুনিলে। তোমরা যখন বড় হইবে, তখন এই-সব জিনিস স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। এখন ইহাই জানিয়া রাখো যে, এগুলি আকরিক জিনিস,—সাধারণতঃ মাটির সঙ্গেই ইহারা মিশানো থাকে। গাছরা এই সব জিনিসকেই খাদ্যের আকারে মাটিতে পাইয়া শিকড় দিয়া চুষিয়া লয়। আমরা গাছের তলায় মাটিতে যে সার দিই, তাহাতে ঐ-সব জিনিসই খাবারের আকারে মিশানো থাকে। গাছরা তাহাই শিকড় দিয়া টানিয়া লয় বলিয়াই এত শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। অঙ্গার অর্থাৎ কয়লা গাছের একটি প্রধান খাদ্য। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, খানিকটা কাঠ-কয়লার গুঁড়া শিকড়ের গোড়ায় রাখিলে গাছরা তাহা খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহারা কখনই মাটিতে মিশানো কয়লা খায় না। চারিদিকের বাতাসে যে অঙ্গার-মিশানো বাষ্প থাকে, গাছের পাতা তাহা শুষিয়া লইয়া গাছের দেহে অঙ্গার জোগায়। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

আকাশের বাতাসে মোটামুটি কি কি বাষ্প আছে, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। চারি ভাগ নাইট্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন বাষ্প মিশিলে বাতাস উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন বাষ্প, গাছপালা এবং জন্তু-জানোয়ারদের বড় উপকারী। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস টানিয়া শরীরের ভিতরে লইয়া যাই, তাহার অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে তাজা করে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য

গাছদেরও অক্সিজেনের দরকার হয়, কিন্তু সব চেয়ে দরকার হয় নাইট্রোজেনের। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চারিপাশের বাতাসে এত নাইট্রোজেন সত্ত্বেও গাছরা বাতাস হইতে তাহা টানিয়া লইতে পারে না। সারের সঙ্গে মাটিতে যে নাইট্রোজেন্ মিশানো থাকে, ইহারা তাহাই শিকড় দিয়া টানিয়া নয়। নাইট্রোজেন না পাইয়া যখন মরিবার মতো হইতেছে, তখনো তাহারা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া লইতে পারে না, ইহা মজার ব্যাপার নয় কি? এক গলা জলে দাঁড়াইয়া যদি কেহ তৃষ্ণায় হা-হুতাশ করে, তাহা হইলে যেমন অদ্ভুত দেখায়, ইহা প্রায় সেই রকমেরই অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ইহা সত্য।

ধঞ্চে, মটর, শীম প্রভৃতির গাছ যে-রকমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, তাহা বড় মজার। ইহাদের শিকড়ে এক রকম খুব ছোটো উদ্ভিদ্ বাসা করে। এই ছোটো উদ্ভিদ্গুলিকে জীবাণু বলা হয়। ইহারাই বাতাস হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া গাছের জন্য খাবার তৈয়ারি করে। গাছরা শিকড়ের গায়ে এই উপাদেয় খাবার পাইয়া পেট ভরিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া পড়ে। এত জায়গা থাকিতে জীবাণুরা কেন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া এই সব গাছের শিকড়ে বাসা বাঁধে এবং কেনই বা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া গাছদের উপকার করে, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

এখানে ধঞ্চের শিকড়ের একটা ছবি দিলাম। দেখ, শিকড়ের গায়ে জীবাণুদের কত গোল গোল বাসা রহিয়াছে। যে-সব গাছের শুঁটিওয়ালা ফল হয়, কেবল তাহাদের শিকড়েই এই রকম জীবাণুর বাসা দেখা যায়। তোমাদের বাগানে যদি ধঞ্চে, মটর, অপরাজিতা, চীনা বাদাম বা অন্য কোনো শুঁটিওয়ালা গাছের চারা থাকে, তবে তাহাদের একটিকে উপ্‌ড়াইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, শিকড়ের গায়ে জীবাণুদের বাসা ছোটো মতো লাগানো রহিয়াছে।

ধঞ্চের শিকড়

খাওয়ার প্রণালী

আমরা গোয়ালঘরে খড়-বিচালি কাটিয়া গাম্‌লায় খোলে ও জলে মিশাইয়া রাখি। বাড়ীর গরুটি চরিয়া আসিয়া গাম্‌লায় মুখ ডুবাইয়া সেগুলি খাইতে আরম্ভ করে। পাত্রে ভালো ভালো খাবার সাজাইয়া যখন মা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন, তখন তুমি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পাত্রের খাবার মুখে পূরিতে আরম্ভ কর। জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের খাওয়ার প্রণালী এই রকম নয় কি? কিন্তু গাছরা সে-রকমে খায় না, ইহারা শিকড় দিয়া খাবার খায়. ইহা তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ, কিন্তু তাহাদের খাওয়ার

প্রণালীর কথা তোমাদিগকে এখনো বলি নাই। এখন তাহারি বিষয় তোমাদের বলিব।

গাছরা কি-রকমে শিকড় দিয়া খাবার খায়, তাহা জানিতে হইলে বিজ্ঞানের একটি মোটা কথা তোমাদের বুঝিয়া রাখা দরকার হইবে।

এখানে একটা পাত্রের ছবি দিলাম। ইহার মাঝে যে পর্দাটি দেখিতেছ, তাহা পাতলা চামড়ার পর্দা। ইহাতে সমস্ত পাত্রটি দুইটি কুঠারীতে ভাগ হইয়া গিয়াছে। পর্দা বেশ শক্ত করিয়া আঁটা আছে, তাই এক কুঠারীর জল অন্য কুঠারীতে যাইতে পারে না। এখন মনে কর, যেন নীচের কুঠারীতে চিনি-গোলা জল আছে এবং উপর দিকের কুঠারীতে বেশ পরিষ্কার খাবার জল রাখা হইয়াছে। এখন এই দুই রকম জলের অবস্থা কি হইবে বলিতে পার কি ? তোমরা হয় ত বলিবে, জল যেখানে যেমন আছে ঠিক সেই রকমই থাকিবে। কিন্তু পরীক্ষা করিলে তাহা দেখা যাইবে না,—মাঝের পর্দার ভিতর দিয়া পরিষ্কার জল নীচেকার কুঠারীতে প্রবেশ করিবে এবং সেখানকার চিনি-গোলা গাঢ় জলকে পাতলা করিয়া দিবে।
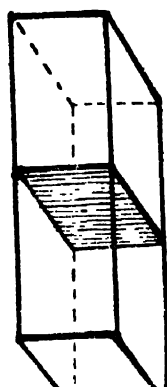
কেবল চিনি-গোলা এবং পরিষ্কার জলেই যে এই ব্যাপারটি দেখা যায়, তাহা নয়। চামড়ার মত পরদার এক

ধারে গাঢ় জিনিস এবং আর এক ধারে পাতলা জিনিস থাকিলে সকল সময়ে ইহাই ঘটে। পাশের ঘন জিনিষকে পাতলা করিবার জন্য পাতলা জিনিসগুলি প্রাণপণে চেষ্টা করে।

খাওয়া-সম্বন্ধে নানা লোকের নানা রকম সখ আছে। তোমাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ দুধ খাইতে ভালবাস না, কিন্তু কাঁচা পেয়ারা, টক্ আম পাইলে গণ্ডায় গণ্ডায় সেগুলিকে চিবাইয়া খাইতে পার। আমরা এমন লোকও দেখিয়াছি, যাহারা পায়েস খাইতে ভালবাসে না, কিন্তু আট দশ গণ্ডা রসগোল্লা ভরাপেটে অনায়াসে গিলিয়া ফেলিতে পারে। খাওয়া সম্বন্ধে গাছদেরও এক রকম সৌখীনতা আছে। আমরা যেমন গরম গরম জিলাপি, ময়ান দেওয়া খাস্তা কচুরি এবং ছোলা মটর ভাজা দাঁত দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলি, গাছরা শিকড় দিয়া সেরূপ কখনই খাইতে পারে না। জলের সঙ্গে মিশিয়া খাবার তরল আকারে না আসিলে ইহাদের তাহা খাওয়াই হয় না। তোমাদের খোকাটি শক্ত বিস্কুট চিবাইয়া খাইতে পারে কি? দাঁত নাই, চিবাইবে কি রকমে? তাই খোকাকে দুধ বা অন্য তরল খাবার খাওয়াইতে হয়। গাছরা যেন চিরদিনের খোকা, তরল খাবার শিকড়ের কাছে না পাইলে তাহাদের খাওয়াই হয় না।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, গাছরা মাটির তলায় তরল খাবার কোথায় পাইবে? মাটির তলায় জল থাকে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? • খুব গরমের দিনে রৌদ্রেব তাপে

যখন মাটি ফাটিয়া চৌ-চির হইয়াছে, তখনো যদি কোনো জায়গার উপরকার মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, তবে নীচেতে ভিজা মাটি দেখিতে পাও না কি? দেড় হাত বা দুই হাত নীচেকার মাটি সর্ব্বদাই জলে ভিজা থাকে এবং এই জলই খাবার গুলিয়া দেয়।

বৈশাখের রৌদ্রে মুখ শুকাইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে খুব ভালো আমের আচার বা কুলচূর সম্মুখে আনিলে কি হয়, তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তখন শুক্‌নো মুখে আপনিই জল জমে। কাছে খাবার পাইলে শিকড়ের ভিতর হইতে সেই-রকমে এক অম্ল রস বাহির হয়। ইহাও খাবার গুলিয়া তরল করিবার সাহায্য করে।

গাছরা কি-রকমে শিকড় দিয়া খাবার খায়, এখন তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, কোনো গাছের শিকড় তলাকার ভিজে মাটিতে মিশানো খাবারের কাছে গিয়াছে। সরু শিকড়গুলির ভিতরকার কোষ গাঢ় রসে ভর্ত্তি আছে এবং শিকড়ের গায়ের মাটি নিজের রসে ও শিকড়ের অম্ল রসে তরল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ শিকড়ের ভিতরকার রস গাঢ় এবং খাবার মিশানো বাহিরের রস পাতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় ভিতরকার গাঢ় রস এবং বাহিরের পাতলা রসের অবস্থা কি হইবে, তোমরা বলিতে পার কি? আগেকার পরীক্ষার কথা মনে কর। সেখানে আমরা দেখিয়াছি, গাঢ় জিনিস ও পাতলা জিনিস যদি পাশাপাশি থাকে এবং তাহাদের

সরু চামড়ার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে পাতলা জিনিসটা পর্দার ভিতর দিয়া আসিয়া গাঢ় জিনিসে মিশিয়া যায়। এখানে ঠিক সেই অবস্থাই হইতেছে না কি? শিকড়ের কোষে গাঢ় রস রহিয়াছে এবং বাহিরে খাবার-মিশানো পাতলা রস আছে। কাজেই, বাহিরের পাতলা রস ধীরে ধীরে শিকড়ের কোষে গিয়া হাজির হয়। এই রকম করিয়াই মাটিতে মিশানো খাবারের রস শিকড়ের ভিতরে যায় এবং তার পরে তাহা শিকড় হইতে উপরে উঠিয়া গুঁড়ি, ডাল, ফুল, ফলকে পুষ্ট করে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, বট, অশথ, আম, কাঁটাল গাছের যে-সব মোটা মোটা শিকড় থাকে, তাহারা বুঝি এই রকমে খাবার খায়। কিন্তু তাহা নয়। মোটা শিকড় হইতে যে-সব সূতার মতো শিকড় বাহির হয়, সেইগুলিই রস টানিয়া লয়। কিন্তু বেশি রস টানে ইহার চেয়েও সরু শিকড়েরা। এই শিকড় তোমরা দেখ নাই,—সহজে দেখাও যায় না। সরু শিকড়ের গায়ে চুলের চেয়েও সরু এক-রকম শিকড় লাগানো থাকে; ভিজে মাটিকে জড়াইয়া ধরিয়া এইগুলিই বেশি পরিমাণে খাবারের রস টানিয়া লয়। লোমের মত সরু বলিয়া এই রকম শিকড়কে লোম-শিকড় (Root hair) বলা হয়। তোমরা কোনো ছোটো গাছের লোম-শিকড় দেখিবার চেষ্টা করিলে হঠাৎ সেগুলিকে দেখিতে পাইবে না। মাটি হইতে উঠাইবার সময়ে যে নাড়া পায় তাহাতেই সেগুলি ভাঙিয়া যায়।

তোমরা যদি লোম-শিকড় দেখিতে চাও, তাহা হইলে রুমালের মতো একখানি ছোটো নেক্‌ড়াকে ভাঁজ করিয়া জলে ভিজাইয়ো এবং তাহার ভিতরে কয়েকটি সরিষা ছড়াইয়া রাখিয়ো। দুই তিন দিন এই রকম ভিজা থাকিলে সরিষাগুলি হইতে লম্বা লম্বা শিকড় বাহির হইবে। এই সময়ে তোমরা যদি আস্তে আস্তে নেক্‌ড়ার ভাঁজ খুলিয়া সরিষার গাছগুলিকে পরীক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে সেগুলির মোটা শিকড়ের গায়ে অসংখ্য লোম-শিকড় দেখিতে পাইবে।
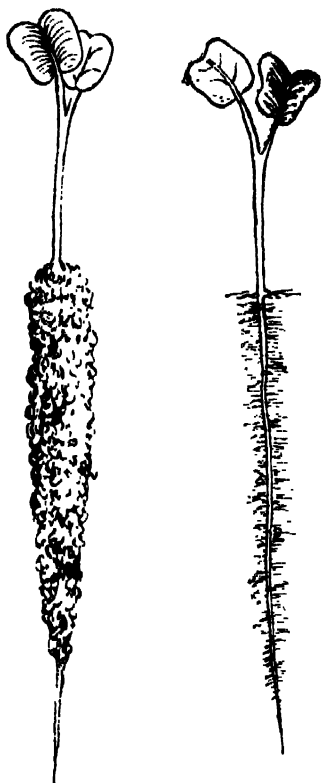
সরিষাগাছের লোম-শিকড

ছোটো বড় সকল গাছেরই এই শিকড়গুলি কাছের ভিজে মাটিকে জড়াইয়া ধরিয়া খাদ্য-রস টানিয়া লয়। লোম-শিকড় কি-রকমে মাটি জড়াইয়া রস টানে, ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে

গুঁড়ি

শিকড়ের কথা তোমরা শুনিলে, এখন গুঁড়ির কথা তোমাদিকে বলিব।

"গুঁড়ি" কথাটি শুনিলেই আম, কাঁটাল, শাল ইত্যাদি বড় বড় গাছের মাটির উপরকার মোটা অংশের কথা মনে পড়িয়া যায়। আমরা এখানে ছোটো বড় সকল গাছেরই শিকড়ের উপরকার মোটা অংশকে গুঁড়ি বলিতেছি। গুঁড়ির ভালো নাম "কাণ্ড"।

বট, অশথ, বকুল প্রভৃতি গাছে কত পাতা, কত ডাল থাকে, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। এইগুলিকে মাটির উপরে খাড়া রাখিয়া ঝড় ও বাতাসের ঝাপট সহ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। এইজন্য বড় গাছের গুঁড়ি খুব মোটা ও শক্ত হয়। তাল, নারিকেল, ঝাউ প্রভৃতি গাছে বেশি পাতা থাকে না। এজন্য ঝড়ের সময়ে তাহাদের গায়ে বেশি বাতাস আটকায় না। কাজেই, এই সব গাছের গুঁড়ির বেশি মোটা হওয়া দরকার হয় না। লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির গাছ মাটির উপর দিয়া লতাইয়া চলে। কাজেই, ঝড় বা বাতাসে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করে না। এইজন্যই গাছ খুব বড় হইলেও ইহাদের গুঁড়ি শক্ত ও মোটা হয় না।

ঘর-বাড়ী তৈয়ার করিবার সময়ে আমরা অনেক হিসাব-পত্র করিয়া তাহার যেখানে যে-রকম মজবুত করার দরকার, তাহা করি। এইজন্যই ঝড়বৃষ্টির উৎপাতে আমাদের বাড়ী-

ঘর হঠাৎ ভাঙিয়া যায় না। গাছরাও সেই রকম হিসাব জানে। তাই যেমনটি দরকার, ঠিক্ সেই রকমে তাহাদের গুঁড়িগুলিকে কখনো মোটা, কখনো সরু করে। বাজে-খরচ ইহারা জানে না।

তাহা হইলে দেখ, গাছের গুঁড়ি যে কেবল আম-কাঁটাল গাছের মতো মাটি হইতে খাড়া হইয়া উঠে, তাহা নয়। কতক গাছের গুঁড়ি মাটিব উপরে লতাইয়া বেড়ায় ; কতক লতাইয়া গিয়া কাছের বড় গাছের উপরে উঠে : আবার কতক কাছে গাছপালা বা অন্য কিছু আশ্রয় পাইলে ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো তাহাকে জড়াইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে।

যে-সব লতা অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেগুলিকে তোমরা হয় ত ভালো করিয়া দেখ নাই। ইহাদের অনেকেই কেহ কাঁটা দিয়া, কেহ আঁক্ড়ি দিয়া আশ্রয়কে আঁটিয়া ধরিয়া উপরে উঠে। শিয়াকুল ও চুপ্‌ড়ি আলুর গাছ তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ। ইহারা কাঁটা-ওয়ালা কতকটা লতানে গাছ। কাছে অন্য গাছ পাইলেই কাঁটা দিয়া আট্‌কাইয়া ইহারা সেই সব গাছের উপরে চড়িয়া বসে।

কাছের জিনিসকে আকড়ি দিয়া জড়াইয়া যাহারা উপরে উঠে, এই রকম লতা তোমাদের বাগানেই অনেক আছে। মটর, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, তরমুজ, শশা প্রভৃতি গাছের ডগা হইতে আঁক্ড়ি বাহির হয়, তাহা দিয়া ইহারা কাছের জিনিসকে জড়াইয়া ধরে এবং মাচার উপরে উঠে।

ইহা ছাড়া গা হইতে শিকড় বাহির করিয়াও অনেক লতা অন্য গাছের উপরে উঠে। চই, গাছ-পান ও পিঁপুলের লতায় তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

যে-সব লতা তাহাদের আশ্রয়কে ইস্ক্রুপের প্যাঁচে জড়াইয়া উপরে উঠে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি ? মর্ণিং-গ্লোরি, বিষতাড়ক, কল্‌মী-লতা জাতের অনেক গাছ ঐ-রকম প্যাকে প্যাকে ঘুরিয়া আশ্রয়ের উপরে চড়িয়া বসে। মালতী ফুলের গাছ যদি তোমাদের বাগানে থাকে তবে পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, এই লতাও নিকটের গাছকে ইস্ক্রুপের মতো প্যাঁচ দিয়া উপরে উঠিতেছে।

একটা বড় পেন্‌সিলে যদি ইস্ক্রুপের মতো করিয়া সূতা জড়াইতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে সূতা-গাছটিকে ডান্ দিক হইতে বাঁ দিকে, অথবা বাঁ দিক হইতে ডান্ দিকে জড়ানো যাইতে পারে। একটু সূতা লইয়া তোমরা তাহা এই দুই রকমে জড়াইয়া দেখিয়ো। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেক লতাই বাঁ দিক্ ধরিয়াই তাহাদের আশ্রয়কে জড়াইতে থাকে। মর্ণিংগ্লোরি, মালতী, মাধবী প্রভৃতি সব গাছেই তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। তোমরা একটি মর্ণিং-গ্লোরির লতাকে জোর করিয়া ডান্ প্যাকে ঘুরাইয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়ো; দেখিবে, দুই এক দিন পরে তাহার নূতন ডগা ডান প্যাকে না জড়াইয়া বাঁ-প্যাকে জড়াইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য নয় কি ?

চুপ্ড়ি আলু, খাম আলুর লতা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমাদের জানা-শুনা গাছের মধ্যে ইহারাই ডান্ পাকে জড়াইয়া উপরে উঠে।

বামাবর্ত্ত লতা   দক্ষিণাবর্ত্ত লতা

বাঁ-পাকে জড়ানো ও ডান-পাকে জড়ানো লতার দুইটি পৃথক্ ছবি দিলাম। তোমাদের বাগানে বা বাড়ীর কাছের বনে যে-সব লতা আছে, তাহাদের সঙ্গে ছবি মিলাইয়া দেখিয়ো। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, অনেক লতাই তাহাদের আশ্রয়কে বাঁ-পাকে ঘুরিয়া জড়ায়।

অধিকাংশ লতাই কেন বাঁ-পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই কথা বোধ হয় তোমরা জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে

কোনো কথা তোমাদিগকে এখন বলিতে পারিব না। তোমরা যখন বড় হইয়া গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে বড় বড় বই পড়িবে, তখন সে-সব কথা জানিতে পারিবে।

লতা অন্য গাছকে জড়ায় কেন ?

গরু, ছাগল, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীদের চেতনা আছে এবং একটু-আধটু বুদ্ধিও আছে। তাই তাড়া দিলে তাহারা পলাইয়া যায়, ভয় পাইলে লুকায় এবং ক্ষুধা পাইলে খাবারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। গাছপালাদের বুদ্ধি নাই এবং চেতনাও নাই, তবে কেন লাউ-কুমড়ার কচি ডগাগুলি আলোর দিকে মাথা উঁচু করে এবং কাছে কিছু পাইলে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কথাটা ছেলেবেলায় বার বার আমাদের মনে হইত। তোমাদেরো হয় ত তাহাই মনে হয়। একটা উদাহরণ দিলে তোমরা এই বিষয়গুলি সহজে বুঝিতে পারিবে।

মনে কর, একগাছি কাঁচা কঞ্চিকে উনুনের আগুনের উপরে ধরা গেল, এবং আগুনের তাপ কঞ্চির এক পিঠে লাগিতে থাকিল। অনেকক্ষণ এই রকম অবস্থায় রাখিলে, কঞ্চির অবস্থা কি-রকম হইবে, তোমরা বলিতে পার কি ? পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহা ধনুকের মতো বাঁকিয়া যাইবে। আগুনের কাছে থাকায় উহার নীচেকার পিঠ্ শুকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে কিন্তু উপরকার পিঠ্ আগেকার মতো

কাঁচাই থাকিয়া যাইবে। কাজেই, এক পিঠ্ লম্বা এবং আর এক পিঠ্ কোঁক্‌ড়ানো হওয়ায়, জিনিসটার বাঁকিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই থাকিবে না।

লতারা যখন কাছের বড় গাছকে জড়াইয়া ধরে এবং শশা ও কুমড়ার গাছ আঁকড়ি দিয়া বাঁশের খুঁটিকে জড়াইয়া যখন মাচায় উঠে, তখন এই রকমেরই একটা ব্যাপার ঘটে। লতার কচি ডগা যেমন চট্‌পট্ করিয়া বাড়ে, তাহার অন্য অংশ সেই রকমে বাড়ে না। এই সব ডগা যখন বাঁশের খুঁটি বা অন্য গাছের গুঁড়ির গায়ে আসিয়া ঠেকে, তখন ঐসব জিনিসের সঙ্গে তাহার যে-পিঠ্‌টা ঘষা পায় তাহার বৃদ্ধি কমিয়া আসে। কিন্তু অপর পিঠ্ পুরা দমেই বাড়িয়া চলে। কাজেই, আগেকার কঞ্চির মতোই
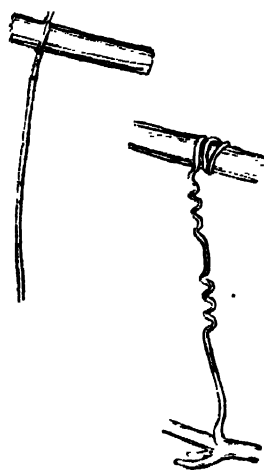
আঁকড়ি অন্য জিনিসকে জড়াইতেছে

ইহার অবস্থা হয়। এখন আশ্রয়-বস্তুকে ঘিরিয়া লতার ডগা আপনা হইতেই ধনুকের মতো বাঁকিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া আমরা মনে করি, বুঝি, লতাটি ইচ্ছা করিয়াই গাছকে জড়াইয়া উপরে উঠিতেছে।

কুমড়ার ডাঙ্গা কচি ডগা সাপের ফণার মতো যখন

আলোতে মাথা উঁচু করে, তখনো এই রকম ব্যাপার হয়। ডগার যে-পিঠ্ রৌদ্রের তাপ পায়, তাহার বৃদ্ধি অতি ধীরে ধীরে চলে, কিন্তু উহার যে-পিঠ্ মাটির উপরে ছায়ায় থাকে, তাহার বৃদ্ধি রীতিমত চলিতে থাকে। কাজেই, ইহাতে ডগার দুই পিঠের বৃদ্ধি এক রকম হয় না। ইহার জন্যই ডগাটি ধনুকের মতো বাঁকিয়া মাথা উঁচু করে।

সূর্য্যের আলো না পাইলে গাছ বাড়ে না,—আলো দিয়া ইহারা পাতায় খাবার তৈয়ারি করে। তাই খুব অন্ধকার ঘরে রাখিলে, গাছ শাদা হইয়া মরিয়া যায়। তোমাদের পড়িবার ঘরের জানালায় টবে করিয়া একটি মর্ণিংগ্লোরির গাছ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, জানালার ফাঁকের দিকেই লতা ঝুঁকিয়া পরিতেছে। রৌদ্রের তাপ যেমন করিয়া কুমড়ার ডগাকে বাঁকায়, আলোও কতকটা সেই রকম করিয়াই মর্ণিংগ্লোরির লতাকে বাঁকাইয়া ফেলে। কিন্তু আমরা ইহা দেখিয়া ভাবি, লতাটি বুঝি আপনিই আলোর দিকে যাইতেছে।

মাটির তলার গুঁড়ি

গাছের গুঁড়ি-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিলাম, কিন্তু এখনো মাটির তলার গুঁড়ির কথা তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এখন সেই কথাটা বলিব।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মাটির নীচে গাছের শিকড়ই

থাকে, গুঁড়ি আবার কি-রকমে থাকিবে? কিন্তু সত্যই থাকে। মানকচু ও গুঁড়িকচুর মাটির তলার যে মোটা অংশকে আমরা তরকারি করিয়া খাই, সেগুলি শিকড় নয়,—ইহা কচু গাছের গুঁড়ি। শিকড় হইতে কখনই কুঁড়ি বাহির হয় না। কিন্তু কচুতে এবং ওলে কত মুখী থাকে তোমরা দেখ নাই কি? এই গুলিই মাটির তলার গুঁড়ির গায়ের কুঁড়ি। এই সব কুঁড়ি ভাঙিয়া পুঁতিয়া দিলে এক একটি নূতন গাছ হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন গাছের কেবল শিকড় পুঁতিলে কখনই নূতন গাছ হয় না। কচুর গায়ে পাতলা বাদামী রঙের কাগজের মতো এক রকম ছাল লাগানো থাকে। তোমরা ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। সেগুলি আঙুল দিয়া ঘষিলেই উঠিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কচু গাছের পাতা বিকৃত হইয়া ঐ-রকম ছাল বা শল্ক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, বলিতে হয়, গাছের গুঁড়িতে এবং ডালে যেমন পাতা ও কুঁড়ি দেখা যায়, কচুতেও তাহা দেখা যায়। এই জন্যই কচু বা ওলকে শিকড় বলা যায় না,—উহা গুঁড়ি। কলা গাছ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথা বলা যায়।

কেবল কচু ও ওলই যে গাছের গুঁড়ি, তাহা নয়। মাটির তলাকার গুঁড়ির আরো অনেক উদাহরণ আছে এবং বিশেষ বিশেষ গুঁড়ির বিশেষ বিশেষ নাম আছে।

যে-সব মাটির তলার গুঁড়ি খুব মোটা হয় তাহাকে বজ্রকন্দ (corn) বলা হইয়া থাকে। কচু এবং ওলের গুঁড়ি বজ্রকন্দ।

হলুদ, আদা, শালুক, কলা ইত্যাদি গাছের মাটির তলাকার অংশটাও গুঁড়ি। ইহাদেরো গায়ে পাতলা কাগজের মতো বিকৃত পাতা দেখা যায়। কিন্তু ওল এবং কচুর মত এগুলি নীচের দিকে না বাড়িয়া পাশাপাশি বাড়ে এবং যেমন এক পাশে বাড়ে, অমনি অপর পাশ মরিয়া যায়। তা' ছাড়া ইহাদের গায়ের আশে-পাশে অনেক শিকড় ও মুখী বাহির হয়। এই রকম গুঁড়িকে অধোবিহারী (Rhizome) কন্দ বলা হইয়া থাকে।

হলুদ

গোল আলুকে তোমরা কি মনে কর, জানি না। হয় ত ভাবো,—উহা মূলার মত শিকড়। কিন্তু তাহা নয়—ইহা আলু গাছেরই গুঁড়ি বা ডাল। আলুর গায়ে তোমরা আঁশের মতো বিকৃত পাতা দেখ নাই কি? নূতন আলুর গা হইতে যে পাতলা খোসা বাহির হয়, তাহাই বিকৃত পাতা। তা'ছাড়া ইহার গায়ে যে-সব গর্ত্ত থাকে, তাহা হইতে অঙ্কুরও বাহির
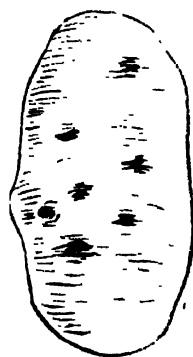
আলু

হয়। কাজেই, গুঁড়ির সকল লক্ষণই আলুতে দেখা যায়। আলুর আকারে যে-সব গুঁড়ি মাটির তলায় থাকে তাহাকে কন্দল (Tuber) বলা হইয়া থাকে। মুথা, কেশুর, গুঁড়ি-কচু ও হাতিচোক গাছের নীচেও তোমরা কন্দল গুঁড়ি দেখিতে পাইবে।

পেঁয়াজ, রসুন, লিলি, রজনীগন্ধা প্রভৃতি গাছের গোড়াগুলিও তাহাদের গুঁড়ি। এই রকম গুঁড়িকে কন্দ (Bulb) বলা হয়। ইহাদের গায়ে পর্দায় পর্দায় যে আবরণগুলি থাকে তাহা পাতা,—আসল গুঁড়ি থাকে পাতার আবরণের নীচে কতকটা চাকার আকারে। তাহারি গা হইতে শিকড় বাহির হইতে দেখা যায়। পেঁয়াজ বা রসুনকে উপ্‌ড়াইয়া পরীক্ষা করিলে, তোমরা তাহার আসল গুঁড়িটাকে নীচে দেখিতে পাইবে।
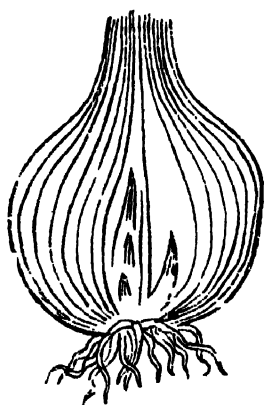
পেঁয়াজের মাঝামাঝি চেরা অংশ

তাহা হইলে দেখ, কচু, ওল, হলুদ, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি জিনিস গাছের শিকড় নয়, সেগুলি গাছের গুঁড়ি। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা শাঁক আলু, রাঙা আলু, মূলা, বীট্ এবং শালগমকে যেন গুঁড়ি বলিয়ো না। এগুলি সত্যই শিকড়। তাই ইহাদের গায়ে বিকৃত পাতা নাই এবং

গা হইতে ছোটো ছোটো সরু শিকড় ছাড়া অঙ্কুরও বাহির হয় না।

গুঁড়ির আকৃতি

জাম, তেঁতুল, কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় গাছের গুঁড়ি মোটামুটি গোলাকার। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গাছের গুঁড়িই গোলাকার হয় না। তোমরা বোধ হয়, উহা লক্ষ্য কর নাই। তে-শিরা, চার-শিরা এবং কোনো কোনো গাছে পাঁচ-শিরা গুঁড়িও দেখা যায়। তোমাদের বাগানে যে-সব ছোটো গাছ আছে, তাহাদের কচি গুঁড়ি বা ডাল পরীক্ষা করিয়ো ; তাহাতে নানা আকৃতি দেখিতে পাইবে।

বাবুই তুলসী, শিউলী, গোয়ালঘসে এবং পুদিনা গাছের গুঁড়ি চার শিরা। তিন-শিরা গুঁড়ি দেখিবার জন্য তোমাদিগকে বেশি কষ্ট করিতে হইবে না। তোমাদের বাগানে যে মুথা ঘাস আছে, তাহারই শীষে তোমরা তে-শিরা গুঁড়ি দেখিতে পাইবে।

অনেক গাছেরই গুঁড়ি আম-কাঁটালের গুঁড়ির মতো নিরেট্। কিন্তু ফাঁপা গুঁড়িও কি নাই ? অনেক আছে। বাঁশ, কুমড়া, লাউ, কাঁকুড়, তরমুজ,—এই সব গাছের গুঁড়ি অল্প বা অধিক পরিমাণে ফাঁপা।

নাগ-ফণীর গাছ তোমরা দেখিয়াছ কি ? ইহাদের গুঁড়ি ঠিক পাতার মতো চ্যাপ্টা ও সবুজ। হাড়জোড়া গাছের গুঁড়ি

আবার আর এক রকম। শিকলে যেমন গাঁট থাকে, এই গাছের গুঁড়িতে সেই রকম অনেক গাঁট পরস্পর মালার মতো গাঁথা থাকে। তাই দেখিলেই ইহাকে একগাছি শিকল বলিয়া মনে হয়।

তাহা হইলে দেখ, গুঁড়ির আকৃতি সব গাছের এক রকম নয়। আমরা এখানে কেবল কয়েক রকম আকৃতির কথা বলিলাম। তোমরা খোঁজ করিলে আরো নানা রকম আকৃতির গুঁড়ি দেখিতে পাইবে।

তাল, সুপারি, বাঁশ, আখ প্রভৃতি গাছের গুঁড়িতে যে আংটির মতো দাগ দেখা যায়, ইহা গুঁড়ির আর একটা বিশেষত্ব। ইহাকে বলা হয় গ্রন্থি (node)। গ্রন্থি সব গুঁড়িতেই থাকে, কিন্তু বাঁশ, আক প্রভৃতি গাছে ইহা যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, অন্য গাছে সে-রকম দেখা যায় না। দুই গ্রন্থির মাঝের অংশকে বলা হয় পাব্ (Internode)। কঞ্চির বা কলমীর যে-অংশকে আমরা কলম করি, তাহা বাঁশের এবং কলমী লতার পাব্। প্রায়ই গ্রন্থি হইতে মুকুল (Bud) বাহির হয় এবং তাহা শেষে হইয়া দাঁড়ায় গাছের ডালপালা। গুঁড়ির আগায় যে মুকুল জন্মে তাহাতে গাছ লম্বা হয়। তোমরা মনে রাখিয়ো, সাধারণতঃ গ্রন্থি হইতে বা পাতার কোল হইতেই মুকুল বাহির হয়। খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের গ্রন্থি হইতে প্রায়ই মুকুল বাহির হয় না। তাই এ-সব গাছের ডাল থাকে না।

গাছের বৃদ্ধি

তোমাদের চেয়েও যখন ছোটো ছিলাম, তখন ছোলা বা মটরের বীজ পুতিয়া, তাহার চারিদিকে ইটের বেড়া দিয়া বাগান করিতাম। যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইত এবং অঙ্কুর হইতে দুটি ছোটো পাতা লইয়া গাছ উঁচু হইয়া দাঁড়াইত, তখন কত খুসীই হইতাম। তার পরে গাছের গোড়ায় ঘটি ঘটি জল ঢালিতাম এবং প্রতিদিন ভোরে বিছানা ছাড়িয়াই গাছ রাতারাতি কতটা বড় হইল তাহা দেখিতাম। এই রকম বাগান করায় কত আনন্দই ছিল। যখন দেখিতাম, গাছগুলি রাতারাতি বড় হইতেছে, তখন গাছরা কি করিয়া বড় হয় জানিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও এ-সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না।

তোমাদের মনে কি এইরকম প্রশ্ন আসে না? বাগানের আম, কাঁটাল, নেবুর গাছগুলি বৎসরে বৎসরে কত বড় হইতেছে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আষাঢ় মাসে ধানের ক্ষেতে ধান গাছ পোতা হইল। তিন-চারি মাসেই গাছগুলি গলা পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিল। তারপরে তাহাতে ফুল হইল, ফল ধরিল। দেখ, গাছরা কত তাড়াতাড়ি বাড়ে। কেমন করিয়া গাছ বাড়ে, তাহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? আমরা এখানে সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব।

ইট্ চূণ সুরকি বালি দিয়া বাড়ী তৈয়ারি হয়। লোহা দিয়া ছুরি তৈয়ারি হয়। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাই। কোন্ জিনিস দিয়া গাছের শরীর প্রস্তুত হয়, আগে তাহাই তোমাদের জানা দরকার।

তোমাদের বাগানে লাউ, কুমড়া বা শশার গাছ আছে কি না জানি না। এই রকম কোনো গাছের কচি ডগা ফুটন্ত জলে রাখিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়ো। লাউয়ের ডাঁটার যে তরকারি খাওয়া যায়, গরম জলে রাখিলে উহার অবস্থা ঠিক্ সেই রকম নরম হইবে। তখন ডাঁটার কতক অংশকে কাদার মতো এবং কতক অংশকে লম্বা লম্বা সূতার আকারে দেখা যাইবে। এই সূতার মতো অংশগুলি খুব শক্ত জিনিস; অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিলেও গলে না। এখন যদি কাদার মতো সেই জিনিসটার এক কণা ছুরি বা ছুঁচের ডগা দিয়া উঠাইয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা কর, তাহা হইলে তাহাতে অনেকগুলি কোষ (cell) দেখিতে পাইবে। পর পর ইট্ সাজাইয়া যেমন প্রাচীর তৈয়ারি হয়, সেই রকম এই সব কোষ দিয়া গাছের ফুল ফল পাতা শিকড় সকলি তৈয়ারি হয়।

গাছের এই কোষগুলি নিরেট নয়,—কাঠের কৌটার যেমন সব দিক কাঠ দিয়া ঘেরা এবং মাঝে ফাঁক থাকে, ইহাদের গঠন কতকটা যেন সেই রকমের। কোষের আবরণকে কোষ-প্রাচীর (cell wall) বলা হয়।

কোষ-প্রাচীর সকল কোষে সমান পুরু নয়। যে-সব

গাছে শক্ত কাঠ আছে তাহার কোষের প্রাচীর খুব পুরু। যে-সব কোষ দিয়া আলু, পাকা ফল বা গাছের অসার অংশ প্রস্তুত হয়, সেগুলির প্রাচীর পাতলা। পুরু প্রাচীর-ওয়ালা কোষই কাঠের সৃষ্টি করে।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, কোষ-প্রাচীরের ভিতরকার ফাঁকা জায়গাটা বুঝি খালিই থাকে। কিন্তু তাহা নয়। উহা এক রকম তরল জিনিসে ভর্ত্তি দেখা যায়। তাহার মধ্যে জীবসামগ্রী (protoplasm) নামে এক জিনিস থাকে। গাছের বৃদ্ধি ইত্যাদি সব কাজ জীব-সামগ্রীই করায়। সুতরাং এই জিনিসটাকে গাছের প্রাণ বলা যাইতে পারে। অনেক বুড়ো বুড়ো গাছের কোষ-প্রাচীর এত পুরু হইয়া পড়ে যে, সেই সব কোষের ভিতরে জীব-সামগ্রী প্রায়ই থাকে না। তাই এই সব কোষে জীবনের লক্ষণও দেখা যায় না। তোমরা গাছ হইতে যদি ঐরকম কোষযুক্ত কাঠ কাটিয়া ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে গাছ মরে না। গাছের ছালে এবং অনেক দিনের বুড়ো গাছের সারালো অংশে ঐ রকম নির্জীব কোষ অনেক দেখা যায়। তাই গাছের ছালের শুক্‌না অংশ চাঁচিয়া ফেলিলে গাছ মরে না এবং বড় বড় গাছের সারালো অংশ পোকায় খাইলে গাছ দুর্ব্বল হয় না।

কি কি মূল বস্তু দিয়া গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সেগুলির মধ্যে অঙ্গার অর্থাৎ কয়লা, হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ দিয়া কোষ-

প্রাচীর তৈয়ারি। কোষের প্রাচীর পুরু হইলেই তাহা কাঠ হয়। বৈজ্ঞানিকরা গাছের এই কঠিন অংশকে সেলিউল্‌স্ (Cellulose) বলেন।

কোষের ভিতরে যে জীব-সামগ্রী আছে, তাহাতেও অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং অঙ্গার থাকে। এগুলি ছাড়া নাইট্রোজেন এবং গন্ধকও একটু-আধটু মিশানো দেখা যায়।

যাহা হউক, কি-রকমে গাছের বৃদ্ধি হয় এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

একটা জিনিস আপনা হইতে ভাঙিয়া দুইটা হইয়া গেল। তার পরে সেই দুইটা ভাঙিয়া মোট চারিটি হইল এবং শেষে সেই চারিটি বার বার ভাঙিয়া অসংখ্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইল, —ইহা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। যখন গাছ বাড়িতে থাকে তখন তাহার কোষগুলিকে এই রকমেই বার বার ভাঙিতে দেখা যায়। গাছের তাজা কোষের মধ্যে জীব-সামগ্রী থাকে, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কোষ পুষ্ট হইলে ইহা আপনা হইতেই দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং সেই দুই ভাগের মধ্যে একটি কোষ-প্রাচীরের সৃষ্টি করে। কাজেই, গোড়ার একটা কোষ দুইটা হইয়া দাঁড়ায়। তার পর সেই দুইটা কোষ যখন বেশ পুষ্ট হয়, তখন তাহাদেরো প্রত্যেকটি আগের মতো দুইটা হইয়া পড়ে। সুতরাং আগের একটা কোষ চারিটি নূতন কোষের সৃষ্টি করে। কিন্তু এখানেই শেষ হয় না,—এই চারিটাই ক্রমে আটটা, এবং আটটা

ক্রমে ষোলটা ইত্যাদি হইয়া দাঁড়ায়। এই রকমে একটা কোষ হইতে অসংখ্য নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। ইহাতেই গাছ বাড়ে। কচি গাছে যে-সব কোষ থাকে, সেইগুলিই এই রকমে তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেশি হয়। বুড়ো গাছের কোষের এ-রকমে বাড়িবার শক্তি থাকে না। তাই বুড়ো গাছ অপেক্ষা কচি গাছই তাড়াতাড়ি বড় হয়।

কোষের ভিতরকার দ্রব্য

আমরা বলিয়াছি, গাছের কোষের ভিতরে জীব-সামগ্রী থাকে, কিন্তু কেবল জীব-সামগ্রীই কোষের ভিতরকার একমাত্র জিনিস নয়। কোনো কোনো কোষে উহা ছাড়া আরো দুই-একটা জিনিস দেখা যায়। আলু বা পাকা ফলের কোষ-প্রাচীর খুব পুরু হয় না। তোমরা যদি এই সব কোষ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা কর, তবে তাহার মধ্যে আর এক রকম জিনিসের শাদা-শাদা দানা দেখিতে পাইবে। এগুলি শ্বেতসারের দানা। ময়দা, চালের গুঁড়া, এরোরুট, বার্লি প্রভৃতি যে-সব জিনিসকে আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই শ্বেতসার. গাছের কোষের ভিতরে এইগুলি আগে জমা ছিল, আমরা তাহাই সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করি।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মানুষে খাইবে বলিয়াই বুঝি গাছের কোষে শ্বেতসার জমা থাকে। কিন্তু তাহা নয়। গাছরা মানুষের জন্য ভাবনা চিন্তা করে না। অথচ যাহাতে

নিজের দেহের বৃদ্ধি হয়, তাড়াতাড়ি ফুল-ফল হয়, বীজ হইতে শীঘ্র চারা জন্মে, গাছরা তাহাই চায়। শ্বেতসার যেমন মানুষের খাদ্য, তেমনি তাহা গাছেরও খাদ্য। মানুষ কি করিয়া খাবার সঞ্চয় করিয়া রাখে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? যখন চাল, ডাল, নুন, তেল সস্তা থাকে, তখন তাহারা বৎসরের খোরাক জোগাড় করিয়া ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখে; বর্ষাকাল আসিতেছে দেখিয়া তাহারা আগে থাকিতে শুক্‌না কাঠ ঘরে মজুত রাখিয়া দেয়। এই রকম করে বলিয়াই যখন সব জিনিসের দর বাড়িয়া যায় তখন গৃহস্থের কষ্ট হয় না। গাছরাও অসময়ে ব্যবহারের জন্যই তাহাদের দেহের নানা জায়গায় শ্বেতসার সঞ্চয় করিয়া রাখে। আদা, হলুদ, আলু, ওল, কচু মূলা প্রভৃতি গাছের মাটির তলার গুঁড়িতে ও শিকড়ে যে শ্বেতসার জমা থাকে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? গাছের পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু ঐসব গাছের মাটির তলার শিকড় ও গুঁড়ির শ্বেতসার নষ্ট হয় না। ইহাই পর বৎসরে নূতন গাছের অঙ্কুর উৎপন্ন করায়।

যব, গম, ধান ইত্যাদি অনেক গাছের বীজে প্রচুর শ্বেতসার মজুত থাকে। ভিজে মাটিতে পড়িলে যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়, তখন সেগুলি বীজের শ্বেতসার খাইয়াই বড় হয়। মা যেমন নিজের বুকের দুধ দিয়া শিশুদের পালন করেন, বীজগুলিও সেই রকমে তাহাদের শ্বেতসার দিয়া শিশু চারাগুলিকে বড় করে।

তিল, সরিষা, তিসি, নারিকেল প্রভৃতি অনেক গাছের বীজে তেল থাকে। আবার খেজুর, তাল, আক, বীট্, প্রভৃতি গাছের দেহে চিনি থাকে। এই দুইটি জিনিসও গাছের কোষে দেখা যায়। তেল ও চিনি খুব বলকারক। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে যাহাতে সেগুলি তেল খাইয়া বড় হয়, তাহারি জন্য উহা বীজে সঞ্চিত থাকে। অসময়ের জন্য গাছরা যে-সব খাদ্য দেহে সঞ্চিত রাখে, মানুষ কলে ফেলিয়া ঘানিতে পিষিয়া সেইগুলি বাহির করে এবং নিজের কাজে লাগায়। মানুষ কি-রকম ডাকাত, একবার ভাবিয়া দেখ।

গাছের পাতাগুলি কেমন সবুজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। গাছের সবুজ রঙে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। এমন গাছও অনেক আছে, যাহার ডাল পাতা সবই সবুজ। যে রঙে ডালপালা ও পাতা সবুজ হয়, তাহাও গাছের কোষের ভিতরে থাকে। পাতার কোষ যদি তোমরা বড় অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে ইহার ভিতরে দানার আকারে ঐ সবুজ-রঙ্ দেখিতে পাইবে। ইহাকে বৈজ্ঞানিকরা পত্র-হরিৎ (chlorophyl) বলেন। এই জিনিসটি গাছের ভিতরকার কোষে থাকে না এবং শিকড়েও থাকে না। তাই গাছের কাঠ ও শিকড় সবুজ নয়।

পত্র-হরিৎ বড় মজার জিনিস। আমাদের পেট আছে, পেটের ভিতরে কত নাড়ী-ভুঁড়ি আছে। যাহা খাই, তাহা সেই পেটের ভিতরে পড়ে। তার পরে সেখানকার নানা যন্ত্র হইতে

নানা পাচক রস বাহির হইয়া সেই খাবারের সঙ্গে মিশে। ইহাতে খাবার হজম হইয়া যায় এবং তাহার সার জিনিস দেহের পুষ্টির কাজে লাগে। গাছদের পেট নাই এবং পাক-যন্ত্রও নাই। তাহারা পাতা দিয়া বাতাস হইতে যে-সব খাবার চুষিয়া লয় তাহা ঐ পত্র-হরিৎ এবং সূর্য্যের আলো দিয়া হজম করে। ইহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয়। সূর্য্যের আলো না পাইলে পাতার কোষে পত্র-হরিৎ জন্মে না। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? যে-ঘরে একটুও আলো আসে না, সেখানে টবে করিয়া কোনো গাছ রাখিয়া দিলে তাহার সবুজ পাতা কয়েক দিনের মধ্যেই শাদা হইয়া যায় এবং তার পরে খাবার না পাইয়া গাছ মরিয়া যায়। তোমাদের বাগানে যে-সব ছোটো ফুলের চারা আছে, তাহার একটিকে গাম্‌লা চাপা দিয়া রাখিয়ো; দেখিবে, দু'তিন দিনের মধ্যে তাহার সবুজ পাতা শাদা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের আলো না পাওয়াতে পাতায় পত্র-হরিৎ জন্মে না, তাই সেগুলি শাদা হইয়া যায়। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

তাহা হইলে দেখ,—গাছের কোষে কেবল জীব-সামগ্রী থাকে না। বিশেষ বিশেষ কোষে শ্বেতসার, তেল এবং পত্র-হরিৎও থাকে। এগুলি গাছের বিশেষ উপকার করে।

গাছের ভিতরকার অবস্থা

লাউ বা কুমড়ার কচি ডগা সিদ্ধ করিয়া যে সূতার মতো

আঁশ পাওয়া যায়, সেগুলির কথা তোমাদিগকে এখন বলিব। পাটের সরু আঁশ পাকাইয়া যেমন দড়ি তৈয়ারি হয়, সেই রকম চুলের চেয়েও সরু অনেক আঁশ একত্র হইয়া লাউয়ের এক একটি মোটা আঁশ প্রস্তুত হয়। তোমরা ছুরির ডগা দিয়া লাউয়ের ডগার আঁশ পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে,একটা মোটা আঁশ হইতে রেশমের চেয়েও সরু অনেক আঁশ বাহির হইয়া আসিতেছে।

অণুবীক্ষণে সেগুলিকে কি-রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবিটাকে স্ক্রুপের প্যাঁচওয়ালা লম্বা নলের মতো দেখিতেছ না কি ? প্যাঁচের দাগগুলি নলের ভিতরের দিকে থাকে। এ-গুলিকে বৈজ্ঞানিকরা কোষ-নলিকা (vessels) বলেন। গাছের সাধারণ কোষগুলি যখন একের উপরে আর একটা আসিয়া জোড়া লাগিয়া যায় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে
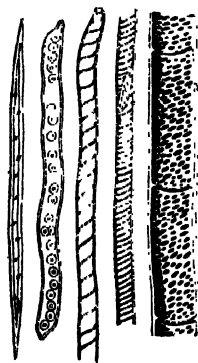
প্রাচীর খসিয়া পড়ে, তখনি এই রকম নলের উৎপত্তি হয়।

সকল গাছেই কোষ-নলিকা আছে। শাল, সেগুন কাঁটাল প্রভৃতি গাছেও আছে। কিন্তু ইহাদের কোষ-নলিকায় ইস্ক্রুপের প্যাঁচের দাগ দেখা যায় না। তাহার বদলে নলগুলির গায়ে এলোমেলো ভাবে ছিটে-ফোঁটা দাগ থাকে। ছবিতে

এই রকম কোষ-নলিকাও দেখিতে পাইবে। সেগুন বা শাল কাঠ খুব পাতলা করিয়া চিরিলে তাহার গায়ে যে ছিঁটে-ফোঁটা দাগ দেখা যায়, সেগুলি কোষ-নলিকারই দাগ।

ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, আমরা যাহাকে কাঠ বলি, তাহা কোষ-নলিকা ও তাহার পাশের পুরু প্রাচীর-ওয়ালা লম্বা লম্বা কোষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাশে ঐ লম্বা লম্বা পুরু কোষ সাজানো থাকে বলিয়াই কোষ-নলিকাগুলি শক্ত হইয়া খাড়া থাকিতে পারে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কোষ-নলিকার মাঝের ছিদ্রগুলি বুঝি খালি থাকে। কিন্তু তাহা নয়। গাছের শিকড় মাটি হইতে যে খাবারের রস সংগ্রহ করে, তাহার কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। সেই খাদ্য-রস কোষ-নলিকা দিয়াই উপরে উঠে এবং গাছের সকল অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে,—পাতা, ডগা, ফুল, ফল কিছুই বাদ যায় না।

তাহা হইলে দেখ,—গাছের যে-অংশকে আমরা কাঠ বলি, তাহা কোষ-নলিকা এবং পুরু প্রাচীর-ওয়ালা লম্বা কোষ দিয়া প্রস্তুত। বৈজ্ঞানিকরা ইহাকে নলিকাগুচ্ছ (Vascular Bundle) বলিয়া থাকেন।

দ্বি-বীজপত্রী গাছ কোন্‌গুলিকে বলে, তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। অঙ্কুরিত হইবার সময়ে যে-সব গাছের দুইটি করিয়া বীজপত্র বাহির হয়, তাহাদের সকলেই দ্বি-বীজ-পত্রী গাছ। আম, কাঁটাল, তেঁতুল, ছোলা, মটর প্রভৃতি দ্বিবীজ-

পত্রী। অঙ্কুরিত হইবার সময়ে যাহাদের একটিমাত্র বীজপত্র বাহির হয় তাহাদিগকে এক-বীজপত্রী বলে। ধান, গম, যব, ভুট্টা, ঘাস প্রভৃতি এক-বীজপত্রী। এই দুই রকম গাছের ভিতরে নলিকাগুচ্ছ কি-রকমে সাজানো থাকে, তাহা তোমাদিগকে একে একে বলিব।

দ্বি-বীজপত্রী গাছের নলিকাগুচ্ছ

দ্বি-বীজপত্রী গাছের গুঁড়িকে এড়োএড়ি ভাবে চিরিলে যে-রকম দেখায় এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। গাছটির বয়স বেশি নয়, তাই তা'র মাঝে এখনো অসার অংশ আছে। চারা গাছে এই অংশ দিয়াও খাদ্যরস আনাগোনা করে। অসার অংশের চারিদিকে যে শাদা ও কালোর ছিটে-ফোঁটা সাজানো দেখিতেছ, তাহাই কাঠ।
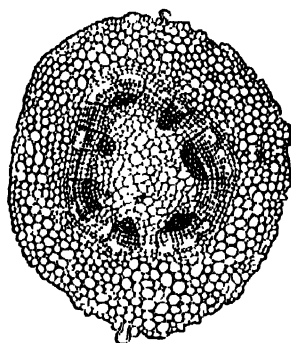
আগে যে নলিকাগুচ্ছের কথা বলিয়াছি, এগুলি তাহা দিয়াই তৈয়ারি। শাদা ফোঁটাগুলি উহার কোষ-নলিকা।

কোষ-নলিকা ও তাহার গায়ের পুরু প্রাচীরওয়ালা কোষগুলি সাধারণ কোষের মতো দুই ভাগ হইয়া সংখ্যায় বাড়ে না। যে-কোষগুলি নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি করে, তাহা শাদা রেখার মতো ছবিতে গোলাকারে আঁকা আছে। এগুলি বড়

মজার জিনিস। ইহারা গাছের ভিতর দিকে নলিকাগুচ্ছ অর্থাৎ কাঠের সৃষ্টি করে এবং বাহির দিকে ছাল ও ছালের আঁশের উৎপত্তি করে। এইজন্য বৈজ্ঞানিকরা এই সব কোষকে উৎপাদক-কোষ (cambrium) নাম দিয়াছেন। এগুলি গাছের কাঠ এবং ছালের মধ্যে থাকে,—তাই কাঠকে যেমন বাড়ায়, এবং ছালকেও সেই রকমে বাড়ায়। উৎপাদক-কোষগুলিই গাছকে মোটা করে।
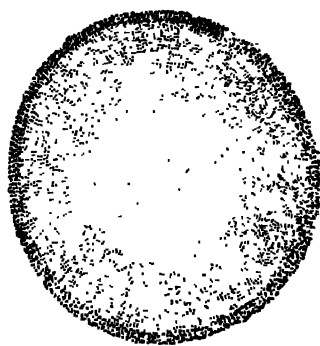
দ্বি-বীজপত্রী গাছের গুঁড়ি এক-বীজপত্রী গাছের গুঁড়ি

বৎসরের সকল সময়ে গাছের সমান তেজ থাকে না,—ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বৃষ্টির জল পাইয়া আমাদের দেশের গাছপালা বর্ষায় খুব বাড়ে। তার পরে বড় বড় গাছের আর বেশি বাড় থাকে না। বৃষ্টির জল পাইলে ছাঁল ও কাঠের মধ্যেকার সেই উৎপাদক-কোষগুলি খুব জোর পায়, তাই ঐ-সময়ে সেগুলি তাড়াতাড়ি নূতন

কাঠ তৈয়ারি করিতে পারে। বড় গাছের গুঁড়ি যখন করাত দিয়া এড়োএড়ি ভাবে কাটা যায়, তখন কাঠের গায়ে পরে পরে চাকার মতো দাগ থাকে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? এক-এক বৎসরে যে নূতন কাঠের উৎপত্তি হয়, ঐ দাগগুলি তাহারি।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় ঐরকম দাগ-ওয়ালা গুঁড়ির একটি ছবি দিলাম। ইহাতে তেরটি চাকার মতো দাগ পর-পর সাজানো আছে। গাছটির বয়স তের বৎসর হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। তোমাদের বাড়ীতে যখন কাঠের গুঁড়ি চেরা হইবে, তখন তাহার দাগ গুণিয়া দেখিয়ো,—তাহা হইলে গাছটির বয়স কত হইয়াছিল বলিয়া দিতে পারিবে। ডান পাশের ছবিটি এক-বীজপত্রী গাছের ভিতরকার ছবি। ইহাতে নলিকাগুচ্ছ চাকার মতো সাজানো থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

গাছের ছাল

এখন গাছের ছালের কথা তোমাদিগকে বলিব। অনেক দ্বি-বীজপত্রী গাছের ছাল কাঠ হইতে পৃথক্ করিয়া খুলিয়া লওয়া যায়। আতা, পেয়ারা ও ভেরেণ্ডার ডাল কাটিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, কাঠ হইতে ছাল আপনিই খুলিয়া আসিতেছে। এই ছালেরই নীচে উৎপাদক কোষ থাকে। সেগুলি গাছের গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ভিতর দিকে নলিকা-গুচ্ছ অর্থাৎ কাঠের সৃষ্টি করে এবং বাহির দিকে ছালের উৎপত্তি করে।

যাহা হউক, তোমরা যদি আম, শাল, মহুয়া, বেল বা অন্য যে-কোনো গাছের ছাল পরীক্ষা কর, তাহা হইলে উহাতে তিনটি স্তর দেখিতে পাইবে। প্রথমেই অর্থাৎ উপরেই থাকে কর্কের স্তর, তার পরে সবুজ রঙের একটি স্তর এবং সকলের শেষে সূতার মতো আঁশের স্তর।

ছালের কর্কের স্তর কাহাকে বলিতেছি, তোমরা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। গাছের গুঁড়িতে ও মোটা ডাল-পালায় যে ফাটা-ফাটা শুক্‌নো আবরণ থাকে, তাহাই কর্কের স্তর। বট, অশথ, পেয়ারা প্রভৃতি গাছের ছালে তোমরা এই স্তরটিকে খুব পুরু দেখিতে পাইবে না। একটু ছুরির খোঁচা বা কাঠির আঁচড় দিলে ইহাদের পাৎলা কর্কের স্তর

কাটিয়া যায় এবং ভিতরকার সবুজ স্তর বাহির হইয়া পড়ে। আম, জাম, বকুল, শাল, মহুয়া, শিরিষ, শিমূল, শিশু, সেগুন প্রভৃতি গাছের কর্কের স্তর খুব পুরু। ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া দেখিয়ো ; এই স্তরে রসের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না—ইহা শুক্‌না কাঠের মতই নীরস। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে, ইহাতে তেলের মত এক রকম জিনিস মিশানো দেখা যায়। তাই অয়েল-ক্লথ্ যেমন জলে ভিজে না, সেই রকম কর্কের স্তরও জলে ভিজে না। শুক্‌না কাঠ জলে ভিজিলে রৌদ্রে পুড়িলে পচিয়া যায়। ঐ তেলের মতো জিনিসটা কর্কে লাগানো থাকে বলিয়া ছালের ফাঁকে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিলেও ছাল পচে না। যে কর্ক দিয়া বোতল এবং শিশির মুখ বন্ধ করা হয়, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহা দক্ষিণ য়ুরোপের এক রকম ওক গাছেরই ছাল। বোতলের কর্ক জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহা জল চুষিয়া লইবে না। গায়ে তেলের মতো জিনিস লাগানো থাকে বলিয়াই ইহা হয়।

গুঁড়ি ডাল-পালা কর্ক দিয়া ঢাকা থাকায় গাছের কি উপকার হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। শরীরের ভিতর দিয়া গাছদের খাদ্যরস সর্ব্বদা চলাফেরা করে। ডাল-পালা গুঁড়ি যদি কর্ক দিয়া ঢাকা না থাকিত, তাহা হইলে ঐসব রস রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া যাইত না কি? যাহাতে রৌদ্র-বৃষ্টিতে গাছের কোনো ক্ষতি করিতে না পারে,

তাহারি জন্য ছালের উপরে শুক্‌না কর্ক লাগানো থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া গাছের কি-রকম শত্রু তাহা তোমরা জানো,—সবুজ রঙের সতেজ গাছ দেখিলেই ইহারা ছুটিয়া গিয়া তাহা খাইয়া ফেলে। গাছের ছালে যদি কর্ক লাগানো না থাকিত, তাহা হইলে ঐসব জন্তুর গ্রাস হইতে গাছ রক্ষা পাইত না। বট, অশথ প্রভৃতি গাছের ছালে পুরু কর্ক নাই বলিয়া সেগুলির আত্মরক্ষার অন্য ব্যবস্থা আছে। ইহাদের ছালে কামড় দিলেই দুধের মতো শাদা বিস্বাদ আঠা বাহির হয়। এই বিস্বাদ জিনিসটা জিভে ঠেকিলে গরু-বাছুর দ্বিতীয়বার ঐ-সব গাছে কামড় দেয় না। তেশিরে সিজ, মনসা সিজের ডালের ছালে কর্ক থাকে না, কিন্তু কাঁটা লাগানো থাকে। ইহাই এই-সব গাছকে গরু-বাছুরের উৎপাত হইতে রক্ষা করে।

গায়ে ফোড়া বা খোস-পাঁচড়া হইলে ঘায়ের জায়গার চামড়া উঠিয়া যায়। তার পরে কয়েক দিন ওষুধ লাগাইলে সেখানে নূতন চামড়া জন্মায়। তখন ঘা সারিয়া যায়। গাছের গায়ের এ-রকম ঘা তোমরা দেখ নাই কি? আমরা যখন কোনো গাছের ডাল চাঁচিয়া ফেলি, তখন চাঁচা জায়গার ছাল উঠিয়া যায়, ইহাই গাছের গায়ের ঘা। এই ঘা বেশি দিন থাকিলে সেখানে পোকা ধরে এবং পোকায় কাঠ খাইয়া গাছের গায়ে গর্ত্ত করে। ইহাতে গাছ মরিয়া যায়। তোমদের আম-বাগানে এই রকম পোকা-ধরা দুই একটি বুড়ো গাছ খোঁজ করিলেই দেখিতে পাইবে।

আমাদের নিজের গায়ে বা পোষা জন্তুদের গায়ে ঘা হইলে আমরা ওষুধ দিই। ইহাতে ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু গাছদের ডাক্তার বা কবিরাজ নাই। তাই যাহাতে গাছের গায়ের ঘা শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সে ব্যবস্থা তাহার ছালই করে। তোমাদের বাগানের কোনো গাছের যদি ডাল কাটা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিবে, কয়েক মাসের মধ্যে চারিদিকের ছাল বাড়িয়া সেই কাঁচা জায়গাটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের ঘা শুকাইয়া গেলেও তাহার দাগ চিরকাল গায়ে থাকে। দুরন্ত ছেলেদের হাতে, কপালে ও চোখের উপরে কত কাটা ঘায়ের দাগ আছে দেখ নাই কি? ঘা শুকাইয়া গেলে গাছদের গায়েও তাহার দাগ অনেক দিন থাকে। প্রায় পনেরো বৎসর আগে ছুরি দিয়া একটা শাল গাছের ছালে আমরা কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো সেই ঘায়ের দাগ আছে। দাগ দেখিয়া অক্ষর কয়েকটি আজো পড়া যায়।

তাহা হইলে দেখ, ছাল ও তাহার উপরকার কর্ক গাছের কম উপকার করে না।

বট, অশথ প্রভৃতি গাছের ছালে যে একটু কর্ক থাকে, তাহা উঁচু-নীচু নয়। কিন্তু আম, জাম, সেগুন, নিম প্রভৃতি গাছের কর্ক ভয়ানক অসমান। কেবল ইহাই নয়, ইহাদের কর্কে লম্বা লম্বা ফাটালও থাকে। তোমরা এই ফাটালগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? সেগুলিকে কখনই গাছের চারিদিক

গোলাকারে বেড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। তোমাদের পুরানো আমগাছটিকে পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ছালের চির্-গুলি গুঁড়ির গোড়া হইতে লম্বালম্বিভাবে উপরে উঠিয়াছে।

কর্কের এই-রকম ফাটালগুলি কি-রকমে হয়, বলিতে পার কি ? বোধ হয়, পার না। গাছের গুঁড়ি যেমন প্রতি বৎসরেই একটু একটু মোটা হয়, কর্ক সে-রকমে বাড়ে না। কাজেই, ভিতর দিক হইতে ঠেলা পাইয়া কর্ক চিরিয়া যায়। এই রকমেই ছালের উপরটা অসমান হইয়া দাঁড়ায়।

ছালের উপরকার কর্কের অনেক কথাই বলিলাম। কি-রকমে ইহা উৎপন্ন হয়, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

আগে যে উৎপাদক-কোষের বিষয় বলিয়াছি, তোমাদের বোধ হয়, তাহা মনে আছে। কর্কের স্তরের ঠিক্ নীচে সেই রকম উৎপাদক-কোষের একটি স্তর থাকে। ইহাকে তোমরা কর্ক-উৎপাদক (cork cambium) স্তর নাম দিতে পারে। কাঠের উপরকার উৎপাদক-কোষগুলি যেমন একদিকে নলিকাগুচ্ছ এবং আর একদিকে ছালের সৃষ্টি করে, কর্ক-উৎপাদক কোষ তাহা করে না। ছালের উপরে কর্ক উৎপন্ন করাই ইহাদের কাজ। বট, অশথ, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে কর্ক-উৎপাদক কোষ ছালের খুব উপরে থাকে, তাই এগুলিতে মোটা কর্ক হয় না। আম, কাঁটাল, জাম, শাল প্রভৃতি গাছে উহা ছালের খুব ভিতরের দিকে থাকে। এজন্যই এ-সব গাছের কর্ক খুব পুরু হয়।

শীতের শেষে অনেক গাছেরই পাতা ঝরিয়া পড়ে। তোমাদের বাঁশ-বাগানে ঐসময়ে গাছের তলায় রাশীকৃত ঝরা পাতা দেখিতে পাইবে। বেল, আমড়া, জিউলি, গোলকচাঁপা, পাত-বাদাম, শিমূল প্রভৃতি অনেক গাছের সব পাতাই চৈত্র মাসে ঝরিয়া পড়ে। তখন গাছগুলির কি-রকম অবস্থা হয়, তোমরা দেখ নাই কি? তখন মনে হয়, সেগুলি মরিয়াই গিয়াছে। একটু নজর রাখিলে এই রকম নেড়া গাছ শীতের শেষে তোমরা অনেক দেখিতে পাইবে।

এই পাতা-ঝরানো কাজটিও কর্ক-উৎপাদক কোষ দ্বারা হয়। সময় উপস্থিত হইলেই ছালের কর্ক-উৎপাদক কোষ-গুলি পাতার বোঁটার তলায় ধীরে ধীরে কর্কের সৃষ্টি করে। কাজেই, ইহাতে পাতায় রস আসা বন্ধ হইয়া যায় এবং সেগুলি হল্‌দে হইয়া দাঁড়ায়। তারপরে যখন বোঁটার নীচে বেশ ভালো করিয়া শুক্‌না কর্কের উৎপত্তি হয়, তখন পাতাগুলি টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে। ডালের গায়ে ঝরা-পাতার দাগ তোমরা দেখ নাই কি? যে-কোনো গাছের ডাল পরীক্ষা করিলে ইহা দেখিতে পাইবে। জোর করিয়া আমাদের মাথার চুল ছিঁড়িলে চুলের গোড়ায় ঘা হয় এবং সেখান দিয়া রক্ত পড়ে। জোর করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িলে, সেই রকম গাছের গায়ে ঘা হয় এবং সেখান দিয়া রস পড়ে। ঝরা পাতার বোঁটার নীচে কর্ক উৎপন্ন হয় বলিয়া সেখানে তোমরা ঐ-রকম ঘা দেখিতে পাইবে না।

ছালের প্রথম স্তর সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমরা শুনিলে, এখন দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ কর্কের ঠিক নীচেকার স্তরের কথা তোমাদিগকে বলিব। এখানকার কোষগুলি প্রায়ই পত্র-হরিতে ভর্ত্তি থাকে। তাই ইহার রঙ্ অনেক সময়েই সবুজ দেখা যায়। সবুজ পাতা যেমন গাছের খাবার তৈয়ারি করে, ছালের ভিতরকার সবুজ অংশ কতকটা সেই রকমেই গাছের খাদ্য প্রস্তুত করে।

ছালের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সব-নীচেকার স্তরটি গাছের বিশেষ উপকারী। কাঠের ঠিক্ উপরকার যে উৎপাদক-কোষের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, ছালের তৃতীয় স্তর সেই কোষের সৃষ্টি করে। একের উপরে আর একটা কোষ দাঁড়াইলে কি-রকমে কোষ-নলিকার সৃষ্টি হয়, তাহা তোমরা আগে শুনিয়াছ। এখানেও সেই প্রকারে উৎপন্ন কোষ-নলিকা দেখা যায়। পাতায় যে-সব খাদ্য-রস তৈয়ারি হয়, তাহা এই নলগুলি দিয়া নীচে নামিয়া গাছের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।
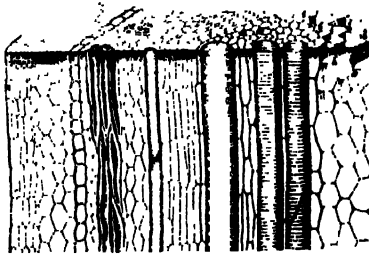
গাছের ছাল, কাঠ এবং মাঝের অসার অংশের নলিকাগুচ্ছ ও কোষ

সরু নলকে খাড়া করিয়া দাঁড় করানো বড় মুস্কিল। পাশে একটা কিছু অবলম্বন না পাইলে তাহা ভাঙিয়া যায়। ছালের সরু

নলগুলিকে খাড়া রাখিবার জন্য সেই রকমের ব্যবস্থা আছে। সূতার মতো মোটা কতকগুলি আঁশ ঐ নলগুলিকে ঘিরিয়া থাকে,—ইহাতেই সেগুলি ভাঙিয়া পড়ে না। তোমরা গাছের ছালে এই সব আঁশ দেখ নাই কি? পাট ও শণ গাছের ঐ আঁশগুলিকেই আমরা পাট এবং শণ বলি। সব গাছের ছালেই এই রকম আঁশ থাকে। পাট, শণ, প্রভৃতির আঁশ শক্ত ও লম্বা বলিয়া, তাহা দিয়া দড়ি-দড়া তৈয়ারি করা হয়।

তাহা হইলে দেখ, ছাল গাছের কম উপকারী নয়। ইহাই ডাল-পালাকে ঢাকিয়া রাখে, তাই গাছের ভিতরকার রস রৌদ্র-বৃষ্টি এবং গরু-বাছুরের উৎপাতে নষ্ট হয় না। ইহা ছাড়া ছালে যে লম্বা নল থাকে, সেগুলি দিয়া পাতায় প্রস্তুত খাদ্যরস আনাগোনা করিয়া গাছকে বাঁচাইয়া রাখে। তোমরা কোনো আগাছার গুঁড়ির চারিদিক হইতে এক আঙুল চওড়া ছাল ছুরি দিয়া উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, কয়েক দিনের মধ্যে গাছটি মরিয়া যাইবে। ছাল উঠাইয়া ফেলায় পাতার খাদ্যরস গুঁড়ির দিকে নামিতে পারে না,—ইহাতেই গাছ অনাহারে মারা যায়।

বাব্‌লা, আম, কাঁটাল, বট, অশথ প্রভৃতি গাছের ছাল কাটিলেই আঠা বাহির হয়। রবার, ধুনা প্রভৃতি জিনিসগুলি গাছের আঠা ভিন্ন আর কিছুই নয়। রবারের গাছ কতকটা বট গাছেরই মতো। আমরা ছেলেবেলায় এই গাছের ছাল

চিরিয়া আঠা সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা দিয়া বল্ তৈয়ারি করিয়াছি। হিমালয়ের পাইন্‌জাতীয় এক রকম গাছের আঠাই ধুনা। শাল গাছের আঠা হইতেও উত্তম ধুনা হয়। যে-সকল কোষের মধ্যে গাছের আঠা প্রস্তুত হয়, সেগুলিও ছালের তৃতীয় স্তরে সাজানো থাকে।

এক-বীজপত্রী গাছের গুঁড়ি

দ্বি-বীজপত্রী গাছের ভিতরকার যাহা কিছু মোটামুটি জানিবার ছিল একে-একে তাহা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন এক-বীজপত্রী গাছের কথা তোমাদিগকে বলিব।

আক, ভুট্টা, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ এক-বীজপত্রী। এই সব গাছের গুঁড়িতেও নলিকাগুচ্ছ থাকে। কিন্তু দ্বি-বীজপত্রী গাছের ভিতরে সেগুলি যেমন চাকার মতো সাজানো থাকে, এই-সব গাছে সে-রকমে সাজানো থাকে না। তোমরা এবারে যখন আক খাইবে, তখন পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, শক্ত শক্ত লম্বা আঁশ এলোমেলো ভাবে আকের ভিতরে সাজানো আছে। এইগুলিই নলিকাগুচ্ছ। ইহাতে যে নলিকাকোষ থাকে তাহারি ভিতর দিয়া খাদ্য-রস শিকড় হইতে উপরে উঠে।

আড়া-আড়িভাবে কাটিলে আক বা ভুট্টার ডগাকে যে-রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখ, নলিকাগুচ্ছ কত এলোমেলো করিয়া সাজানো আছে। কিন্তু এগুলির সঙ্গে উৎপাদক-কোষ একটিও থাকে না। উৎপাদক-কোষই গাছের গুঁড়িকে মোটা করে এবং ছালের সৃষ্টি করে। এগুলি থাকে না বলিয়াই
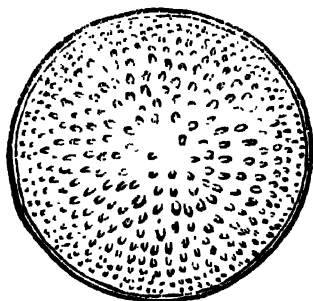
এক-বীজপত্রী গাছের নলিকাগুচ্ছ

এক-বীজপত্রী গাছের গুঁড়ি বৎসরে বৎসরে মোটা হয় না এবং তাহাদের গায়ে ছালও জন্মে না। আম, কাঁটাল, জাম প্রভৃতি গাছে যেমন ছাল থাকে, আক, বাঁশ, তাল খেজুর প্রভৃতি গাছে সে-রকম ছাল দেখিয়াছ কি? এ-সব গাছের যে-অংশকে আমরা ছাল বলি, তাহা নলিকাগুচ্ছ দিয়াই প্রস্তুত। সেগুলি গুঁড়ির বাহিরের দিকে খুব কাছাকাছি থাকে বলিয়াই গাছের গা শক্ত হয়।

দ্বি-বীজপত্রী গাছের ছালের নীচে উৎপাদক-কোষ থাকে বলিয়াই ইহাদের গুঁড়ি বৎসরে বৎসরে মোটা হয়। কোনো গাছের গুঁড়িতে যদি শক্ত করিয়া লোহার তার আঁটিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দুই এক বৎসরের মধ্যে তারগাছটি ছালের মধ্যে প্রবেশ করে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? উৎপাদক-কোষ গাছের গুঁড়িকে প্রতি বৎসরই মোটা করে বলিয়া ইহা ঘটে। তোমাদের বাগানের কোনো একটি চারা গাছকে বেড়িয়া ঐরকমে লোহার তার বাঁধিয়া রাখিয়ো; দেখিবে, এক বৎসরের মধ্যে তারগাছটি ছালের ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাল, নারিকেল বা খেজুর গাছে তার বাঁধিয়া রাখিলে, তাহা দশ বৎসরেও ছালের ভিতরে ডুবিবে না। এই-সব এক-বীজ-পত্রী গাছের ভিতরে উৎপাদক-কোষ নাই, তাই ইহাদের গুঁড়ি মোটা হয় না। পঞ্চাশ ষাট্ বৎসরের তাল, খেজুর, বা নারিকেল গাছ পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, পাঁচ বৎসরের ছোটো গাছের গুঁড়ির বেড় যে-রকম, ইহাদেরো ঠিক্ সেই রকম।

পাতা

এইবার তোমাদিগকে গাছের পাতার কথা বলিব। নানা রকম গাছে তোমরা নানা রকম পাতা দেখিতে পাও। কোনো গাছের পাতা ছোটো, কোনো গাছের পাতা বড়। বড় পাতার নাম করিতে বলিলে হয়ত তোমরা মানকচু, পদ্ম বা কলার পাতার নাম করিবে। কিন্তু এগুলির চেয়েও বড় পাতা অনেক আছে। আফ্রিকার এক রকম পদ্মের পাতা প্রায় আট হাত চওড়া দেখা গিয়াছে। সুতরাং এই পাতার উপরে তোমরা চারি পাঁচজন অনায়াসে শুইয়া থাকিতে পারিবে। এই গাছের ফুলও খুব বড় হয়। কাজেই, দেখ, পাতার আয়তনের সীমা নাই।

গাছে গাছে পাতার আকৃতি যে কত রকম হয়, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। গোল, লম্বা, ছক্‌-কাটা,—কত রকমেরই পাতা দেখা যায়। গাছ চিনিতে হইলে পাতার আকৃতি জানিয়া রাখা দরকার।

গাছের ডাল-পালায় যে-রকম পাতা সাজানো থাকে, তাহাও সব গাছে এক রকম নয়। খেজুর গাছে যে-রকমে পাতা সাজানো আছে, পেয়ারা গাছে তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে না। আবার শিমূল গাছের পাতা সাজানোর সহিত নিম গাছের পাতা সাজানো মিলিবে না। পেয়ারা, আম, গোলাপ প্রভৃতি প্রত্যেক গাছেই ভিন্ন ভিন্ন রকমে পাতা-সাজানো থাকে। কাজেই, গাছের পরিচয় লইতে হইলে,

তাহার পাতাগুলি ডালে ও গুঁড়িতে কি-রকমে সাজানো আছে, তাহা জানাও দরকার।

এগুলি ছাড়া কি দিয়া পাতা তৈয়ারি এবং পাতা দ্বারা গাছের কি উপকার হয়, এ-সব কথাও জানা প্রয়োজন।

কত রকম-রকম গাছ কত রকম-রকম পাতা রৌদ্রে মেলিয়া আমাদের চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাতাগুলি কি-রকম, তাহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? তাই একে একে নানা গাছের পাতার কথা তোমাদের বলিব।

পাতার আকৃতি

এখানে দুইটি পাতার ছবি দিলাম। প্রথমটি বাঁশ পাতার এবং দ্বিতীয়টি আম পাতার। আম ও বাঁশের ডাল-পালায় এই রকমেরই গোটা গোটা পাতা লাগানো থাকে না কি? তোমাদের বাঁশ ঝাড়ের কাছে গিয়া দেখিয়া আসিয়ো। সেখানে হয়ত আম গাছও পাইবে। যাহা হউক, আম ও বাঁশের পাতাতে একটার বেশি ফলক নাই বলিয়া সেগুলিকে এক-

বাঁশ পাতা আম পাতা
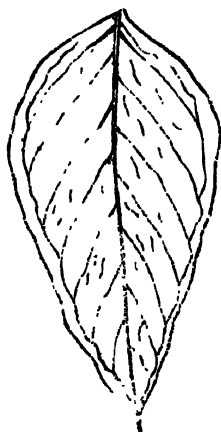
ফলক (Simple leaf) পাতা বলা হয়। আম, ফল্‌সা, সেগুন,

পাতার আকৃতি

জাম, পেয়ারা, কাঁটাল, বট, বকুল, অশথ, শাল ইত্যাদি হাজার হাজার গাছে তোমরা এক-ফলক পাতা দেখিতে পাইবে।

এখানে তেঁতুল পাতার একটি ছবি দিলাম। দেখ, একটা ডাঁটার দুই পাশে কত ছোটো ছোটো পাতা সাজানো আছে। কাজেই, এ-রকম পাতাকে এক-ফলক বলা যায় না,—ইহা বহু-ফলক (Compound leaf) পাতা। বহু-ফলক পাতার গাছ তোমাদের বাগানে অনেক আছে। শিমূল, বেল, নিম, লজ্জাবতী, কৃষ্ণচূড়া, বকফুল, সজিনা, আমলকী কতবেল, বাব্‌লা, গোলাপ ইত্যাদি অনেক গাছেরই পাতা বহু-ফলক। বহু-ফলক-পাতাওয়ালা সব গাছের নাম লিখিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড বই হইয়া দাঁড়াইবে।

তেঁতুল পাতা

বহু-ফলক পাতার এক একটি ছোটো ফলককে পত্রক (Leaflet) বলা হয়। বেলের পাতায় সাধারণতঃ তিনটি করিয়া পত্রক থাকে। তেঁতুলের পাতায় কতগুলি পত্রক আছে, তোমরা গুণিয়া দেখিয়ো। ইহার সংখ্যা সব পাতায় একই দেখিতে পাইবে না।
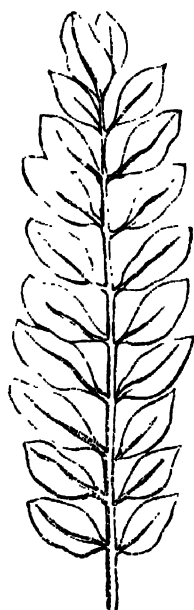
কিন্তু বহু-ফলক পাতা মাত্রই ঠিক্ তেঁতুল পাতার মতো নয়। তেঁতুল পাতার ছোটো ফলকগুলি একটা শির-দাঁড়ার (Rachis) দুই পাশে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। দেখিলে পাখীর পালকের কড় মনে পড়িয়া যায় না কি? তাই তেঁতুলের মতো বহু-ফলক পাতাকে পক্ষাকার (Pinnate) নাম দেওয়া হয়। নিম, কামিনীফুল, গোলাপ, আমলকী প্রভৃতি অনেক গাছেই তোমরা পক্ষাকার পাতা দেখিতে পাইবে। তোমাদের বাগানে খোঁজ করিয়ো; আরো অনেক এই রকম পাতা পাইবে।

শিমূল বা বেলের পাতা তোমরা ভালো করিয়া দেখিয়াছ কি? আজ-ই এই পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহার পত্রক অর্থাৎ ছোটো পাতাগুলি তেঁতুলের পাতার মতো সাজানো নাই; পাতার বোঁটার এক জায়গা হইতেই পত্রকগুলি বাহির হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন আঙুলগুলি ফাঁক করিয়া হাতখানি মেলিয়া রাখিয়াছে। ছোটো ফলকগুলিই যেন আঙুল। তাই এই রকম বহু-ফলক পাতাকে করতলাকার (Palmate) নাম দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর কাছের বাগানে খোঁজ করিলে তোমরা এই রকম বহু-ফলক পাতার গাছ অনেক দেখিতে পাইবে।

পরপৃষ্ঠায় কামিনী গাছের একটি বহু-ফলক পাতার ছবি দিলাম। আগেকার ছবির তেঁতুল পাতার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখ। পত্রকগুলি দুই ছবিতে কি এক রকমেই

সাজানো আছে? একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে, এক রকমে সাজানো নাই।

তেঁতুলের পাতার শিরদাঁড়ার একই জায়গা হইতে বামে ও ডাইনে দুই-দুইটি করিয়া পত্রক সাজানো থাকে। তোমরা কয়েকটি তেঁতুল পাতা ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো; কোনোটাতেই এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাইবে না। শিরিষ, কুঁচ, বাব্‌লা, চামেলি প্রভৃতি অনেক বহু-ফলক গাছের পত্রককে ঠিক্ এই রকমেই জোড়া-জোড়া সাজানো দেখিবে।
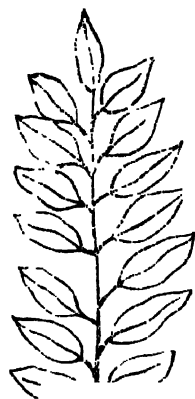
কামিনীর পাতা

কোনো বহুফলক পাতার শিরদাঁড়ার এক জায়গা হইতে ডাইনে এবং বামে জোড়া জোড়া পত্র সাজানো থাকিলে সেই পাতাকে যুগ্মপক্ষাকার (Paripinnate) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। শিরিষ, কুঁচ, তেঁতুল প্রভৃতি পাতা যুগ্মপক্ষাকার।

এখন কামিনীর পাতাটি পরীক্ষা করিয়া দেখ। শিরদাঁড়ার একই জায়গা হইতে ইহার পত্রকগুলি বাহির হয় নাই। তাই এই রকম বহু-ফলক পাতাকে অযুগ্মপক্ষাকার নাম দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর পাতামাত্রেরই চূড়ায় একটি করিয়া পত্রক দেখা যায়। আমড়া, গাঁদা, তরুলতা, নিম, বননীল, আমলকী, গোলাপ প্রভৃতি গাছের পাতা অযুগ্মপক্ষাকার। তাই এই সব

গাছের বহুফলক পাতার মাথায় এক-একটা চূড়াপত্রক আছে। তেঁতুল, শিরিষ, বাব্‌লা, চামেলি প্রভৃতির পাতা যুগ্মপক্ষাকার। ইহাদের কোনোটিরই মাথায় চূড়াপত্রক নাই।

তোমরা যুগ্ম এবং অযুগ্ম পক্ষাকার পাতার এই নিয়মটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়ো। যুগ্মপক্ষাকার পাতার মাথায় চূড়াপত্রক তোমরা সমস্ত বন-জঙ্গল খোঁজ করিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। আবার অযুগ্মপক্ষাকার পাতার মাথায় চূড়াপত্রক নাই, ইহাও তোমরা কোনো বহু-ফলক পাতায় দেখাইতে পারিবে না। ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? এই রকম নিয়ম গাছপালাতে যে কত দেখা যায়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তোমরা যতই পরীক্ষা করিবে, গাছপালাদের দেহে ও জীবনের কাজে ততই আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিতে পাইবে।

কৃষ্ণচূড়ার পাতা।

কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ হয়ত তোমাদের বাগানে আছে

দেখিলেই বুঝিবে, ইহার পাতা বহু-ফলক—কারণ, অনেক পত্রক অর্থাৎ ছোটো পাতা লইয়াই ইহার এক-একটি পাতা হয়। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুলের পাতার মতো নয়। ইহার মূল বোঁটার দুই পাশে যে ডালের মতো বোঁটা আছে, তাহাতেই পত্রকগুলিকে সাজানো দেখা যায়। কাজেই, ইহাকে তেঁতুলের পাতার দলে ফেলিয়া পক্ষাকার পাতা বলা চলে না। তাই ইহাকে দ্বি-পক্ষাকার (Bipinnate) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। শিরিষের পাতাও দ্বি-পক্ষাকার। তোমরা খোঁজ করিয়া এই দলের আরো কতকগুলি পাতা বাহির করিয়ো।

এখানে একটি পাতার ছবি দিলাম। কেমন সুন্দর পাতা। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কোনো বিদেশী গাছ হইতে এই পাতাটির ছবি আঁকা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। তোমাদের বাগানের বেড়ার ধারে যে সজিনা গাছ আছে, ইহা তাহারি একটি পাতার ছবি। তোমরা এই গাছ ভাল করিয়া দেখ নাই বলিয়াই সজিনার পাতা চিনিতে পারিতেছ না।
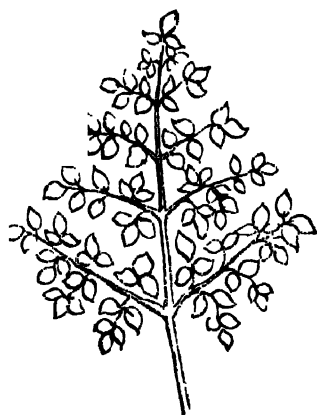
সজিনার পাতা

দেখ, পাতার শির-দাঁড়া হইতে পক্ষাকারে ডাল বাহির হইয়াছে এবং সেই-সব ডাল

হইতে আবার যে সরু-সরু ডাল ঐ-রকমে বাহির হইয়াছে তাহাতেই পত্রকগুলি সাজানো আছে।

কাজেই, সজিনার পাতাকে কেবল পক্ষাকার পাতা বলিলে চ'লে না। এই রকম পাতাকে ত্রি-পক্ষাকার নাম দেওয়া হয়। এই পাতার বোঁটা তিনবার পক্ষাকারে সাজানো থাকে বলিয়াই এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

একই গাছে দুই রকম পাতা হইতেছে, ইহা তোমরা দেখিয়াছ কি? তোমাদের বাড়ীর কাছে খাল বা বিল আছে কি না জানি না। যদি থাকে, সেখানকার জলে নানারকম শ্যাওলা, পদ্ম, শালুক প্রভৃতির গাছ দেখিতে পাইবে। হয়ত দুই চারিটি পানফলের গাছও সেখানে খুঁজিলে দেখা যাইবে। পানফল গাছের দু'রকম পাতা আছে। ইহার যে-সব পাতা জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে সেগুলি কাটা-কাটা এবং যে-সব পাতা জলে ভাসিয়া থাকে সেগুলি ত্রিভুজাকার অর্থাৎ কতকটা তিন-কোণা। ধনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি ডাঙার গাছেও দুই রকম পাতা দেখা যায়।

আম, জাম, কাঁটাল, বট প্রভৃতি পাতার কিনারা বেশ সুডৌল। কিন্তু সব গাছের পাতা এ-রকম নয়। যাহাদের পাতার কিনারা কাটা-কাটা এরকম গাছ অনেক আছে। শেয়াল-কাঁটা, জবা, দোপাটি, গোলাপ, ভাঁট, ফল্‌সা প্রভৃতি অনেক গাছের পাতার কিনারা তোমরা কাটা-কাটা দেখিতে পাইবে। সুতরাং কোনো গাছের পাতার

বিবরণ দিতে গেলে, তাহার কিনারা কি-রকম তাহা জানা দরকার।

দেবদারু ও বকুল গাছের পাতার কিনারা ঢেউ-খেলানো। এইজন্য এইরকম পাতাকে তরঙ্গায়িত (Undulated) বলা হয়। জবা গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ইহার কিনারা ঠিক দাঁতের মতো কাটা-কাটা। এইজন্য ইহাকে দন্তুর (Dentate) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। গোলাপ গাছের পাতার কিনারা ঠিক করাতের দাঁতের মতো নয় কি ? এইজন্য ইহাকে সদন্তুর (Serrate) পাতা বলা হইয়া থাকে। যে-সব পাতার কিনারার দাঁতগুলি গোলাকার হয়, সেগুলিকে গোলদন্তুর (Crenate) পাতা বলা যাইতে পারে। থানকুনি গাছের পাতায় তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। ইহা ছাড়া পাতার কিনারার আরো রকম রকম খাঁজ দেখিয়া পাতার আরো অনেক নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত রকমের পাতা-ওয়ালা গাছ আছে, তাহাদের পাতার আকৃতি প্রায় তত রকমেরই দেখা যায়। তোমাদের গ্রামে কত লোক আছে জানি না—হয়ত দুই হাজার বা তিন হাজার লোক আছে। এতগুলো লোকের প্রত্যেকেরই চেহারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের,—ঠিক্ একই চেহারার দুইটি লোক তোমরা সমস্ত গ্রাম খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারিবে না। গাছের পাতাসম্বন্ধেও ঠিক্ সেই কথাই বলা যাইতে পারে। ঠিক্ একই রকমের পাতা ভিন্নজাতীয় গাছে কখনই

দেখা যাইবে না। আম, কাঁটাল, নারিকেল, তাল, ছোলা, মটর, ধান, গম, যব—প্রত্যেক গাছেরই পাতার চেহারা আলাদা। কিন্তু তালের পাতার সঙ্গে কলা-পাতার যতটা তফাৎ, কাঁটালের পাতার সঙ্গে বটের পাতার ততটা তফাৎ নয়। তাই নানা গাছের পাতার আকৃতির মোটামুটি মিল দেখিয়া পাতার চেহারার কতকগুলি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কোন্ পাতাকে তোমরা কি নাম দিবে তোমাদিগকে তাহা বলিব।

রেখাকার পাতা

ভুট্টা, ধান, উলুখড়, কেশে ঘাস, যব, গম প্রভৃতির পাতা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই পাতাগুলি লম্বায় যত, চওড়ায় তাহার চেয়ে অনেক কম। এইজন্য এগুলিকে রেখাকার (Linear) পাতা বলা হয়। তোমরা একটু খোঁজ করিলে এই রকম পাতা অনেক বাহির করিতে পারিবে। ঘাসজাতীয় গাছ-মাত্রেরই পাতা রেখাকার।

আয়তাকার পাতা

পাতা চওড়ায় যতটা, লম্বায় যদি তাহারি দুই তিন গুণ বেশি হয়, তবে তাহাকে আয়তাকার (Oblong) পাতা বলা হয়।

রঙ্গন, গোলক-চাঁপা প্রভৃতি গাছে এই রকম পাতা তোমরা দেখিতে পাইবে।

পাতার আগার ও গোড়ার অংশ যদি সরু থাকে এবং মাঝখানটা মোটা হয়, তবে সেই সব পাতাকে তোমরা অণ্ডাকার (Elliptical) নাম দিতে পার। আক, মাধবীলতা, আতা, টগর ইত্যাদি গাছের পাতায় তোমরা এই রকম আকৃতি দেখিতে পাইবে। গোলাপ গাছের পত্রকগুলিও অণ্ডাকার।
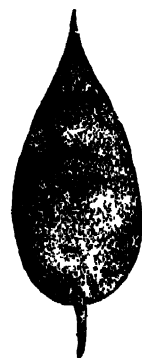
অণ্ডাকার পাতা

সড়কি বা বল্লমের চেহারা কি-রকম, তাহা তোমরা সকলেই জানো। ইহার তলাটা মোটা থাকে এবং আগা ক্রমে সরু হইতে দেখা যায়। করবী, মালতী, দোপাটি, লিচু, গোলাপজাম ইত্যাদি গাছের পাতা কতকটা এই রকমের নয় কি? এইজন্য এগুলিকে বল্লমাকার পাতা (Lanceolate) বলা হয়। এই-সব পাতা চওড়ায় যতটা, লম্বায় তাহার পাঁচ ছয় গুণ।

কাঠের তৈয়ারি যে মুগুর পালোয়ানরা ঘুরায়, তাহা তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। ইহার হাতল্‌টা সরু এবং আগাটা মোটা।

বল্লমাকার পাতা

এই রকম আকারের পাতাও অনেক গাছে আছে। ইহাদের

বোঁটার দিক্‌টা সরু এবং আগার দিক্‌টা মোটা ও গোলাকার। দেখিতে মুগুরের মতো বলিয়া এই সব পাতাকে মুষলাকার (Sqatulate) নাম দেওয়া হইয়াছে। বহু-ফলক পাতার পত্রকগুলির চেহারা প্রায়ই এইরকম হয়। কামিনী এবং আকন্দ ফুলের পাতাকে মুষলাকার বলা যাইতে পারে।

মুষলাকার পাতা
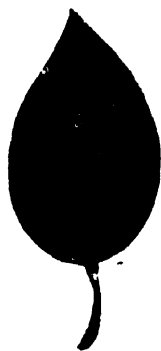
একটা লাট্টুকে ঠিক মাঝামাঝি চিরিলে, চেরা অংশের আকার যে-রকম হয়, অনেক পাতারই সেই রকম আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব পাতাকে লাট্টু-আকার (Ovate) নাম দেওয়া যাইতে পারে। পেয়ারা, মালতী, জবা, বট, ভাঁট, কাঁটাল, শাল, কুরচি প্রভৃতি অনেক গাছের পাতা লাট্টু-আকার। এই সব পাতা চওড়ার চেয়ে লম্বায় প্রায় দ্বিগুণ হয়।

লাট্টু-আকার পাতা

লাট্টুর আকারের পাতায় সরু দিক্‌টা বোঁটার কাছে আছে এবং চওড়া দিকটা আগায় রহিয়াছে, এ-রকম পাতাও অনেক

গাছে দেখা যায়। এই সব পাতাকে উপ-লাট্টু-আকার (Obovate) নাম দেওয়া যাইতে পারে। তোমরা সেগুন গাছে উপ-লাট্টু-আকারের পাতা দেখিতে পাইবে।

বরবটির বীজ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ,—ছোলা মটরের মতো ইহা ভিজাইয়া খাওয়া যায় এবং ভাঙিয়া তাহার ডালও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি বুনো গাছের পাতার চেহারা ঠিক্ বরবটির মতো হইতে দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় এরকম পাতার কথা মনে করিতে পারিতেছ না। থানকুনিব পাতায় তোমরা কতকটা এই রকম আকৃতি দেখিতে পাইবে। এই রকম পাতাকে বর্বটাকার নাম দেওয়া যাইতে পারে।

বর্বটাকার পাতা

পানের পাতা তোমরা অনেক দেখিয়াছ। দেখিলে তাসের উপরে হরতনের চেহারার কথা মনে পড়ে না কি? এই আকৃতির পাতা অনেক আছে। এগুলিকে তাম্বুলাকার (Cordate) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

তাম্বুলাকার পাতা

ঠিক্ বৃত্তাকার পাতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু গোলাকার (Orbicular) পাতা অনেক আছে। কুলের পাতা গোলা-কার, কিন্তু ঠিক্ বৃত্তাকার নয়। পদ্ম, মুচকুন্দ প্রভৃতি গাছে তোমরা গোলাকার পাতা দেখিতে পাইবে।
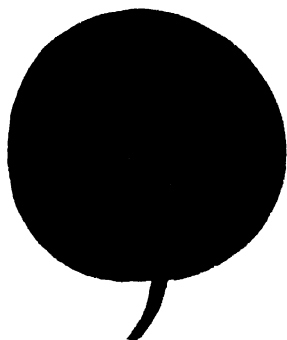
গোলাকার পাতা

যে-সব পাতার কিনারা অত্যন্ত বেশি কাটা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। পেঁপে পাতা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহার কিনারা কত গভীরভাবে কাটা থাকে,

ভাঙের পাতা

পরীক্ষা করিয়ো। এই রকম পাতাকে খণ্ডিত-পত্র বলা হইয়া থাকে। সিদ্ধি অর্থাৎ ভাঙের পাতা তোমরা বোধ হয় সকলে দেখ নাই। ইহা এত গভীরভাবে খণ্ডিত যে, এক-একটি খণ্ডকে যেন এক-একটি পৃথক পত্রক বলিয়াই মনে হয়। এই রকম পাতাকে পূর্ণ-খণ্ডিত পত্র বলা হয়।

পাতার আকৃতির মোটামুটি কথা তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু এখনো এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে বাকি আছে।

পাতার চূড়া অর্থাৎ আগা এবং গোড়া কত রকম হয়, তোমরা দেখ নাই কি ? অশথের পাতা পরীক্ষা করিয়ো ; ইহার চূড়া কত সরু হইয়া গিয়াছে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এই রকম পাতাকে অতি-সূক্ষ্মাগ্র (Acuminate) পাতা বলা হয়। জবার পাতাও কতকটা এই রকমের, কিন্তু তাহার চূড়া অশথ পাতার মতো সরু নয়। তাই ইহাকে সূক্ষ্মাগ্র (Acute) নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

যে-সব পাতার চূড়া নাই, বরং চূড়ার জায়গাটা বট পাতার মতো চওড়া, এ-রকম পাতাও অনেক দেখা যায়। অধিকাংশ বহু-ফলক পাতার পত্রকগুলিকে প্রায়ই চূড়াহীন দেখা যায়। তোমরা খোঁজ করিলে আরো অনেক চূড়াহীন পাতা সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই রকম পাতাকে স্থুলাগ্র (Obtuse) বলা হয়।

পাতার আগায় চুলের মতো রোম আছে বা কাঁটা আছে, এ-রকম পাতাও অনেক গাছে দেখা যায়। দাদমারী, চাকুন্দা, কালকসিন্দা প্রভৃতির পাতার চূড়ায় তোমরা রোম দেখিতে পাইবে। এগুলিতে পাতার শির-দাঁড়াই লম্বা হইয়া রোমের সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলিকে তোমরা কেশাগ্র পাতা নাম দিতে পার। যে-পাতার চূড়ায় কাঁটা আছে, তাহা খোঁজ করিবার জন্য তোমাদের কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। খেজুর, আনারস, কেয়া প্রভৃতির পাতায় তোমরা উহা দেখিতে পাইবে।

অনেক পাতারই ছোটো বা বড় বোঁটা থাকে। পাণ ও

পেঁপের পাতার বোঁটা কত লম্বা তোমরা দেখ নাই কি? কিন্তু এমনো পাতা অনেক আছে, যাহাদের গোড়ায় বোঁটার নাম-গন্ধ নাই। তোমরা রঙ্গন, আকন্দ প্রভৃতি গাছের পাতায় বোঁটা দেখিতে পাইবে না। এই রকম পাতাকে অবৃন্তক (Sessile) পাতা নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কলা, নারিকেল, কচু হলুদ, ধ'নে, আদা প্রভৃতির পাতা পরীক্ষা কর। দেখিবে, তাহাদের বোঁটার নীচের দিকটা চওড়া হইয়া গুঁড়িতে ঘেরিয়া রহিয়াছে। কলার খোলাকে কলা-পাতার চওড়া বোঁটা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ধান দূর্ব্বা বাঁশ, আখ, ভুট্টা প্রভৃতির পাতায় সরু বোঁটা দেখা যায় না, ফলকের নীচেই বোঁটা কোষাকারে গুঁড়িকে ঘেরিয়া থাকে।

সব পাতাই কি সমান পুরু হয়? তাহা কখনই হয় না। মনসা সীজ, পাথরকুচি, পুঁই, পালং, আনারস, সূচমুখী প্রভৃতি অনেক গাছের পাতা খুব পুরু এবং রসযুক্ত। এইজন্য এ-সব পাতাকে সরস (Succulent) বলা হয়। আম, কাঁটাল, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতা সরস কিন্তু খুব পুরু নয়।

যে-জায়গায় পাতা জন্মে, অনেক সময়ে পাতার আকৃতি সেই জায়গার উপযোগী হইতে দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য কর নাই। যে-সব পাতা জলে জন্মিয়া জলেই ভাসিয়া থাকে, সেগুলি প্রায়ই খুব বড় এবং লম্বা-চওড়া হয়। পাতার আকৃতি এ-রকম না হইলে, তাহার জলে ভাসা মুস্কিল হয়। পদ্ম, শালুক, পানফল প্রভৃতির গাছে তোমরা ইহা

দেখিতে পাইবে। তা'ছাড়া জলে ভাসিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের বোঁটাও খুব লম্বা ও ফাঁপা হয়। পদ্ম প্রভৃতির পাতার বোঁটা লম্বা থাকে বলিয়াই, হঠাৎ জল বাড়িয়া গেলে পাতা ডুবিয়া পচিয়া যায় না। একটা পদ্মের ডাঁটা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহার আগাগোড়া অনেক সরু ছিদ্রে পরিপূর্ণ—পদ্মের নাল কখনই নিরেট হয় না। নিরেট নাল বেশি ভারি হয়। কাজেই, নালের ভারে পাতা জলে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। তাই জলের গাছ-গাছড়ার বোঁটা প্রায়ই ফাঁপা দেখা যায়।

পাতাকে জলে ভাসাইবার জন্য পানফল ও কচুরি গাছের পাতার বোঁটায় আর এক মজার ব্যবস্থা আছে। ইহাদের বোঁটার এক-এক জায়গা অন্য জায়গার তুলনায় একটু মোটা হয় এবং সেই অংশ বাতাসে পূর্ণ থাকে। কাজেই, মাছ ধরার ছিপের ফাৎনার মতো সেই-সব ডাঁটা পাতাকে লইয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন বেশ বাতাস বহিতে থাকে, তখন মাঝিরা নৌকা-গুলিকে কি-রকমে চালায়, তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। সে-সময়ে তাহারা দাঁড় বা গুণ-টানা বন্ধ রাখিয়া মাস্তুলে পাল তুলিয়া দেয়। পালে বাতাস লাগিলে নৌকা হু-হু করিয়া ছুটিতে থাকে। কচুরি গাছ এই-রকম পাতার পাল খাটাইয়া এক নদী হইতে অন্য নদীতে, এক খাল হইতে আর এক খালে যাওয়া-আসা করে। কচুরি গাছ তোমরা দেখ

নাই কি ? তাহার পাতাগুলি জলের উপরে পালের মতই মেলিয়া থাকে। তার পরে বাতাসের ধাক্কা পাইলে সেই জোরে গাছগুলি এদিকে ওদিকে ভাসিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই গাছ পূর্ব্ববঙ্গের নদী-নালাতে ঐ-রকমে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক খাল-বিলে নৌকার চলাচল বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

শ্যাওলাজাতীয় অনেক গাছের পাতা জলের তলায় থাকে। সেখানে থাকিয়াই তাহারা বড় হয় এবং সেখান হইতেই তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করে। এ-সব পাতা যদি আকারে বড় হয়, তাহা হইলে সেগুলি ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই জলের ভিতরকার পাতা প্রায়ই চওড়ায় খুব কম হয়। তোমরা পাটা-শ্যাওলা ও ঝাজি-শ্যাওলা দেখ নাই কি ? ইহাদের পাতা বেশি চওড়া নয়। যাহাদের পাতা সূতার মতো লম্বা, এ-রকম শ্যাওলাও অনেক আছে। চওড়া নয় বলিয়াই এই-সব পাতা স্রোতে বাধা পাইয়া হঠাৎ নষ্ট হয় না।

পাতার শুঁয়ো ও কাঁটা

অনেক গাছের পাতার উপরে বা নীচে খুব ছোটো ছোটো লোম লাগানো থাকে। ইহাকে আমরা শুঁয়ো বলি। পাতার শুঁয়ো তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। যদি না দেখিয়া থাক, একটা আকন্দের পাতা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো। ইহার আগাগোড়া ছোটো শুঁয়োতে ঢাকা দেখিতে পাইবে। কাঁটাল, আম, অশথ, বট প্রভৃতির পাতার উপর পিঠে শুঁয়ো নাই ; পাতার তলায় শুঁয়ো আছে।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতির পাতায় বেশ লম্বা লম্বা শুঁয়ো থাকে। বিছুটির পাতার শুঁয়োও খুব লম্বা। এই-সব পাতার শুঁয়ো কিন্তু নিরেট নয়,—সরু নলের মতো ফাঁপা। তোমরা খালি-চোখে ইহা বুঝিতে পারিবে না। অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে বিছুটি, কুমড়া প্রভৃতির শুঁয়োকে নলের মতোই ফাঁপা দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এই শুঁয়োর নলগুলি বুঝি শূন্য থাকে। কিন্তু তাহা নয়—সেগুলি এক-রকম রসে ভরা থাকে। হাত লাগিলে যখন শুঁয়োগুলি ভাঙিয়া যায়, তখন হাতে সেই রস লাগে। তুলসী বা লাউ গাছের পাতা বা ডালের উপরে জোরে হাত বুলাইয়া দেখিয়ো; তখন শুঁয়ো ভাঙিয়া ভিতরকার রস আঠার মতো তোমাদের হাতে লাগিবে।

বিছুটির শুঁয়োর রস বড় বিষাক্ত। গায়ে ঠেকিলেই সেগুলি ছুঁচের মতো বিদ্ধ হয় এবং মট্ করিয়া ভাঙিয়া যায়। তার পরে শুঁয়োর ভিতরকার সেই বিষাক্ত রসে জ্বালা-পোড়া সুরু হয়। তাই যেখানে বিছুটির গাছ আছে সেখানে লোকে অতি-সাবধানে চলা-ফেরা করে। আলকুশীর লতার ফলের গায়ে বিষাক্ত শুঁয়ো আছে। আলকুশীর শুঁয়ো গায়ে লাগিলে গরু, ছাগল, মানুষ সকলেই অস্থির হইয়া পড়ে।

বেগুনের পাতার তলার দিকে তোমরা শুঁয়ো দেখিতে পাইবে। ইহার পাতার উপরে যে-কাঁটা থাকে, তাহাও শুঁয়ো-জাতীয়। এখানে শুঁয়োই লম্বা ও শক্ত হইয়া কাঁটা হইয়া দাঁড়ায়।

শিউলি ও ডুমুরের পাতার শুঁয়ো খুব শক্ত। কিন্তু বেগুনের কাঁটার মতো ধারালো নয়। হাত বুলাইলে খস্‌-খসে্‌ বলিয়া বোধ হয়। তূলার মতো নরম এবং রেশমের মতো চক্‌চকে এ-রকম শুঁয়োও অনেক গাছের পাতায় আছে। আকন্দের পাতায় তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

শুঁয়োর এই-রকম আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে, পাতাকে তূলা-রোমশ, কণ্টক-রোমশ, তৃণ-লোমশ ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

পাতার গায়ের শুঁয়ো এবং ছোট কাঁটা পাতার ছাল হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু ময়না, বেল, লেবু প্রভৃতির ডালে যে-সব বড় কাঁটা হয়, তাহা ছাল হইতে জন্মে না। সেগুলি গাছের ডাল বা গুঁড়িরই অঙ্গ। কিন্তু গোপাল গাছের কাঁটা সে-রকম নয়। এগুলি ছাল হইতেই উৎপন্ন হয়। তাই ছাল ছড়াইলে তাহার সঙ্গে গোলাপের কাঁটা উঠিয়া যায়। কিন্তু ছালের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বেল বা লেবুর কাঁটা উঠাইতে পারিবে না।

মটর গাছের আঁকড়ি

মটর, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি যে-সব গাছ লম্বা লম্বা আঁকড়ি দিয়া কাছের জিনিসকে জড়াইয়া

ধরে, সেই গুলি পাতারই রূপান্তর। খেঁসারি ও মটর গাছ পরীক্ষা করিলে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই-সব গাছের বহু-ফলক পাতার কয়েক জোড়া ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, কেবল আগার এক বা দুই জোড়া পাতা আঁকড়ির আকার পাইয়া কাছের জিনিসকে জড়াইয়া ধরে।

পাতার শিরা

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে যেমন শিরা, উপশিরা আছে, পাতাতেও ঠিক্ সেই-রকম শিরা এবং উপশিরা দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? বর্ষাকালে যখন বৃষ্টির জলে পাতার নরম অংশ পচিয়া যায়, তখন তাহাতে ছোট-বড় সব শিরাই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। একটি পাতাকে চোখের সাম্‌নে ধরিয়া প্রদীপের আলোতে পরীক্ষা করিয়ো; পাতার শিরা দেখিতে পাইবে।

ঘাস, বাঁশ, ধান, যব প্রভৃতির পাতায় যে-সব শিরা সাজানো থাকে, তাহাকে সমান্তরাল শিরা (Parallel vein) বলা হয়। বোঁটার কাছ হইতে বাহির হইয়া এই শিরাগুলি সমান্তরাল ভাবেই কিছু দূর চলে, এবং তার পরে আগায় গিয়া ঠেকে।

এখানে সমান্তরাল শিরার একটা ছবি দিলাম। অধিকাংশ এক-বীজপত্রী গাছের পাতাতে এই-রকমে শিরা সাজানো দেখা যায়।

বাঁশ-পাতা

সুতরাং কেবল পাতার শিরা দেখিয়াই গাছটি এক-বীজপত্রী কি না, তাহা তোমরা মোটামুটি বলিয়া দিতে পারিবে।

আম, কাঁটাল, বট প্রভৃতি গাছের পাতায় মাঝামাঝি একটা মোটা মধ্যশিরা (Midrib) অর্থাৎ শির-দাঁড়া থাকে এবং তার পরে তাহারি দুই পাশে পাখীর পালকের মতো ছোটো শিরা লাগানো থাকে। এই রকম শিরাকে তোমরা পক্ষ-শিরা (Pinnate vein) নাম দিতে পার।

অনেক গাছের পাতার মধ্য-শিরা থাকে না। এগুলিতে বোঁটার কাছ হইতে তিনটা পাঁচটা এবং কখনো কখনো তাহারো বেশি মোটা শিরা বাহির হইয়া সমস্ত পাতাটিকে ঢাকিয়া ফেলে এবং তার পরে সেগুলি হইতে যে-সব উপশিরা বাহির হয়, তাহাতে পাতাটির শিরা-বিন্যাসকে ঠিক জালের মতো দেখায়। এই রকম শিরাকে তোমরা করতলাকার শিরা (Palmate veins) বলিতে পার। কারণ, ইহাতে মোটা শিরা-

উপরকার পাতায় পক্ষাকার এবং নীচের পাতায় করতলাকার শিরা
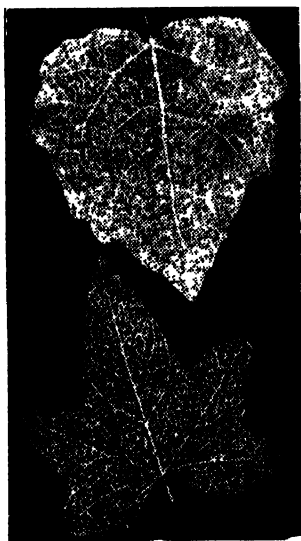
গুলিকে ঠিক্ হাতের আঙুলের মতই দেখায়। কুল, কাপাস, মুচকুন্দ, স্থলপদ্ম, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি গাছে তোমরা এই রকম শিরা দেখিতে পাইবে।

শালুক, পদ্মপাতা প্রভৃতির শিরা সাজানো আবার আর এক রকমের। এ-গুলির বোঁটার কাছ হইতে অনেক মধ্য-শিরা বাহির হয় এবং সেগুলি ছাতার শিকের মতো পাতায় সাজানো থাকে। কচু পাতা এবং নষ্টরসিয়ম্ ফুল গাছের পাতাতেও তোমরা এই-রকম শিরা দেখিতে পাইবে। এই-সব পাতার শিরাগুলি ছাতার শিকের মতো সাজানো থাকে বলিয়া সেগুলিকে ছত্রাকার শিরা (Peltate) নাম দেওয়া হয়।

পাতায় এই-রকম ঘন ঘন শিরা-উপশিরা থাকে কেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। যদি কেবলি নরম জিনিস দিয়া পাতা তৈয়ারি হইত, তাহা হইলে পাতাগুলি কখনই ডালে খাড়া হইয়া রৌদ্রে মেলিয়া থাকিতে পারিত না। শিরাই পাতার কাঠামো। তাই সেগুলির দ্বারা পাতা দৃঢ় ও মজবুত হয়। তাহা না হইলে, ঝড়ে বা বাতাসে পাতা ছিঁড়িয়া যাইত না কি? সামান্য ঝড়ে কলা পাতা কি-রকমে ছিঁড়িয়া যায়, তোমরা দেখ নাই কি? অন্য গাছের পাতায় শিরাগুলি জালের মতো সাজানো থাকে,—কলা পাতায় তাহা থাকে না। ইহার পক্ষাকার শিরার পরস্পরের মধ্যে কঠিন বাঁধন নাই,—তাই সামান্য ঝড়ে পাতাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়।

কিন্তু কেবল পাতাকে শক্ত রাখার জন্যই কি শিরার

দরকার ? তাহা নয়। বাতাস হইতে অঙ্গারক বাষ্প টানিয়া লইলে সূর্য্যের আলোর সাহায্যে পাতায় যে খাবার তৈয়ারি হয়, তাহা শিরার ভিতর দিয়াই প্রথমে চলে এবং তার পরে গুঁড়িতে, ডাল-পালায় এবং ফুল-ফলে পৌঁছায়। পাতার শিরা চিরিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে তাহাতে তিন রকমের কোষ দেখা যায়। পাতায় সূর্য্যের আলোর সাহায্যে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা এক-রকম কোষ দিয়া গাছের ডাল-পালা ও গুঁড়িতে পৌঁছায়। এই কোষের প্রাচীর খুব পুরু ; শিরার উপর দিকেই এগুলিকে দেখা যায়। পাতায় যে প্রোটিন্ তৈয়ারি হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে না পৌঁছিলে গাছ পুষ্ট হয় না। শিরার দ্বিতীয় রকমের কোষের মধ্য দিয়াই তাহা নীচে নামে। শিরার তৃতীয় রকমের কোষগুলি জলের বাহক। পাতা দিয়া গাছরা জল চুষিয়া লয় না। খাদ্য তৈয়ারি করিবার জন্য যে জল ও আকরিক জিনিসের দরকার হয়, তাহা শিকড় দিয়া উপরে উঠে। শিরার এই কোষগুলি নলের মতো সাজানো থাকে বলিয়াই, পাতায় জল চলাচল করিতে পারে।

পাতার সরু সরু শিরার মধ্যে কত কাণ্ড চলে, একবার ভাবিয়া দেখ।

পত্রবিন্যাস

গাছের ডালে পাতাগুলি যে-রকমে জানানো থাকে, তোমরা বোধ হয় তাহা লক্ষ্য কর' নাই। ডালে পাতার

সজ্জা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। এক-এক জাতের গাছে এক-একটি নির্দ্দিষ্ট রকমে পাতা সাজানো থাকে। কখনই ইহার অন্যথা হয় না। তোমাদের বাড়ীর কাঁটাল গাছে যে-রকমে পাতা সাজানো দেখিবে, অন্য সকল কাঁটাল গাছেই ঠিক্ সেই রকমটিই দেখিতে পাইবে। আম, জাম, দাড়িম, বেল প্রভৃতি প্রত্যেক গাছেই তোমরা রকমে রকমে পাতা সাজানো দেখিবে।

রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে আমরা ছাতা মাথায় দিই কেন, তাহা তোমরা সকলেই জানো। ছাতায় রৌদ্র ও বৃষ্টি আট্কাইয়া ফেলে। তাই ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইলে রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির জল মাথায় লাগে না। অধিকাংশ গাছের পাতাই ডালে এমন ভাবে সাজানো থাকে, যেন সমস্ত রৌদ্রটা পাতার উপরেই পড়ে। তাই সমস্ত পাতায় মিলিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড ছাতা হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়ে গাছের তলায় দাঁড়াইলে মাথায় রোদ্ লাগে না এবং সামান্য বৃষ্টিতে গায়ে জল পড়ে না। গাছের পাতা-গুলির মধ্যে একটি ঠিক্ আর একটির উপরে সাজানো রহিয়াছে, ইহা তোমরা কখনই দেখিতে পাইবে না। পাতা এমন ভাবে সাজানো থাকে যেন, গাছতলায় দাঁড়াইয়া উপর দিকে নজর করিলে আকাশ দেখা না যায়। তোমরা যে-কোনো বড় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ইহা পরীক্ষা করিয়ো।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, গাছের পাতা ছাতার মতো করিয়া সাজানো থাকে কেন? এই প্রশ্নেরও উত্তর

আছে। খোলা জায়গার মাটির রস রৌদ্রে কি-রকমে শুকাইয়া যায় তোমরা দেখ নাই কি? মাঠের জমি চৈত্র মাসের রৌদ্রে শুকাইয়া ফাটিয়া যায়—তখন তাহাতে একটুও রস থাকে না। গাছের তলার মাটি যাহাতে রৌদ্র পাইয়া শুকাইয়া না যায়, তাহার জন্য পাতাগুলি ছাতার মতো করিয়া সাজানো থাকে। তাই যখন চারিদিকের মাটি শুকাইয়া যায় তখন গাছতলার মাটি ভিজা থাকে।

কিন্তু ইহাই পাতা সাজানোর একমাত্র কারণ নয়। মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে জল লইয়া, খাবার লইয়া কি ভয়ানক মারামারি বাধিয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? মনে কর, গ্রীষ্মের দিনে সমস্ত খাল বিল শুকাইয়া গিয়াছে,—কেবল তোমাদের গ্রামের একটি পুকুরে জল আছে। তখন সেই জলটুকু লইয়া গ্রামের লোকের সঙ্গে অন্য এক গ্রামের লোকের কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায় না কি? খাবার জল লইয়া মারামারি লাঠালাঠি হইয়াছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি।

গাছের পাতারা খুব ভালো ভালো খাবার চায় না। সূর্য্যের আলো দিয়া তাহারা নিজের দেহের মধ্যে খাবার তৈয়ারি করে। কাজেই, কাঠ বা কয়লা না হইলে যেমন আমাদের রান্না চড়ে না, সেই-রকম আলো না হইলে গাছদের খাবার তৈয়ারি হয় না। তাই সব পাতায় যাহাতে রৌদ্র পড়ে, তাহারি জন্য সেগুলি এমন সুন্দর করিয়া সাজানো থাকে। কোনো পাতা তার নীচেকার আর একটি পাতার আলো

আট্কায় না। আশ্চর্য্য ব্যবস্থা নয় কি ? ঠিক্ মতো আলো পাইবার জন্য পাতাগুলি কি-রকমে বোঁটা বাঁকাইয়া রৌদ্রের দিকে হাঁ করিয়া থাকে, তোমরা যে-কোনো গাছ পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

আকন্দের গাছ হয়ত তোমাদের বাড়ীর কাছেই আছে। ইহার পাতা কি-রকমে সাজানো আছে পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, বিপরীতমুখী জোড়া জোড়া পাতা ইহার ডালে সাজানো রহিয়াছে। কিন্তু কোনো পাতা তাহার নীচের পাতার রৌদ্র আট্কাইতেছে না। এক জোড়া পাতাকে তোমরা যদি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দেখিতে পাও, তবে তাহার উপরের পাতা জোড়াটিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দেখিবে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়াই নীচের পাতা উপরের পাতার ছায়ায় ঢাকা পড়ে না। এই-রকম পাতা সাজানোকে বিপরীত পত্র-বিন্যাস বলে।

এখানে আকন্দের ডালের একটি ছবি দিলাম। ছবিটি দেখিলেই বিপরীত পত্রবিন্যাস কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে।

আকন্দের ডাল

বিপরীত ভাবে সাজানো পাতার অভাব নাই। পেয়ারা, জাম,

লিচু, শিউলি, কুরচি, তুলসী প্রভৃতি অনেক গাছেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিলে দেখিবে, এই-সব গাছের পাতা ডালের একই জায়গা হইতে জোড়া জোড়া বাহির হইয়া বিপরীত দিকে বিস্তৃত আছে।
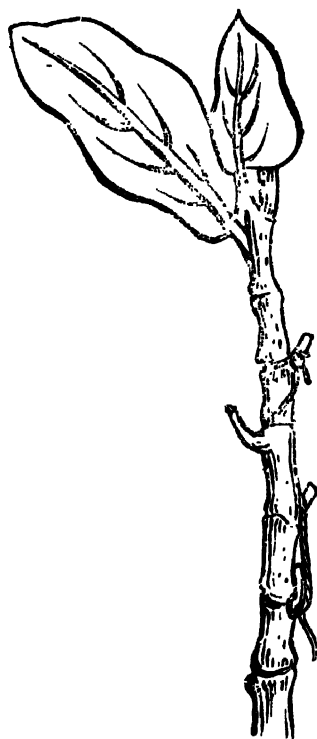
বট গাছের ডাল

কিন্তু বট, আম, কাঁটাল, বকুল প্রভৃতি গাছের পত্র-বিন্যাস কখনই আকন্দ, পেয়ারা ইত্যাদির সহিত মিলিবে না। এ-সব গাছের ডালের এক এক জায়গায় কেবল একটি করিয়া পাতা লাগানো থাকে কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি কখনই এলোমেলো ভাবে সাজানো দেখিতে পাইবে না।

এখানে বট গাছের ডালের একটি ছবি দিলাম। ছবিটি ভালো করিয়া দেখিলে এবং বট গাছের একটি ভালো ডাল পরীক্ষা করিলে বুঝিবে, ইহার পাতাগুলি ঠিক্ ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো সাজানো আছে। তোমরা একগাছি সূতা লইয়া প্রত্যেক পাতার বোঁটার কাছ দিয়া ডালটিকে জড়াইয়ো;

তাহা হইলে পাতাগুলি যে, সত্যই ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচের মতো হইয়া উপর দিকে উঠিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

যখন ডালের এক-একটা জায়গা হইতে কেবল একটি মাত্র পাতা বাহির হয় এবং পাতাগুলি ইস্‌ক্রুপের আকারে সাজানো থাকে, তখন তাহাকে একান্তর (Alternate) পত্রবিন্যাস বলা হয়। কাঁটাল, আতা, বট, অশথ, অতসী পেঁপে, শাল, মহুয়া প্রভৃতি অনেক গাছেই তোমরা ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচে একান্তর পত্রবিন্যাস দেখিতে পাইবে।

গানের সঙ্গে যদি বাজনার মিল না থাকে তবে সে-গান এবং বাজনা ভালো লাগে না। তখন গানের আসর ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করে। তোমরা যখন কবিতা আবৃত্তি কর, তখন যদি ছন্দের তাল রক্ষা না করিতে পার, তাহা হইলে সে-আবৃত্তি শুনিতে ভালো লাগে না। তাহা হইলে দেখ, তাল বা ছন্দ একটা বড় জিনিস,—আমরা স্বভাবতঃই চলিতে-ফিরিতে, গান-বাজনা করিতে, কবিতা পড়িতে তাহা মানিয়া চলি। সিঁড়ির ধাপগুলির মধ্যে যদি একটা ধাপ অপরগুলির তুলনায় একটু নীচু বা উঁচু থাকে, তবে কি বিপদ হয় তোমরা তাহা লক্ষ্য কর নাই কি? প্রত্যেক ধাপে তালে তালে পা ফেলিয়া উঠিতে যেই বেতালা ধাপে ঠেকে অমনি পা ফস্‌কাইয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ে আমরা তাল রক্ষা করিয়া চলি। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, দৌড়াইবার সময়ে বা বেড়াইবার সময়ে

আমরা তাল রক্ষা করি না। কিন্তু তাহা নয়। তখনো আমরা তাল মানিয়া চলি। তোমরা কখনই এলোমেলো ভাবে পা ফেলিয়া বেড়াইতে বা দৌড়াইতে পারিবে না। পা ফেলার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ থাকে। একবার লম্বা করিয়া পা ফেলিয়া পরক্ষণেই ছোট্টো করিয়া পা ফেলা কষ্টকর এবং সে-রকমে দৌড়ানো একেবারে অসম্ভব।

তাহা হইলে দেখ, ছন্দ বা তাল না মানিলে আমাদের এক পাও চলিবার উপায় নাই। কেবল মানুষই যে ছন্দ মানিয়া চলে, তাহা নয়। পশু-পক্ষী, গাছপালা, দিবারাত্রি, ঋতুসংবৎসর সকলকেই ছন্দ মানিয়া চলিতে হয়। দিনের পর যে-রাত্রি আসে, এবং গ্রীষ্মের পর যে-বর্ষা আসে, তাহা এক-রকম ছন্দ নয় কি? কোনো একটি কাজ করিতে গেলে তাহার জন্য কত আয়োজন, কত অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ছন্দ-মানার কাজে কাহারো আয়োজন বা অভ্যাসের দরকার হয় না,—প্রকৃতির তাগিদেই সকলে ছন্দ মানিয়া চলে।

গাছের যে-সব পাতা ডালে ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচে সাজানো থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি সুন্দর ছন্দ আছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই তোমাদিগকে এত কথা বলিলাম

তোমরা ছবির ডালটির মত একটি আমের ডাল ভাঙিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, পাতাগুলি কখনই এলোমেলো-ভাবে সাজানো নাই। মনে কর, ছবিতে সব নীচেকার পাতাটি ঠিক্ উত্তর মুখে আছে। এখন আর একটি উত্তরমুখো পাতা

তোমরা উহার ঠিক্ উপরে হঠাৎ দেখিতে পাইবে না। অনেক খোঁজ করার পরে, সেই পাতার পরে পঞ্চম পাতাটিকে উত্তর-মুখো হইয়া থাকিতে দেখিবে। কেবল যে একটি পাতাতেই এই মিল দেখা যায়, তাহা নয়। তোমরা যে-কোনো পাতা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, উপরের এবং নীচের পঞ্চম পাতাটির সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, আম গাছের পাতাগুলি ডালে এ-রকম ভাবে সাজানো থাকে যে, তাহাদের প্রত্যেক পাতা উপর বা নীচের পঞ্চম পাতার সহিত অবিকল মিল রক্ষা করিয়া চলে। আমরা কোনো গানের সঙ্গে যখন কাওয়ালির তালে বাজনা বাজাই, তখন তিনটা তালের পরে একটা ফাঁক আসে। গানটি গাহিবার সময়ে এই রকমের তাল কখনই ভঙ্গ হয় না। আম গাছের পত্রবিন্যাস এই রকমের একটা তাল নয় কি? শাখা, প্রশাখা, গুঁড়ি যেখানে ইচ্ছা খোঁজ করিয়ো; দেখিবে, প্রত্যেক পাতা তাহার উপরের ও নীচের পঞ্চম পাতার সঙ্গে মিল রাখিতেছে।

কেবল ইহাই নয়,—পাতার বোঁটার তলায় যে সূতাটি জড়াইতে বলিয়াছিলাম, তোমরা যদি তাহা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সূতাগাছটি দুইবার ডালটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করার পরে পঞ্চম পাতার গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, ইস্ক্রুপের দুইটি সম্পূর্ণ প্যাঁচের পরে আম গাছের পাতা মিল খুঁজিয়া পায়।

আম-গাছের কোনো পাতায় তোমরা এই নিয়মটিকে ভঙ্গ হইতে দেখিবে না। আশ্চর্য্য নয় কি ?

কাজেই দেখা যাইতেছে, আমের পাতাগুলি দুই প্যাঁচে পঞ্চম পাতার সহিত মিল রক্ষা করিয়া চলে। বৈজ্ঞানিকরা পাতার এই পরিচয়টা $\frac{২}{৫}$ এই ভগ্নাংশটি লিখিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

$\frac{২}{৫}$ অর্থাৎ দুই প্যাঁচে পঞ্চম পাতার মিল। কেবল যে আম-গাছেই ইহা দেখা যায় তাহা নয়। কাঁটাল, বট, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি গাছেও এই মিল আছে। তোমরা চেষ্টা করিলে আরো অনেক গাছে ইহা দেখিতে পাইবে।

আক, ধান, গম, যব এবং ঘাস মাত্রেরই প্রত্যেক পাতার সহিত তাহার পরের দ্বিতীয় পাতার মিল থাকে। তোমরা যদি পাতার বোঁটার তলায় তলায় সূতা ধরিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সূতাগাছটির এক পাকেই দ্বিতীয় পাতাটিতে মিল পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বলিতে হয় $\frac{১}{২}$ এই নিয়ম অনুসারে ধান গম ইত্যাদির পাতা সাজানো থাকে।

মাদুর-কাঠির গাছ দেখিতে কতকটা ঘাসের মতো হইলেও ইহার পত্রবিন্যাস $\frac{১}{৩}$ নিয়ম অনুসারে চলে; অর্থাৎ প্রত্যেক পাতা তাহার পরবর্ত্তী তৃতীয় পাতার সহিত এক-পাকে মিল রক্ষা করে।

তিসি গাছ তোমরা অনেক দেখিয়াছ। ইহার পত্রবিন্যাসের নিয়ম $\frac{৩}{৮}$, অর্থাৎ কোনো পাতার মিল খুঁজিতে গেলে

ইস্ক্রুপের মত তিন পাকের পর অষ্টম পাতায় মিল পাওয়া যায়।

আলুর গাছে যে-সব পাতার কুঁড়ি বাহির হয়, তাহাদের পরস্পরের মিল খুঁজিয়া বাহির করা বড় কঠিন; কিন্তু মিল আছে। তোমরা যদি সাবধানে পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, এক দুই করিয়া তেরোটা কুঁড়ি গুণিয়া গেলে মিল আসে। সূতা ফেলিয়া যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সূতার সম্পূর্ণ পাঁচ পাক শেষ না হইলে মিলের কুঁড়িটি পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, আলুর পাতার কুঁড়ি এই $\frac{৫}{১৩}$ নিয়মে সাজানো থাকে।

$\frac{৮}{২১}$, $\frac{১৩}{৩৪}$, $\frac{২১}{৫৫}$ এই রকম নিয়মে যাহাদের পাতা সাজানো আছে এ-রকম গাছও অনেক দেখা যায়। $\frac{৮}{২১}$ নিয়মটি তোমরা ঝাউ এবং পাইন জাতীয় গাছে দেখিতে পাইবে।

পাতা সাজানোর এই স্বাভাবিক নিয়ম আশ্চর্য্যজনক নয় কি? একান্তর-ভাবে যাহাদের পাতা সাজানো আছে সে-রকম যে-কোনো গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৫}$; $\frac{৩}{৮}$, $\frac{৫}{১৩}$, $\frac{৮}{২১}$, ইত্যাদি নিয়মের কোনো একটির সহিত তাহার পাতা সাজানোর প্রণালী মিলিয়া যাইবে।

বিপরীত এবং একান্তর এই দুই রকমেই যে সকল গাছের পাতা সাজানো থাকে তাহা নয়। পাতা সাজাইবার আরো কয়েকটি প্রণালী নানা গাছে দেখা যায়। তোমরা করবী ফুলের গাছ নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহার পাতা

বিপরীত বা একান্তর ভাবে সাজানো থাকে না। পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ডালের একই জায়গা হইতে তিন

করবীর পাতা সাজানো

দিকে তিনটি পাতা সাজানো আছে। এই রকম পাতা সাজানোকে স্তবকিত (Whorl) পত্রবিন্যাস বলা হয়। পাতার এই রকম বিন্যাস খোঁজ করিলে তোমরা আরো অনেক গাছে দেখিতে পাইবে।

নারিকেল, তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের বড় বড় পাতাগুলি কেমন সুন্দরভাবে গুঁড়িতে লাগানো থাকে, তোমরা

একবার লক্ষ্য করিয়ো। রাজমিস্ত্রীরা যখন ইট দিয়া প্রাচীর গাঁথে, তখন সেগুলিতে ঠিক্ উপরে উপরে সাজায় না,—

খেজুর পাতার দাগ

যেখানে পাশাপাশি দুখানা ইটের জোড় আছে, ঠিক্ তাহারি উপরে একটা গোটা ইট চাপাইয়া দেয়। ইহাতে প্রাচীর শক্ত হয়। তোমরা যদি খেজুর বা তাল গাছের গায়ের বাগ্‌লোর দাগ পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে, দাগগুলি যেন ইটের গাঁথুনির মতো সাজানো আছে। কোনো দাগের ঠিক্ উপরে বা ঠিক্ নীচে তোমরা আর একটি দাগ খুঁজিয়া পাইবে না।

একজন বড় পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, নারিকেল গাছে প্রতিমাসে এক-একটি করিয়া বাগ্‌লো বাহির হয়। সুতরাং তোমরা গাছের গায়ে কতগুলি বাগ্‌লোর দাগ আছে গুণিয়া, তাহার বয়স স্থির করিতে পারিবে।

উপপত্র

গাছের সাধারণ পাতার কথা তোমাদিগকে বলিলাম। ইহা ছাড়া তোমরা আর একরকম পাতা অনেক গাছে দেখিতে পাইবে। কাঁটাল, চাঁপা, অশথ, বট বা কদম গাছে যখন নূতন পাতা গজাইতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদের পাতার একটি কুঁড়ি লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, কচি পাতাগুলি কুঁড়িতে জড়াইয়া আছে এবং আর এক রকমের পাতা সে-গুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যে পাতা-গুলি এই রকমে কচিপাতাকে ঢাকিয়া রাখে, তাহাকে উপপত্র (Stipule) বলা হইয়া থাকে। বট, কদম, কাঁটাল প্রভৃতির উপপত্র বেশিদিন গাছে থাকে না,—কুঁড়ি হইতে নূতন পাতা গজাইলেই সেগুলি ঝরিয়া পড়ে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন বট অশথ এবং কাঁটালের নূতন পাতা
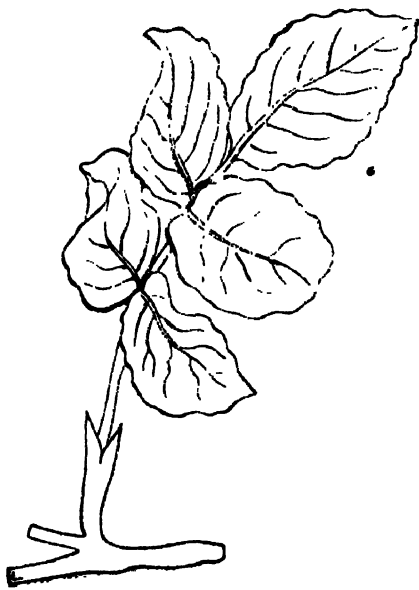
গোলাপের উপপত্র

বাহির হইবে, তোমরা তখন খোঁজ করিয়ো; দেখিবে, অনেক উপপত্র গাছের তলায় পড়িয়া আছে।

গোলাপ গাছের বহু-ফলক পাতার গোড়ায় উপপত্র থাকে। কিন্তু ইহা বট বা কাঁটালের উপপত্রের মতো ঝরিয়া পড়ে না। কৃষ্ণচূড়া, জবা, মটর, রঙ্গন প্রভৃতি গাছের পাতার নীচেও তোমরা উপপত্র দেখিতে পাইবে। মটর ও বন-চাঁড়াল গাছের সবুজ উপপত্র খুব বড় আকারেই দেখা যায়।

লেবুর পাতা তোমরা হয়ত সকলেই দেখিয়াছ। ইহার বোঁটার নীচে তোমরা পাখীর ডানার মতো আর একটি ছোটো পাতা লাগানো দেখ নাই কি? তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, ইহাও বুঝি লেবু পাতার উপ-পত্র। কিন্তু তাহা নয়। উপপত্র প্রায়ই পাতার কুঁড়িকে ঢাকিয়া থাকে। ইহাতে কুঁড়ির ভিতরকার খুব কচি পাতাগুলি শীত রৌদ্র ও বৃষ্টির উৎপাত হইতে রক্ষা
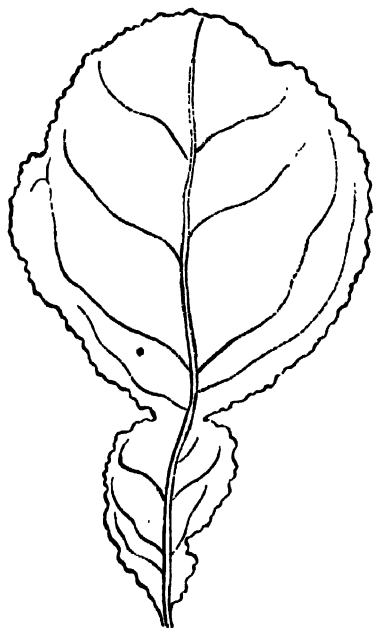
লেবুর পক্ষ-পত্র

পায়। লেবুপাতার নীচেকার সেই ছোট পাতা তাহা করে না। কাজেই, তাহাকে উপপত্র বলা চলে না। তাই বৈজ্ঞানিকরা আসল পাতার নীচেকার ছোটো পাতাকে পক্ষ-পত্র বলিয়া থাকেন। তোমরা নানা গাছের পাতার উপপত্র পরীক্ষা করিয়ো ; এবং গন্ধরাজ, চুকাপালং, শেওড়া, ধান, তাল এবং তেঁতুল পাতার উপপত্র কোথায় কি আকারে আছে দেখিয়ো।

পাতার গঠন

পাতার আকৃতির কথা বলা হইয়াছে এবং পাতাগুলি কি-রকমভাবে ভিন্ন ভিন্ন গাছে সাজানো থাকে, তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখন পাতার ভিতরকার খবর অর্থাৎ তাহার গঠনের কথা বলিব।

পাতার শিরাগুলি কি-রকম কাজ করে, তোমরা আগে শুনিয়াছ। কিন্তু কেবল শিরা লইয়াই পাতা নয়। পাতায় দুইটি পৃথক্ পৃথক্ কোষের স্তর দেখা যায়। তার উপরে আবার পাতার ছাল আছে। মোটামুটি এই সকলের সমষ্টিকেই পাতা বলে।

পাতার ভিতরকার কোষগুলিকে পত্রান্তঃকোষ (Meso-phyll) বলা হয়। থাম গাঁথিবার সময়ে রাজমিস্ত্রিরা যেমন ইটের উপরে ইট সাজায়, এই কোষগুলি পাতার ভিতরে সেই-রকমে সাজানো থাকে। এই কোষগুলির ভিতরে সবুজ রঙের এক প্রকার জিনিস থাকে,—ইহাই গাছের পাতাকে সবুজ করে। বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে পত্র-হরিৎ (Chlorophyll)

নাম দিয়া থাকেন। ইহা পাতায় থাকিয়া যে-কাজ করে, তাহা অদ্ভুত। সে-সব কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

যাহা হউক, পত্রান্তঃকোষের নীচে আবার আর এক থাক কোষ সাজানো দেখা যায়। এই কোষগুলির আকৃতি গোল এবং তাহাদের প্রাচীর কঠিন নয়। তা'ছাড়া সেগুলি অন্ত-কোষের মতো গায়ে-গায়ে লাগানোও থাকে না। এইজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটু একটু ফাঁক থাকিয়া যায়। এই কোষের স্তরকে Parenchyma বলা হয়।

যে দুই-রকম কোষের স্তরের কথা বলিলাম, তাহা পাতার ভিতরে থাকে এবং ইহাদেরি উপরে ও নীচে থাকে পাতার ছাল (Epidermis)। গাছের গুঁড়ির বা ডালপালার ছাল যেমন কাটিয়া তুলিয়া ফেলা যায়, পাতার ছাল প্রায়ই সে-রকমে উঠানো যায় না। পাথর-কুচি এবং সিজের পাতা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, খুব সরু চামড়ার মতো ছাল পাতার উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। কিন্তু আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতির পাতার ছাল তোমরা কোনোক্রমে উঠাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবে না। পাতাগুলিকে বেশি রৌদ্র এবং বেশি শীত হইতে রক্ষা করে বলিয়াই ইহাকে পাতার ছাল বলা হয়।

কাচের মতো স্বচ্ছ কতকগুলি কোষ মিলিয়াই পাতার ছালের সৃষ্টি হয়। এই কোষগুলির প্রাচীর খুব পুরু, কিন্তু ভিতরে পত্র-হরিতের নাম-গন্ধ থাকে না এবং জীব-সামগ্রীও

অতি অল্প থাকে। ইহাই কোষের ভিতরকার প্রধান জিনিস। কোনো কোনো গাছের পাতায় এই কোষগুলি আবার রঙিন্ রসে পূর্ণ থাকে। পাতাবাহার গাছে তোমরা যে-সব রঙ্ দেখিতে পাও, তাহা এই রসেরই রঙ্।

বায়ু-পথ

কোনো গাছের একটি ছোটো ডাল ভাঙিয়া গরমের দিনে চারি পাঁচ মিনিটের জন্য রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিয়ো ; দেখিবে, তাহার পাতাগুলি আর আগেকার মতো খাড়া না থাকিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে। রৌদ্রের তাপে রস শুকাইয়া যায় বলিয়াই পাতাগুলির ঐরকম দুর্দ্দশা হয়। যাহাতে রস না শুকায়, তাহার জন্য পাতায় একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের দিনে যাহাতে গরম বাতাস ঘরে না আসিতে পারে, তাহার জন্য আমরা দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকি। আবার খুব গুমটের দিনে যাহাতে ঘরে বাতাস আসে, তাহার জন্য সব দরজা-জানালা খুলিয়া দিই। পাতায় কতকটা সেই রকমেরই ব্যবস্থা আছে। ইহার তলাকার ছালে খুব ছোটো ছোটো অনেক ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে আরো ছোটো ছোটো কপাটের মতো ব্যবস্থা থাকে। এই ছিদ্রগুলিকে বায়ু-পথ (Stomata) বলা হয়। যে-দিন খুব গরম হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প অল্প থাকে, সে-দিন পাতারা ঐ-সব কপাট বন্ধ করিয়া দেয়। আবার যে-দিন খুব

ঠাণ্ডা থাকে এবং ভিতরকার জল শুকাইবার ভয় থাকে না, সেদিন পাতারা সেই-সব কপাট খুলিয়া দেয়। এই অবস্থায় পাতার ভিতরকার খারাপ বাষ্প কপাট দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের ভালো বাতাস পাতার ভিতরে আনা-গোনা করে। খুব মজার ব্যাপার নয় কি?

আমাদের কল-কারখানায় যখন কুলি-মজুরেরা কাজ করে তখন সেখানকার সব দরজা-জানালা খোলা থাকে। সেই-সব পথ দিয়া কুলি-মজুর যাওয়া-আসা করে এবং কলের ধোঁয়া ও খারাপ বাতাস বাহির হইয়া যায়। পাতাতেও আমরা ঠিক্ তাহাই দেখিতে পাই। ইহার ভিতরকার কোষগুলিতে যখন দিনের বেলায় খাদ্য তৈয়ারি হয়, তখন সেখানে অনেক খারাপ বাষ্প জন্মিতে থাকে। ইহা গাছের অনিষ্ট করে। তাই সে-সময়ে পাতার সব বায়ু-পথ অর্থাৎ কপাট খোলা থাকে। কিন্তু যেই রৌদ্রের তাপ ইত্যাদির উৎপাত বেশি হয়, অমনি বায়ুপথের কপাটগুলি ঝপাৎ করিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

আমরা দিনের বেলায় স্কুলে যাই, কত লাফালাফি করি এবং রাত্রি বেলায় বিছানায় শুইয়া ঘুমাই। ঘুমে আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়, শরীর পুষ্ট হয় এবং গায়ে নূতন শক্তি আসে। গাছরাও এই-রকমে দিন-রাত্রি মানিয়া জীবনের কাজ চালায়। দিনের বেলায় ইহাদের পাতায় খাদ্য তৈয়ারি হয় এবং রাত্রিতে ইহারা সেই খাদ্য খাইয়া পুষ্ট হয়। তাই রাত্রিকালে পাতার বায়ু-পথ প্রায়ই বন্ধ থাকিতে দেখা যায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এখনি একটা পাতা ছিঁড়িয়া তাহার বায়ু-পথ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কিন্তু সেগুলি এত ছোটো জিনিস যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও তোমরা খালি-চোখে দেখিতে পাইবে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে না ফেলিলে পাতার বায়ু-পথ দেখা যায় না। ইহা পাতার সর্ব্বাঙ্গেই থাকে, কিন্তু উপরিভাগের চেয়ে পাতার তলাতেই সেগুলিকে বেশি দেখিতে পাওয়া যায়।

নাক-মুখ চাপিয়া রাখিলে আমাদের যেমন কষ্ট হয়, গাছদের পাতার বায়ু-পথ বন্ধ হইলে তাহাদেরো সেই-রকম কষ্ট হয় এবং বেশি দিন বন্ধ থাকিলে তাহারা মরিয়া যায়। তাই ধূলা ও ধোঁয়াতে বায়ু-পথ বন্ধ হইয়া গেলে, পাতাগুলি মড়ার মতো হইয়া পড়ে। তার পরে বৃষ্টির জলে ধূলামাটি বায়ুপথ হইতে সরিয়া গেলে তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। গ্রীষ্মকালে যখন বৃষ্টি হয় না, সে-সময়ে বাগানের মালিরা ঝাঝ্‌রির জল দিয়া ফুল গাছের পাতা ধুইয়া দেয়। ইহাতে গাছের কি উপকার হয়, এখন তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

পাতার ভিতরকার কোষ-সজ্জা

পর-পৃষ্ঠায় যে-ছবিটি দিলাম, তাহাতে পাতার ভিতরকার কোষের স্তর, তাহার ছালের কোষ এবং বায়ু-পথ ইত্যাদি সকলি দেখিতে পাইবে।

ছবির কিনারায় যে মালার মতো কোষ সাজানো আছে, সেগুলি পাতার ছালের কোষ। সেগুলি কাচের মতো স্বচ্ছ,—তাহাতে পত্র-হরিৎ থাকে না; থাকে কেবল রস। তাহার নীচেতে যে-সব কোষকে থামের মতো সাজানো দেখিতেছ, সেগুলিকেই আমরা পত্রান্তঃকোষ বলিয়াছি। এগুলি পত্র-হরিৎ এবং জীব-

পাতার কোষ-সজ্জা
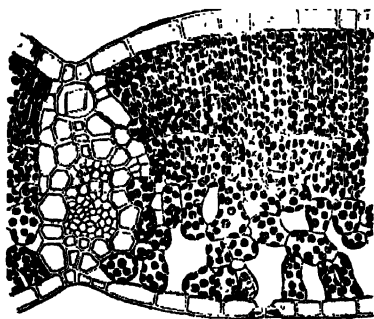
সামগ্রীতে পূর্ণ। ইহাই পাতার রঙ্‌কে সবুজ করে। ইহার নীচে আর এক রকম গোল-আকৃতি কোষ ছবিতে দেখিতে পাইবে। এগুলির প্রাচীর খুব পাৎলা এবং এলোমেলোভাবে সাজানো।

পর-পৃষ্ঠার ছবির উপর দিকে যে সাঁকোর মতো অংশ দেখিতে পাইতেছ, উহা পাতার একটা বায়ুপথ। ইহার পাশে যে দুইটি কোষ আছে, তাহা ঐপথের কপাট। ছালের কোষে পত্র-হরিৎ থাকে না, কিন্তু কপাটের কোষে থাকে। বায়ু-পথের উপরেই যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা রহিয়াছে, সেখানে পাতার ভিতরকার খারাপ বাষ্প জমা হয় এবং কপাট খোলা থাকিলেই তাহা বায়ু-পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

বায়ু-পথের ছবিটি দেখিলে কপাটের কোষ এবং ভিতরকার ফাঁক কি-রকম, তাহা আরো স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

বায়ু-পথ

পাতায় বায়ু-পথ অনেক থাকে। প্রত্যেক সাধারণ পাতায় এ-গুলিকে চারি পাঁচ হাজারের কম কখনই দেখা যায় না। কোনো কোনো পাতায় আবার এক-লক্ষ, দেড়-লক্ষ বায়ু-পথও দেখা যায়।

আমাদের ঘরের দরজা-জানালা খুলিবার বা বন্ধ করিবার দরকার হইলে আমরা হাত দিয়াই সে-সব কাজ করি। পাতার হাত-পা নাই, বুদ্ধি-বিবেচনাও নাই। তবুও দরকার হইলে তাহারা কি-রকমে বায়ুপথের দরজা খোলে এবং বন্ধ করে, ইহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? তোমা-দিগকে এখন সেই কথাই বলিব।

মনে কর, দিনের বেলায় ভয়ানক রৌদ্রে যেন পাতার বায়ু-পথ বন্ধ আছে। তার পরে আকাশে মেঘ করিল এবং বৃষ্টি হইয়া গেল। এখন কপাট খুলিয়া পাতাদের আরাম করিবার সময়। এই অবস্থায় কপাটের কোষগুলি পাশের অন্য কোষ হইতে জল টানিতে আরম্ভ করে। কাজেই, তখন সেগুলি ফাঁপিয়া ও বাঁকিয়া বন্ধ পথ খুলিয়া দেয়। তখন বাহিরের

নির্ম্মল বাতাস খোলা কপাট দিয়া ভিতরে আসিয়া পাতা-গুলিকে সতেজ করে।

খুব রৌদ্রের সময়ে ইহাতে ঠিক উল্‌টা কাজ চলে। তখন রৌদ্রের তাপে কপাটের কোষের রস উড়িয়া যায়,—কাজেই, এই অবস্থায় শুক্‌না কোষগুলি আর বাঁকিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই, সেগুলি তখন গায়ে-গায়ে লাগিয়া বায়ু-পথ বন্ধ করিয়া ফেলে।

বায়ু-পথের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার ইহা সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি ?

বল্ক-ছিদ্র

অনেক গাছের সবুজ ডালেও পত্র-হরিতে-ভরা অনেক কোষ থাকে। সেখানেও গাছের খাদ্য তৈয়ারি হয়। লেবু, অশথ, বট এবং আম গাছের কচি ডগা পরীক্ষা করিলে তোমরা সেগুলিকে পাতার মতোই সবুজ দেখিতে পাইবে। এই-সব ডালের ছালের কোষে পত্র-হরিৎ থাকে। এই জন্য পাতারা যেমন বায়ু-পথ দিয়া ভিতরকার বাষ্প ছাড়ে এবং হাওয়া খায়, এই সব গাছের ডালেরও সেই রকমে হাওয়া খাওয়া ইত্যাদির দরকার হয়। ইহার জন্য ছালে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। বট, অশথ এবং গোলাপের কচি সবুজ ডাল পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহার ছালের জায়গায় জায়গায় একটু করিয়া উঁচু অংশ আছে। এগুলির রঙ্ ডালের

রঙের সহিত ঠিক্ মিলে না, কতকগুলি কর্ক-কোষ উৎপন্ন হইয়া ঐ জায়গাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে। ইহাই ছালের বায়ু-পথ। এগুলিকে তোমরা বল্ক-ছিদ্র (Lenticel) নাম দিতে পার। এই-সব ছিদ্র দিয়াই ছালের ভিতরে হাওয়া প্রবেশ করে এবং ভিতরের অনাবশ্যক বাষ্প বাহিরে আসে। কিন্তু বায়ু-পথে যেমন কপাটের ব্যবস্থা আছে, বল্ক-ছিদ্রে তাহা একবারে নাই। এগুলির মুখ খোলাই থাকে। তার পরে ডালগুলি যখন মোটা হয়, এবং তাহার গায়ে কর্ক-কোষের সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন ঐ-সব পথের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ছিদ্রের দাগগুলিকে বহুকাল ধরিয়া ডালের গায়ে দেখা গিয়া থাকে। তোমরা খোঁজ করিলে বট, অশথ প্রভৃতির মোটা ডালেও বল্ক-ছিদ্রের দাগ দেখিতে পাইবে।

পাতা-ঝরা

কেমন করিয়া গাছের পাতাগুলি একে একে ডাল হইতে ঝরিয়া পড়ে সে-সব কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কাঁচা পাতার প্রত্যেক শিরা-উপশিরার সহিত গুঁড়ির এবং ডালের নালিকাগুচ্ছ প্রভৃতির যোগ থাকে। তাই গাছরা শিকড় দিয়া যে আকরিক খাদ্য ও রস টানিয়া লয়, তাহা পাতায় গিয়া পৌছায়। তার পরে বোঁটার নীচে যেই শুক্না কর্ক-কোষের সৃষ্টি হইতে থাকে, অমনি রস যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতেই পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।

নারিকেল, তাল প্রভৃতির বড় বড় পাতা ঝরিয়া পড়িলে তাহাদের গুঁড়িতে পাতার বোঁটার লম্বা লম্বা দাগ বহুকাল ধরিয়া দেখা যায়। যে-কোনো তাল বা নারিকেল গাছ পরীক্ষা করিলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। এই সকল লম্বা দাগের উপরে অনেক সময়েই ছিঁটে-ফোঁটার মতো এক রকম চিহ্ন থাকে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? যে-সকল নলিকাগুচ্ছ গুঁড়ি হইতে বাহির হইয়া পাতায় রস জোগায় এগুলি তাহারি চিহ্ন।

পাতার কাজ

গাছের যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা তোমাদিগকে বলিলাম, তাহার কোনোটাই অকেজো নয়। অকেজো জিনিস জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে খুব অল্পই আছে। মানুষ যখন একটা-কিছু সৃষ্টি করে, তখন তাহাতে অনেক অকেজো জিনিস আনিয়া ফেলে। পাতার আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু গাছে থাকিয়া পাতাগুলি গাছের কি উপকার করে, তাহা এখনো বলা হয় নাই। কেবল গাছের তলার মাটিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যই কি হাজার হাজার পাতা গাছের ডালে লাগানো থাকে? তাহা কখনই নয়।

গাছরা কি খায়, তোমাদিগকে আগেই তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি। পাতারা কি কাজ করে বুঝিতে হইলে সেই-সব কথা মনে করা দরকার হইবে।

আমাদের মতো হাট-বাজারে গিয়া গাছরা খাবার জোগাড় করিয়া আনিতে পারে না। তা'ছাড়া ইহাদের এমন বন্ধু-বান্ধবও নাই, যাহারা অন্য জায়গা হইতে খাবার জোগাড় করিয়া মুখের গোড়ায় ধরে। তাহারা মাটিতে শিকড় নামাইয়া এবং বাতাসে মাথা উঁচু করিয়াই সমস্ত জীবন

কাটাইয়া দেয়। সুতরাং বাতাস ও মাটিই তাহাদের খাদ্য সংগ্রহের জায়গা। সত্যই তাই,—গাছরা মাটি ও বাতাস ছাড়া আর কোনো জায়গা হইতে খাবার পায় না।

একটা গাছের তাজা ডাল কাটিয়া তোমরা যদি কিছুক্ষণ উননের তাপে ফেলিয়া রাখো, তাহা হইলে ডালের পাতা শুকাইয়া যায়। তখন তাহার পূর্ব্বের মতো শ্রী থাকে না। সুতরাং বলিতে হয়, জলই গাছের দেহের একটা প্রধান সামগ্রী। এই জল কি-রকমে গাছরা মাটি হইতে চুষিয়া লয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি।

যাহা হউক এখন মনে কর, সেই শুক্‌না ডালটিকে যেন তোমরা আগুন ধরাইয়া পোড়াইতে আরম্ভ করিলে। শুক্‌না ডাল আগুনে দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া গেল। এই অবস্থায় তোমরা একটু ছাই ছাড়া ডালের আর কোনো চিহ্নই দেখিতে পাইবে না। এই ছাই জিনিসটা আকরিক বস্তু অর্থাৎ মাটির তলাকার দ্রব্য। গাছরা ইহাও মাটি হইতে শিকড় দিয়া সংগ্রহ করে।

আকরিক বস্তু গাছে অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। কোনো কোনো গাছে ইহার পরিমাণ সমস্ত গাছের এক শত ভাগের এক ভাগের চেয়েও অল্প দেখা যায়, কিন্তু জলসম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। সাধারণ গাছের দেহের বারো আনাই জল। মূলা প্রভৃতি গাছে আবার শতকরা নব্বুই অর্থাৎ সাড়ে চৌদ্দ আনা জল দেখা যায়।

আকরিক দ্রব্য ও জল লইয়াই কি গাছের দেহের সৃষ্টি? সত্য ব্যাপার তাহা নয়। পুড়িবার সময়ে গাছের দেহের যে-সব জিনিস বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, তাহাও গাছের দেহের উপাদান। গাছরা বাতাস হইতে এগুলিকে জোগাড় করে।

যে-সব জিনিস বাতাস হইতে আসিয়া গাছের দেহে জমা হয়, তাহার মধ্যে অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাই প্রধান। শুক্‌না গাছের প্রায় অর্দ্ধেকটাই কয়লা। ইহা অন্যান্য জিনিসের সহিত মিশিয়া নানা আকারে গাছেই থাকে। গাছ পোড়াইলে যে কয়লা হয়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? কিন্তু ছাইয়ে কয়লার খোঁজ পাওয়া যায় না। যখন অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঠ আগুনে পোড়ে তখন তাহার কয়লা বাতাসের অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; কাজেই, এই অবস্থায় আমরা কয়লা দেখিতে পাই না।

যে উপায়ে গাছরা বাতাস হইতে কয়লা সংগ্রহ করে, তাহা বড় মজার। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ,—বাতাসে তো কখনই কয়লা ভাসিয়া বেড়ায় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া বাতাস হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে? কিন্তু বাতাসে যথেষ্ট কয়লা অর্থাৎ অঙ্গার আছে। ইহা সেখানে ঠিক্ কালো কয়লার আকারে থাকে না,—অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্পের আকারে থাকে। বাতাসকে যেমন চোখে দেখা যায় না, অঙ্গারক বাষ্পকেও সেই রকম চোখে দেখিতে

পাওয়া যায় না। তাই আমরা বাতাসের অঙ্গারক বাষ্পকে চোখে দেখিতে পাই না। দশ হাজার ভাগ বাতাসে প্রায় তিন ভাগ অঙ্গারক মিশানো থাকে।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ এই অঙ্গারক বাষ্প কেমন করিয়া বাতাসে মিশিল। সৃষ্টির গোড়া হইতেই আকাশে যেমন বাতাস আছে, তেমনি অঙ্গারক বাষ্পও আছে। তা'ছাড়া মানুষ গরু ভেড়া প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের নিশ্বাসের সঙ্গেও অনেক অঙ্গারক বাষ্প শরীর হইতে বাহির হয় এবং কাঠ ও কয়লা পোড়াইলেও ইহা অনেক পরিমাণে বাতাসে আসিয়া জমে। এই জন্যই বাতাসে অঙ্গারক বাষ্পের অভাব হয় না।

এই বাষ্পটি প্রাণীদের দেহের কোনো কাজেই লাগে না বরং দেহে প্রবেশ করিলে বিষের মতো কাজ করে। চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালাইয়া রাখায়, ঘরের সব মানুষই মরিয়া গিয়াছে, এ-রকম ঘটনার কথা তোমরা শুন নাই কি? আগুন জ্বালাইলে অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয় বলিয়াই, এ-রকম আবদ্ধ ঘরের লোকজন মারা যায়। কোনো জিনিস পচিবার সময়েও অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন করে। পুরানো পাত-কুয়ার তলায় প্রায়ই লতাপাতা পচে। তাই সেখানে অনেক সময়ে অঙ্গারক বাষ্প জমা থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং দেখ,—পরিমাণে অল্প হইলেও বাতাসে অঙ্গারক বাষ্প যথেষ্ট আছে।

গাছের পাতা বাতাসের অঙ্গারক বাষ্পকে কি-রকমে কাজে

লাগায় এখন সেই কথাটা বলিব। পাতার ভিতরকার কোষে যে সবুজ রঙের পত্র-হরিৎ থাকে, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। পাতার বায়ুপথ দিয়া বাতাসের সঙ্গে যখন অঙ্গারক বাষ্প ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সেই পত্র-হরিতের কণাগুলি অঙ্গারক বাষ্পকে চুষিয়া লয়। তার পরে তাহাই অঙ্গারক বাষ্প হইতে খাঁটি অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাটুকু আত্মসাৎ করিয়া বাষ্পের অক্সিজেনকে বাহির করিয়া ফেলে। পাতাদের এই কাজটি দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোতে চলে। তাই অক্সিজেন বাষ্প দিনের বেলাতেই পাতা হইতে বাহির হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গাছের পাতায় যতটা অঙ্গারক বাষ্প প্রবেশ করে, ঠিক ততটা খাঁটি অক্সিজেন বাহিরে আসে। অঙ্গারক বাষ্প প্রাণীদের পরম অপকারী বস্তু। সুতরাং সেই অপকারী বাষ্প চুষিয়া লইয়া, তাহার বদলে পরম উপকারী অক্সিজেন বাষ্প বাতাসে ছাড়িয়া গাছরা প্রাণীদের খুব উপকার করে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে বাতাসে এত অঙ্গারক বাষ্প জমিয়া যাইত যে, তাহা দিয়া আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলিত না। সুতরাং দেখ, গাছরা কেবল ফুল, ফল, শাক-সব্জি দিয়াই যে আমাদের উপকার করে, তাহা নয়,—গাছ-গাছড়ার দ্বারা আকাশের বাতাসও নির্ম্মল হয়।

যাহা হউক, অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার টানিয়া লইয়া পত্র-হরিৎ আর যে-সব কাজ করে, তাহা আরো অদ্ভুত।

গাছরা শিকড় দিয়া মাটি হইতে যে জল ও আকরিক জিনিস চুষিয়া লয়, তাহা শিরা দিয়া পাতায় পৌঁছিলে সেই অঙ্গারের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তার পরে পত্র-হরিৎ সেগুলি দিয়া গাছের খাদ্য তৈয়ারি করে। কিন্তু পত্রহরিৎ একা এই কাজটি করিতে পারে না ; রাসায়নিক পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়। তোমরা বোধ হয় জানো, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন, এই দুইটি বাষ্প একত্র হইয়া জলের উৎপত্তি করে। কিন্তু জলকে ভাঙিয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পৃথক্ করিতে গেলে, কাজটি সহজে করা যায় না। তখন বিদ্যুতের বা অন্য-কিছুর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। তাই জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বাষ্প পাওয়া যায়। এইজন্যই অঙ্গারক বাষ্প ও জলকে ভাঙিয়া-চুরিয়া যখন পত্র-হরিৎ গাছের খাদ্য তৈয়ারি করে, তখন সূর্য্যের আলোর সাহায্য গ্রহণ করে। সূর্য্যের আলোর শক্তি ব্যতীত একা পত্র-হরিৎ কখনই গাছের খাদ্য তৈয়ারি করিতে পারে না। যেখানে একবারে আলো আসে না, সেখানকার গাছপালাদের কি-রকম দুর্দ্দশা হয়, তোমরা দেখ নাই কি ? গোড়ায় খুব সার দিলেও সেই-সব গাছের পাতায় যে পত্র-হরিৎ থাকে, তাহা আলো না পাইয়া খাদ্য তৈয়ারি করিতে পারে না। কাজেই, খাবার না পাইয়া অন্ধকারের গাছ মরিয়া যায়।

পত্র-হরিৎ এই রকমে পাতার ভিতরে যে-খাবার তৈয়ারি

করে, সেটি কি-রকম বস্তু তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। এই জিনিসটাকেই আমরা সাধারণ ভাষায় চিনি বলি। চিনি জলের সঙ্গে মিশিলেই গুলিয়া যায়। তাই ইহা জলের সঙ্গে পাতার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া গাছের নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করে এবং শেষে নানা পরিবর্ত্তনের পরে ফুল, ফল প্রভৃতি সকল অঙ্গকেই পুষ্ট করিতে থাকে।

তাহা হইলে দেখ, পাতাগুলি যেন গাছদের রান্নাঘর। অঙ্গারক বাষ্প ও জলই গাছদের চাল ডাল এবং তরিতরকারি। আমরা যেমন উনন জ্বালিয়া ভাত ও তরিতরকারি রাঁধি, সূর্য্যের আলোর সাহায্যে পত্র-হরিৎই সেই-রকমে গাছের প্রধান খাদ্য চিনি তৈয়ারি করে এবং পাতার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া তাহা চারিদিকে চালান করিয়া দেয়। তার পরে এই খাদ্যই গাছের নানা অঙ্গে নানা রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করিতে থাকে।

কোষের ভিতরে যে জীব-সামগ্রী থাকে, তাহাই গাছদের প্রাণ। ইহাই নূতন কোষের সৃষ্টি করিয়া গাছকে বাড়ায়। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। যে বস্তু দিয়া কোষসামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে প্রোটিন্ নাম দেওয়া হয়। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়া নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি কয়েকটি মূল বস্তু প্রোটিনে মিশানো দেখা যায়। যাহা হউক এই জিনিসটাও চিনি এবং শিকড়ের টানা রস দিয়া পাতায় প্রস্তুত হয় এবং

সেখান হইতে পাতার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া গাছের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গাছের পাতাগুলি সামান্য জিনিস নয়। এখানেই গাছের খাদ্য চিনির আকারে প্রস্তুত হয় এবং সেই চিনি দিয়া জীব-সামগ্রী তৈয়ারির সাহায্য হয়। তার পরে এই সকল খাদ্য যখন গাছের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহাদেরি দ্বারা গাছের বৃদ্ধি সুরু হয় এবং তাহাতে নূতন কাঠ, নূতন পাতা ও নূতন ফুল-ফলের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়।

মাটির জল ও আকরিক বস্তু ডালের ও গুঁড়ির নলিকা দিয়া কি-রকমে উপরে উঠে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। পাতায় তৈয়ারি খাদ্যরস কি-রকমে নীচেতে নামে, তাহা এখনো তোমাদিগকে বলা হয় নাই। ছালের তলায় সাজানো যে-সব নলের মতো কোষের কথা তোমা-দিগকে আগে বলা হইয়াছে, সেগুলির ভিতর দিয়াই পাতার রস নীচে নামে। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, গাছে দুইটি রসের ধারা আছে। এক ধারা শিকড় হইতে বাহির হইয়া, গুঁড়ি ও ডালপালার কাঠের ভিতরে ভিতরে চলিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়ায়। আর এক ধারা পাতায় উৎপন্ন হইয়া তাহার শির-উপশিরা এবং ছালের তলার কোষ দিয়া গাছের সব জায়গায় ব্যাপ্ত হয়।

গাছের খাদ্য-ভাণ্ডার

সংসারী মানুষ ভবিষ্যতের ভাবনায় সংসারের কত জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। যখন চাল সস্তা থাকে, তখন তাহারা বৎসরের খরচের মতো চাল কিনিয়া ভাণ্ডারে মজুত করিয়া রাখে। তার পরে চালের দাম বাড়িয়া গেলে সেই মজুত চাল খরচ করিয়া অল্প ব্যয়ে তাহারা সংসার চালায়। বর্ষাকালে ভিজে কাঠে উনন ধরে না বলিয়া সংসারী মানুষ বর্ষার আগে শুক্না কাঠ ঘরে বোঝাই করিয়া রাখে। ইহাতে বর্ষাকালে উনন ধরাইতে কষ্ট হয় না। ইহা ছাড়া তাহারা খুঁটিনাটি আরো কত বিষয়ে যে মনোযোগী থাকে, তাহার হিসাবই হয় না। অন্যান্য প্রাণীরাও এ-বিষয়ে কম সতর্ক নয়। যখন মাঠে ঘাসের বীজ বেশি থাকে তখন পিঁপড়ের দল তাহা মুখে করিয়া আনিয়া গর্ত্তে জমা রাখে। তার পর যখন কোনো খাদ্যই পাওয়া যায় না, তখন তাহারা সেই খাবার খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রাণীদের মতো গাছরাও অসময়ের জন্য খাবার জোগাড় করিয়া রাখে। আমরা এখানে সেই কথা বলিব।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, গাছের পাতায় যে চিনির আকারের খাবার তৈয়ারি হয়, তাহা গুঁড়ি, শিকড়, ফুল,

ফল, মুকুল প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িয়া সেগুলিকে পুষ্ট করে। কিন্তু ইহাতে সব চিনিই খরচ হয় না,—যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা উহারা নানা আকারে দেহের নানা জায়গায় সঞ্চিত রাখে। আলু, হলুদ, আদা, ওল, কচু প্রভৃতিতে যে শ্বেতসার থাকে তাহাই উহাদের ঐরকম সঞ্চিত খাদ্য। পাতায় প্রস্তুত হইয়া এই খাদ্য শ্বেতসারের আকার লইয়া ঐ-সব গাছের শিকড় বা গুঁড়িতে জমা থাকে। তার পরে যখন দরকার হয়, তখন শ্বেতসারই আবার চিনির আকার ধরিয়া গাছকে পুষ্ট করিতে থাকে। কেবল শিকড়েই যে শ্বেতসার জমা থাকে, তাহা নয়। খোঁজ করিলে গাছমাত্রেরই পাতা, ডাল, ফল প্রভৃতিতেও উহা অনেক জমা থাকিতে দেখা যায়। ধান, গম, যব, আলু প্রভৃতি জিনিস আমাদের প্রধান খাদ্য। এগুলিতে অনেক শ্বেতসার জমা থাকে, তাহারি জন্য মানুষ অনেক চেষ্টায় ধান, গম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। শ্বেতসার জিনিসটা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দুইয়েরই প্রধান খাদ্য।

শীতকালে আমড়া, জিউলি প্রভৃতি গাছের কি দশা হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ,—তখন এ-সব গাছে একটিও পাতা থাকে না। তার পরে যেই বসন্তের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করে, অমনি তাহাদের গাঁটে গাঁটে ফুল ও পাতার অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়ে। বর্ষার জল ও হেমন্তের শিশির পাইয়া যখন এই গাছগুলি পুষ্ট হয়, তখন তাহারা ভবিষ্যতের ফুল ফল

এবং পাতার জন্য অনেক খাদ্য শরীরের নানা জায়গায় শ্বেত-সারের আকারে জমা রাখিয়া দেয়। তার পরে সেই সব খাবার খাইয়াই তাহাদের ফুলের অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে। বসন্ত কালে নেড়া আমড়া, শিমূল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির গাছ চারি পাঁচ দিনের মধ্যে মুকুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, প্রাণীদের মতো বুদ্ধি না থাকিলেও যাহাতে দুঃসময়ে অনাহারে মারা না যায় তাহার ব্যবস্থা গাছদের শরীরেই আছে।

সরিষা, ভেরেণ্ডা, তিসি, কাপাস, নারিকেল প্রভৃতি গাছের বীজে তেল জমা থাকে। গাছরা তাহাদের প্রধান খাদ্য চিনিকে রূপান্তরিত করিয়া তেল প্রস্তুত করে। যখন বীজ হইতে ছোটো চারা বাহির হয়, তখন তাহারা ঐ সঞ্চিত খাদ্য আবার চিনিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া খাইতে আরম্ভ করে। ছোটো নিঃসহায় চারাদের বাঁচাইবার জন্য গাছে কেমন সুব্যবস্থা আছে ভাবিয়া দেখ। কিন্তু মানুষের হাত হইতে গাছদের এই খাদ্যভাণ্ডার রক্ষা পায় না। যে-তেল গাছরা ছোটো চারাদের জন্য বীজে সঞ্চিত রাখে, মানুষরা ঘানিতে ও কলে সেই বীজ পিষিয়া তেল বাহির করে এবং তাহা নিজেদের কাজে লাগায়।

পাতার গন্ধ

লেবু, বেল, জাম, তুলসী, কথ্‌বেল, প্রভৃতি অনেক গাছের পাতা হাতে রগ্‌ড়াইলে এক-এক রকম গন্ধ বাহির হয়। তোমরা ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। এই সব গাছের পাতার বিশেষ বিশেষ কোষে বা ছালের গায়ের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিতে যে-তেল জমা থাকে, তাহাই পাতায় ও ছালে ঐ-রকম গন্ধের উৎপত্তি করে। এই সকল তেল সরিষা, তিসি বা নারিকেলের তেলের মতো নয়,—কোষ হইতে বাহির হইলেই সেগুলি কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। এই জন্যই ইহাদের কড়া গন্ধ আমাদের নাকে পৌঁছায়। গোলাপ, মল্লিকা রজনীগন্ধা, প্রভৃতি ফুল ফুটিলে তোমরা যে সুগন্ধ পাও, তাহাও ফুলের বিশেষ বিশেষ কোষের ঐ-রকম তেলের গন্ধ। গাছরা তাহাদের খাদ্য চিনিকে রূপান্তরিত করিয়া এই-সব তেলের সৃষ্টি করে।

এই সকল তেল কেন গাছের পাতায় ও গায়ে উৎপন্ন হয়, আজো ঠিক জানা যায় নাই। গায়ে ও পাতায় গন্ধ-ওয়ালা তেল থাকায় অনেক সময়ে লেবু, বেল, তুলসী প্রভৃতি গাছকে গরু-বাছুরে খায় না, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সকল গাছ-সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

ধূনা, রজন, কর্পূর, রবার প্রভৃতি অনেকগুলি গন্ধ-ওয়ালা জিনিস গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। এ-গুলিকেও গাছরা খাদ্য-

রসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেহের নানা জায়গায় উৎপন্ন করে। কিন্তু কেন করে, তাহা আজো জানা যায় নাই।

আফিং, তামাক, কুচিলা, সিন্‌কোনা, কোকেন্ প্রভৃতি গাছের কাহারো পাতায়, কাহারো ফলে বিষের মতো জিনিস সঞ্চিত থাকে। যাহাতে গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা গাছ-গুলিকে খাইয়া নষ্ট করিতে না পারে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। ছাতিম, নিম, শিউলি প্রভৃতি গাছের পাতা ও ডালের তিক্ত স্বাদও এই জন্য। এই সব গাছকে কখনই গরু বাছুর বা ছাগলে নষ্ট করিতে পারে না। এই বিস্বাদ জিনিসগুলিকেও গাছরা তাহাদের শরীরের খাদ্য-রস দিয়া প্রস্তুত করে।

গাছের নিশ্বাস-প্রশ্বাস

তোমরা হয়ত মনে কর, মানুষ, গরু, ভেড়া প্রভৃতি ছোটো-বড় প্রাণীরাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। কিন্তু তাহা নয়,—গাছরাও প্রাণীদের মতো নিশ্বাস টানে এবং তাহাতে যে-বাতাস শরীরের ভিতরে যায়, তাহা হইতে অক্সিজেন চুষিয়া লইয়া জীবনের কাজ চালায়। নিশ্বাস লইবার জন্য গাছের দেহে ফুস্‌ফুসের মতো বিশেষ যন্ত্র নাই। ইহারা ডালা-পালা, পাতা প্রভৃতির বায়ুপথ এবং বল্কছিদ্র দিয়া বাতাস টানে। শিকড়দেরও নিশ্বাস লওয়ার দরকার হয়। মাটির সঙ্গে যে-বাতাস মিশানো থাকে, ইহারা তাহাই টানিয়া লয়। গাছের গোড়া বেশি দিন জলে ডুবিয়া থাকিলে গাছ মরিয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? জলে ঢাকা পড়িলে মাটিতে বাতাস থাকিতে পারে না,—কাজেই, শিকড়ের গোড়ার মাটিতে বাতাস না পাইয়া গাছ দম বন্ধ হইয়া মারা যায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, তাহা হইলে ধান, পদ্ম, শালুক, পানফল, প্রভৃতি জলের গাছরা কেন মরে না? এ-সব গাছের শরীরে অন্য উপায়ে বাতাস যায়। তোমরা যদি একটি পদ্মের ডাঁটা' পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সমস্ত

ডাঁটার ভিতরে পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সরু সরু নল লাগানো আছে। এই নলগুলি বাতাসে ভর্ত্তি থাকে। কাজেই, ইহাদের নিশ্বাসের জন্য বাতাসের অভাব হয় না।

যাহা হইক, বাতাসের অক্সিজেন গাছের পাতা প্রভৃতির ভিতরকার কোষে ঠেকিলেই, তাহা সেখানকার অঙ্গার প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ প্রভৃতি শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তিতেই জীব-সামগ্রীর চলাচল, কোষ-প্রাচীরের বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ চলে। তার পরে গাছরা এই অঙ্গারক বাষ্প এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলীয় বাষ্প প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাই গাছদের নিশ্বাস ফেলা। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ গাছরা প্রাণীদের মতোই দিবারাত্রি চালায়। কিন্তু প্রাণীরা আহারের চেষ্টায় বা অন্য কাজে যে-রকম ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, গাছদের তাহা করিবার দরকার হয় না। এই কারণে বেশি বল পাইবার জন্য তাহারা প্রাণীদের মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে না।

স্বেদন

ভিজা কাপড়কে রৌদ্রে মেলিয়া দিলে তাহার জল অল্প সময়ের মধ্যেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গাছের পাতা, ছাল, সকলি ভিজে কাপড়ের মতোই জলে-ভরা,—তাই রৌদ্রের তাপে গাছের সর্ব্বাঙ্গ হইতে অনেক জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গরমের দিনে আমাদের শরীরের জল যেমন ঘামের আকারে বাহিরে আসিয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, এই ব্যাপারটা কতকটা যেন সেই রকমেরই। এই জন্মই ইহাকে স্বেদন (Transpiration) নাম দেওয়া হইল।

গাছের পাতায় ও সবুজ ছালে যে বায়ু-পথের কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। পাতার ভিতরকার জল বাষ্প হইয়া ঐ-সব পথ দিয়াই বাহির হয়। পাতার তলাতেই বেশি বায়ু-পথ থাকে, তাই স্বেদনের কাজ পাতার তলা দিয়াই বেশি চলে। চৈত্র-বৈশাখ মাসের দুপুরের রৌদ্রে তোমাদের বাগানের গাছগুলির পাতা কি-রকমে ঝাম্‌রাইয়া পড়ে, তোমরা দেখ নাই কি? তখন দেখিলেই মনে হয়, বুঝি গাছগুলি মরিয়া গিয়াছে। শিকড় হইতে যত জল উপরে উঠে, গাছ হইতে তাহা অপেক্ষা যখন বেশি জল বাষ্প হইয়া যায়, তখনি পাতা মরার মতো হয়। খুব গরমের দিনে গাছরা তাহাদের সকল বায়ু-পথই বন্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু তথাপি স্বেদন বন্ধ করিতে পারে না।

আমাদের দেশে যেমন ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, সব দেশে সে-রকম

হয় না। যে-দেশে মরুভূমি আছে, সেখানে বৎসরে একদিন বা তু'দিনের বেশি বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। এই সামান্য জলেই সেখানকার গাছপালাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। তাই যাহাতে তাহাদের গায়ের রস রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া না যায়, সেজন্য এই-সব গাছের দেহে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশের কলা পেঁপে প্রভৃতি গাছের যেমন বড় বড় পাতা দেখা যায়, মরুভূমির কোনো গাছে সে-রকম পাতা থাকে না। সেখানকার অনেক গাছেরই পাতা ছোটো হইয়া জন্মে, আবার কোনো কোনো গাছে পাতার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মরুভূমির গাছরা প্রায়ই গায়ের ছালকে সবুজ এবং দেহগুলিকে মোটা চামড়ায় ঢাকিয়া রাখে। তাই শরীরের রস সূর্য্যের তাপে উড়িয়া যাইতে পারে না। তোমরা আমাদের দেশে এ-রকম গাছ দেখ নাই কি? কাঁটা সিজ ঐ-সব গাছের জাত-ভাই। ইহাদের পাতা হয় না; পাতার জায়গায় অনেকগুলি করিয়া কাঁটা থাকে। তার পরে আবার সমস্ত দেহ মোটা চাম্‌ড়ার মতো ছালেও ঢাকা থাকে। তাই খুব গরমের দিনেও সিজ গাছ শুকায় না এবং কাঁটার ভয়ে গরু-বাছুরেরাও তাহাদের উপরে অত্যাচার করিতে পারে না। মরুভূমির অনেক গাছেই এই-রকম পাতার বদলে কাঁটা দেখা যায়। এই সব বিশেষ ব্যবস্থা থাকে বলিয়াই সেখানকার ভয়ানক তাপে ও গরু-বাছুরের উৎপাতে গাছগুলি মরে না।

ডুমুর, শিউলি, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতির পাতায় যে-সব

শুঁয়ো লাগানো থাকে, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। আমাদের মাথার চুল এবং পশুপক্ষীদের গায়ের লোম ও পালক দেহকে গরম রাখে এবং অনেক সময়ে বাহিরের আঘাত হইতেও শরীরকে রক্ষা করে। কিন্তু পাতার গায়ের শুঁয়ো তাহাদের কি উপকার করে, তাহা জানা যায় নাই। আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন, পাতাকে ঢাকিয়া রাখিয়া সেগুলি স্বেদনের বাধা দেয়। তাহা হইলে বলিতে হয়, শুঁয়ো রস-রক্ষার কাজে গাছদের সাহায্য করে। কচি পাতা কচি ছেলেদেরই মতো অল্পে কাতর হয়। তাই তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরানো পাতার চেয়ে কচি পাতাতেই বেশি শুঁয়ো জন্মে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? যে-সব গাছের পাতায় শুঁয়ো হয়, তাহার যে-কোনো কচি পাতা ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিলে, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।

প্রাতঃকালে বাগানে বেড়াইবার সময়ে ঘাসের আগায় এবং কখনো কখনো পাতার ডগায়, মুক্তার মতো জলের বিন্দু ঝুলিতে দেখা যায়। আমরা মনে করি, এগুলি বুঝি শিশিরের বিন্দু। কখনো কখনো সত্যই শিশির জমিয়া এগুলি উৎপন্ন করে, কিন্তু প্রায়ই পাতার ভিতরকার রস ঘামের মতো বাহির হইয়া এই রকম জল-বিন্দুর আকৃতি পায়। খুব গরমের দিনে যখন গাছের গায়ে বা অন্য কোনো জায়গায় শিশির পড়ে নাই, তখন কেবল পাতার ডগায় এক বিন্দু জল ঝুলিতেছে, খোঁজ করিলে তোমরা ইহা অনেক দেখিতে পাইবে।

পরগাছা

যাহারা নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজের ছেলেপিলেদের লালন-পালন করে, লেখাপড়া শিখায় এবং পরের উপকার করে, তাহাদিগকে সকলেই সম্মান করে ও ভালবাসে। কিন্তু এ-রকম মানুষও অনেক আছে যাহারা শক্তি-সামর্থ্য থাকিতেও পরের ঘাড়ে চাপিয়া নিজের পেট ভরায়। এ-রকম মানুষকে লোকে ঘৃণা করে। গাছদের মধ্যে এই রকম নিষ্কর্ম্মা ঘৃণিত গাছ-গাছড়া অনেক আছে। ইহাদিগকে পরগাছা বা পরাশ্রয়ী (Epiphytes) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল গাছের চালচুলা নাই, নিজের শিকড় অন্য গাছে জড়াইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে। কখন কখন আবার আশ্রয়দাতার ডালের ভিতরে শিকড় চালাইয়াও ইহারা রস চুষিয়া খায়। গাছদের যদি জ্ঞানবুদ্ধি ও হাত-পা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় উহারা লাঠি মারিয়া এই সব পরগাছাদের তাড়াইত। কিন্তু গাছরা একবারে নিঃসহায়, তাই নিজের গায়ের রস চুষিয়া খাইলেও তাহারা কিছুই বলে না এবং শেষে পরকে খাওয়াইয়া নিজে শুকাইয়া মরে।

যে-সব পরগাছা আমাদের দেশে সর্ব্বদা দেখা যায়, সেগুলি প্রায় আম গাছেই বেশি হয়। ইহাদের দুই জাতি

আছে। লোকে সাধারণতঃ ইহাদিগকে বড় মাঁদা এবং ছোটো মাঁদা বলে; কেহ কেহ আবার বাঁদ্‌রাও বলে। যে ডালে বাঁদ্‌রা জন্মে, তাহা কাটিয়া আনিয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, বাঁদ্‌রার শিকড় ডালের ভিতরে সম্পূর্ণ

বাঁদ্‌রা

প্রবেশ করিয়াছে। এই রকম করিয়াই তাহারা আশ্রয়দাতার রস চুষিয়া খায়। বাঁদ্‌রার পাতাগুলি কি-রকম হয় তোমরা দেখ নাই কি? ইহা সাধারণ পাতার মতই সবুজ। সুতরাং বলিতে হয়, অঙ্গারক বাষ্প টানিয়া লইয়া ইহারা কিছু খাবার নিজেরাই তৈয়ারি করে।

আলোক-লতার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ইহাকে কেহ কেহ বোধ হয় আল্‌গুছি লতাও বলে। তাহাও এক রকম পরাশ্রয়ী গাছ।

রাস্নার গাছ তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। ইহা পাতা-ওয়ালা পরাশ্রয়ী লতানো গাছ। অন্য গাছকে শিকড় দিয়া জড়াইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। ইহার লতানো ডালে তোমরা রজনীগন্ধার পাতার চেয়ে একটু চওড়া পাতা জোড়া-জোড়া

সাজানো দেখিতে পাইবে। আম গাছেই রাস্না বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার শিকড় বাঁদ্‌রার শিকড়ের মতো আশ্রয়দাতার দেহের ভিতরে প্রবেশ করে না। খাদ্যের অনেকটাই ইহারা নিজের সবুজ পাতা দিয়া প্রস্তুত করে এবং আশ্রয়দাতা গাছের ছালে যে ধূলা মাটি ও বৃষ্টির জল লাগে, তাহা হইতে অন্য খাদ্য জোগাড় করে।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, ব্যাঙের ছাতা এবং দেওয়ালের গায়ের ছাতাগুলি পরাশ্রয়ী। কিন্তু তাহা নয়। ইহাদিগকে গলনজীবী (Saprophytes) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। মাটিতে যে-সব পচা জিনিস মিশানো থাকে, তাহা খাইয়াই ইহারা বাঁচে। এই-সব গাছের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

পোকাখেগো গাছ

বাঘে হরিণ মারিয়া খায়। শিয়ালে ছাগল-ছানা ধরিয়া খাইয়া ফেলে। বিড়ালরা ইঁদুর ধরিয়া খায়। কাঁচপোকারা আরস্লার শুঁয়ো ধরিয়া গর্ত্তের ভিতরে লইয়া যায় এবং তাহা বাচ্চাদের খাইতে দেয়। পেট ভরাইবার জন্য এক প্রাণীকে আর এক প্রাণী মারিয়া ফেলিতেছে, এ-রকম ঘটনা যে কত দেখা যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু গাছরা বুদ্ধিমান্ প্রাণীর মতো পিঁপ্‌ড়ে বা অন্য ছোটো পোকা ধরিয়া খাইতেছে, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? এ-রকম গাছ আছে; লোকে ইহাকে ইংরাজিতে Sundew বলে। আমরা বীরভূম জেলার কাঁকরের মাটিতে এই গাছ অনেক দেখিয়াছি। ইহার পাতায় অনেক ছোটো শুঁয়ো লাগানো থাকে এবং সেগুলির গোড়ায় যে-সব গ্রন্থি থাকে, তাহা হইতে আঠার মতো এক-রকম রস বাহির হয়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন শুঁয়োর গায়ে শিশিরের বিন্দু লাগিয়া আছে। পিঁপ্‌ড়ে ও মাছিরা ইহাকে মধু ভাবিয়া যেমন খাইতে যায়, অমনি শুঁয়োগুলি তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে। শুঁয়োর এই বাঁধন হইতে পিঁপ্‌ড়ে ও মাছিরা খালাস পায় না। তাহারা মড়ার মতো পাতার উপরে পড়িয়া থাকে এবং গাছরা সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের শরীরের সারাংশ সেই রসে হজম করিয়া খাইয়া ফেলে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, গাছগুলি বুদ্ধি খরচ করিয়া পিঁপ্ড়ে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নয়। কোনো জিনিসের ছোঁয়াচ্ পাইলে লজ্জাবতী লতার পাতাগুলি যেমন গুটাইয়া আসে, ইহাদের শুঁয়োগুলিও ঠিক্ সেই রকমে পিঁপ্ড়ে বা মাছির ছোঁয়াচ্ পাইবামাত্র, বাঁকিয়া উহাদের চাপিয়া ধরে।

আমেরিকায় এক-রকম পোকাখেগো গাছ পাওয়া যায়। ইহারা পাতাগুলিকে কোঁক্ড়াইয়া ঠোঙার মতো করিয়া তাহাতে এক-রকম রস বোঝাই রাখে। ইহা গাছের গা হইতে আপনিই বাহির হয়। পোকামাকড়েরা সেই ঠোঙার মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা পায় না। ঠোঙার ভিতরকার রসে তাহারা শীঘ্রই হজম হইয়া যায়। এই গাছকে আমেরিকায় কলসী-গাছ বলে। ফাঁদ পাতিয়া পোকামাকড় ধরাই ইহাদের কাজ। আমাদের পুকুরের ও বিলের ঝাঁজি শেওলাকে কীটভুক্ গাছ বলা যাইতে পারে। ইহাদের জলের তলার অংশে শিকড়ের মতো পাতায় খুব ছোটো ছোটো ঘট বা ভাঁড়ের মতো অঙ্গ দেখা যায়। ঘটে কপাট লাগানো থাকে। ঠেলিলে তাহা খুলিয়া নীচে নামে; ছাড়িয়া দিলে আবার তাহাই ঘটের মুখ বন্ধ করে। জলের সঙ্গের এক বিন্দু বাতাস ঘটে আবদ্ধ থাকে। বাহির হইতে বাতাসটুকুকে চক্চকে দেখায়। জলের পোকা-মাকড় চক্চকে জিনিস দেখিয়া কপাট ঠেলিয়া ঘটের ভিতরে যায়। কিন্তু কপাট বাহিরের দিকে খোলা

যায় না। তাই বন্দী পোকামাকড় ভিতর হইতে কপাটকে ঠেলিয়া খুলিতে পারে না; তাহাদিগকে বন্দিদশায় থাকিতে হয়। তার পরে শেওলারা ঘটের দেওয়াল হইতে এক রকম হজ্‌মি-রস বাহির করিয়া পোকামাকড়গুলিকে হজম করিয়া ফেলে। লাল ভেরাণ্ডা এবং তামাকের আঠালো পাতায় মরা পিঁপ্‌ড়ে এবং অন্য কীটদের আট্‌কাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহা দেখিয়া মনে হয়, লাল ভেরাণ্ডা ও তামাক গাছ পতঙ্গভোজী

তাহা হইলে দেখ, সাধারণ গাছরা নিতান্ত নিরীহ হইলেও তাহাদের মধ্যে দুই-একটি দুষ্টও আছে। পোকাখেগো গাছদের তোমরা পতঙ্গভুক্ (Insectivorous) নাম দিতে পার।

গাছের ঘুম

না ঘুমাইলে কোনো জন্তু-জানোয়ারই বাঁচে না। তাই মানুষ এবং অন্য প্রাণীরা ঘুমায় এবং ইহাতে শরীরে বল পায়। গাছপালাদের মধ্যে কতকগুলি এই-রকমে ঘুমায় শুনিলে তোমরা বোধ হয় অবাক্ হইবে,—কিন্তু সত্যই তাহারা ঘুমায়। আমরা ঘুমাইবার সময়ে নাক ডাকাই, ফোঁস্ফাঁস্ করিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলি, আরো কত কি করি। খোকাখুকীরা ঘুমের আগে ও পরে ভয়ানক চীৎকার করিয়া কান্নাই সুরু করিয়া দেয়। গাছরা নিতান্ত নিরীহ, কুড়ুল দিয়া গোড়া কাটিয়া ফেলিলেও কোনো আপত্তি করে না। তাই ঘুমের সময়ে তাহাদের কোনো উৎপাত দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আগে অনেক গাছেরই বহু-ফলক পাতা জোড় বাঁধিয়া মড়ার মতো হইয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? ইহাই গাছের ঘুম। সূর্য্যাস্তের সময়ে তেঁতুল, লজ্জাবতী, আমলকী, শিরীষ প্রভৃতি গাছগুলির দিকে একবার তাকাইয়ো; দেখিবে, ইহারা সকলেই পাতা বুঁজাইয়া ঘুমাইতেছে। তারপরে সকাল বেলায় সেই গাছগুলিকেই যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, পাতা খুলিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিয়াছে। গাছের চোখ নাই, নাক নাই,—আছে কেবল পাতা। তাই ইহারা

পাতা বুঁজাইয়া ঘুমায়। নাক-চোখ থাকিলে তাহারা হয়ত নাক ডাকাইত এবং চোখ বুঁজাইত।
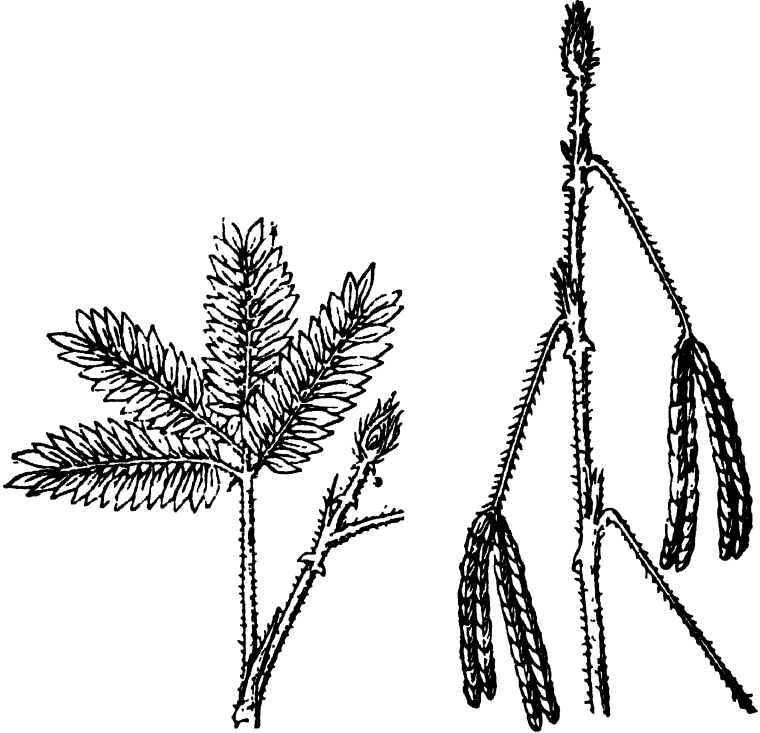
লজ্জাবতীর জাগ্রত পাতা ঘুমন্ত লজ্জাবতী

তোমাদের ছোটো ভাই-বোনগুলি রাত্রিতে যখন ঘুমায়, একবার আলো জ্বালিয়া তখন তাহাদিগকে দেখিয়ো; দেখিবে, তাহাদের মধ্যে কেহ বালিশে মুখ গুঁজিয়া, কেহ

মাথার বালিশটাকে পাশ-বালিশ করিয়া, কেহ বা বালিশ মাথায় না দিয়াই অকাতরে ঘুমাইতেছে। যদি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বাগানে বেড়াইতে বাহির হও, তাহা হইলে নানা গাছকে তোমরা নানা ভাবে ঘুমাইতে দেখিবে। লজ্জাবতী পাতা বুঁজাইয়া যে-রকমে ঘুমায়, শিরীষ গাছ ঘুমাইবার সময়ে সে-রকমে পাতা বুঁজায় না। তেঁতুল গাছ যে-রকমে পাতা বুঁজায়, কৃষ্ণচূড়া গাছ সে-রকমে বুঁজায় না। প্রত্যেকেরই ঘুমের রীতি যেন পৃথক্। তোমরা বিকালে বাগানে গিয়া পরীক্ষা করিলেও গাছদের নানা রকমের পাতা বোঁজানো দেখিতে পাইবে। বেলা চারি পাঁচটার সময় হইতেই অনেক গাছ পাতা বুঁজাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করে।

ঘুমের সময় শিরীষের বহু-ফলক পাতা ঝুলিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রক অর্থাৎ ছোট পাতাগুলি তাহাদের পিঠ বাহিরে রাখিয়া জুড়িয়া যায়। লজ্জাবতীর পাতাতেও তোমরা তাহাই দেখিতে পাইবে। আমরুলের পাতার ঘুমাইবার পদ্ধতি অন্য রকম। ঘুমাইবার সময়ে ইহার বোঁটা ঝুলিয়া পড়ে না, কেবল পাতাই জোড় বাঁধে। তোমরা আমলকী, কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছেও ইহা দেখিতে পাইবে। হাত জোড় করিলে হাতের আকৃতি যেমনটি হয় পাতাগুলির বোঁজার ভঙ্গী কতকটা সেই রকমেরই। তোমরা জোড়া পাতাগুলিকে কখনই মাটির সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিতে দেখিবে না। যাহাতে রাত্রির ঠাণ্ডা ও শিশিরের

জল পাতার গায়ে বেশি না লাগে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা।

ঘুম পাইলে আমরা বিছানায় শুইয়া পড়ি এবং কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া থাকি। তার পরে কখন্ ঘুম আসে, জানিতেও পারি না। গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরাও ঘুম পাইলে শুইয়া পড়ে। তার পরে চোখ বুঁজাইয়া ঘুমায়। বুদ্ধি আছে বলিয়াই প্রাণীরা এত আয়োজন করিয়া ঘুমায়। গাছদের বুদ্ধি নাই, তবুও তাহারা কেমন করিয়া পাতা বুঁজাইয়া ঘুমায়, সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা যদি শিরীষ বা লজ্জাবতীর পাতা ও পত্রকের বোঁটার নীচের দিক্‌টা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সেখানে যেন এক একটা ঢিবির মত অংশ রহিয়াছে। ইহাকে বৃন্ত-গ্রন্থি (Pulvinus) বলা হয়। এই গ্রন্থির বিশেষ একটা গুণ আছে। ইহার উপর এবং নীচের অংশ শরীরের ভিতরকার রসে একই ভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না। তাই যখন আলো, তাপ বা অন্য কোনো প্রকারের উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন বৃন্ত-গ্রন্থির উপর ও নীচেকার পিঠ সমানভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইতে পায় না। এই কারণে বৃন্তগ্রন্থির ভিতরকার রসের চাপে পাতাগুলি কখনো খাড়া হইয়া দাঁড়ায় এবং কখনো জোড় বাঁধিয়া নীচে নামিয়া পড়ে। লজ্জাবতী লতার উঠা-নামা ব্যাপার লইয়া আমাদের দেশের মহাপণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

তোমরা বড় হইয়া যখন তাঁহার পুস্তকগুলি পড়িবে, তখন সে-সব কথা জানিতে পারিবে। মাটির তলার রস শিকড় দিয়া কি-রকমে পঞ্চাশ ষাট হাত উঁচু গাছের পাতার শিরায় পৌঁছে, তাহা এ-পর্য্যন্ত ভালো করিয়া জানা যায় নাই। পিচ্‌কারির হাতল ঠেলিলে তাহার চাপে পিচ্‌কারীর জল ফিন্‌কি দিয়া বাহির হয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, গাছের শিকড়রা সেই-রকম একটা চাপ (Root pressure) পায় এবং তাহাতেই মাটির রস নলিকা দিয়া উপরে উঠে। কিন্তু সে চাপটা যে কি এবং কোথা হইতে আসে, তাহা ভাল বুঝা যায় না। লজ্জাবতীর পাতার উঠা-নামা পরীক্ষা করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গাছের রস কি-রকমে উপরে উঠে, তাহা বুঝাইয়াছেন।

গাছপালারা স্বভাবতঃ যে-সব কাজ করে, খোঁজ করিলে দেখা যায় সেগুলির একটিও তাহারা বৃথা করে না। যে সবুজ রঙ্‌ গায়ে মাখিয়া গাছরা সমস্ত জীবন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দেয়, তাহা আমাদের চোখ জুড়াইবার জন্য নহে। সবুজ রঙ্‌ দিয়া নিজেদের খাবার প্রস্তুত হয় বলিয়াই উহারা তাহা পাতার কোষে কোষে সঞ্চয় করিয়া রাখে। রঙিন ফুল ফুটাইয়া ও গন্ধ ছড়াইয়া গাছরা যখন প্রজাপতি ও মৌমাছির দলকে কাছে ডাকিয়া আনে, তখনো তাহার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং গাছদের পাতা বুঁজাইয়া ঘুমাইবারও তলায় একটা উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যটা যে কি, তাহা বড় বড় বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ

বলেন, ছোটো পাতাওয়ালা গাছগুলি যদি দিনের বেলার মতো রাত্রিতেও পাতা মেলিয়া থাকিত, তাহা হইলে উহাদের দেহের তাপ রাত্রির ঠাণ্ডায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইত। শীত লাগিলে আমরা যেমন হাত পা গুটাইয়া শরীরের তাপ রক্ষা করি, ঐ-সব গাছ ঠিক সেই-রকমে পাতা গুটাইয়া দেহকে গরম রাখে। সুতরাং বলিতে হয়, আমরা যেমন দেহকে বিশ্রাম দিবার জন্য ঘুমাই, গাছপালারা কেবল তাহারই জন্য ঘুমায় না। তোমাদের পোষা কুকুরটি শরীর গরম রাখিবার জন্য শীতকালে যেমন পা গুটাইয়া কুঁক্‌ড়াইয়া শুইয়া থাকে, পাতাগুলি সেই রকম গরম থাকিবার জন্যই রাত্রিতে গুটাইয়া যায়।

কুঁড়ি

বসন্ত কালে অনেক গাছেরই ডালে ডালে গাঁটে গাঁটে কুঁড়ি গজাইয়া উঠে এবং তার পরে কয়েক দিনের মধ্যে সেই সব কুঁড়িই নূতন ডাল নূতন পাতা হইয়া দাঁড়ায়,—ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কিন্তু কুঁড়ির ভিতরকার অবস্থা বোধ হয় তোমরা জানো না। সেই কথাই বলিব।

তোমরা গাছের মোটা ডালের জায়গায় জায়গায় যে-সব কুঁড়ি দেখিতে পাও, সেগুলিরই ভিতরে ভবিষ্যতের পাতা ও ডাল লুকানো থাকে। কাঁটাল বা বট গাছের ডাল হইতে একটা কুঁড়ি ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহার ভিতরে ছোটো পাতা এবং ডালের অঙ্কুর সত্যই লুকানো আছে। অন্য গাছের কুঁড়িতেও তোমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাইবে। যাহাকে আমরা বাঁধা-কপি বলি, তাহা কপি গাছের একটা মস্ত বড় কুঁড়ি। তোমাদের বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন বাঁধা-কপি কুটা হইবে, তখন তাহা লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, তাহার ভিতরে গুঁড়ি আছে এবং গুঁড়ির গায়ে কচি পাতা সাজানো আছে।

শিশু সন্তানকে মা কত যত্নে পালন করেন, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যে-রৌদ্রে আমাদের কষ্ট হয়,

না, শিশুরা তাহাতেই কাতর হইয়া পড়ে। যে-ঠাণ্ডায় তোমাদের সর্দ্দি লাগে না, শিশুরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অসুখে পড়ে। তাই মা তাহাদের অনেক যত্নে রাখেন ; শিশু সন্তান মায়ের যত্নেরই সামগ্রী। ভবিষ্যতের যে কত আশা-ভরসা ছোটো শিশুগুলির উপরে থাকে, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। কুঁড়িগুলি হইতে ডাল, পাতা এবং ক্রমে ফুল ফল উৎপন্ন হয়,—তাই সেগুলিও গাছের অতি-যত্নের সামগ্রী।

গাছের পাতা দিয়া যে কত জল রৌদ্রের তাপে বাষ্প হইয়া যায়, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। কুঁড়ি হইতে সেই পরিমাণে জল বাহির হইলে সেগুলি শুকাইয়া যায় না কি? তাই কুঁড়ির ভিতরকার কচি পাতা চুলের মতো ঘন শুঁয়ো দিয়া ঢাকা থাকে। এগুলি পাতার অঙ্কুরকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখে যে, বাহিরের তাপ হঠাৎ তাহার গায়ে লাগে না। তোমরা ফুল গাছের অঙ্কুর বা তাহার খুব কচি পাতা পরীক্ষা করিলে লোমের মতো ঘন শুঁয়ো দেখিতে পাইবে। মহুয়া গাছের কুঁড়িতেও ঐ-রকম ঘন লোম দেখা যায়।

অশথ, বট, কাঁটাল, কদম প্রভৃতি গাছের কুঁড়ি পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, পাতার অঙ্কুরকে রক্ষা করিবার জন্য এ-গুলিতে অন্য ব্যবস্থা আছে। ইহাদের কুঁড়ির ভিতরকার পাতা এক-একটি থলির মতো উপপত্রে ঢাকা থাকে। আসল পাতা গজাইয়া বাহিরে আসিলে তাঁহা আপনিই খসিয়া পড়ে। কুঁড়ির

ভিতরকার পাতা যাহাতে রৌদ্রের তাপে বা রাত্রির ঠাণ্ডায় নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। বাঁশের কুঁড়িকেও তোমরা বাদামী রঙের এক রকম পাতায় ঢাকা দেখিতে পাইবে। এ-গুলিকে শল্কপত্র (Scale leaves) নাম দেওয়া হয়। কচি কুঁড়ির ভিতরকার পাতা ও নরম বাঁশকে রক্ষা করাই এ-গুলির কাজ। বাঁশ শক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা সেগুলিকে উহার গায়েই লাগিয়া থাকিতে দেখিবে। যাহাতে পোকা-মাকড়ে উৎপাত করিতে না পারে, তাহার জন্য তোমরা সে-গুলির গায়ে, লম্বা লম্বা শুঁয়ো লাগানো দেখিতে পাইবে।

গুঁড়ি বা বড় ডালের যেখান-সেখান হইতে কুঁড়ি বাহির হয় না। তোমরা যে-কোনো গাছ পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ডালের যেখানটিতে পাতা লাগানো আছে, ঠিক্ তাহারি কোল হইতে কুঁড়ি বাহির হইতেছে। এমন গাছ অনেক আছে, যাহাতে পুরানো পাতা নাই, কিন্তু কুঁড়ি আছে। তোমরা যদি ভালো করিয়া লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, প্রত্যেক কুঁড়ির নীচে এক একটি ঝরা পাতার চিহ্ন রহিয়াছে। পাতার বোঁটার ঠিক্ উপর হইতে কুঁড়ি বাহির হওয়াই অব্যর্থ নিয়ম। সুতরাং ডালে যে-রকমে পাতা সাজানো থাকে, প্রায়ই কুঁড়িগুলিকেও ঠিক সেই রকমে সাজানো দেখা যায়। তার পরে সেই সব কুঁড়ি হইতে যে নূতন ডাল বাহির হয়, সেগুলিও পাতার মতো ছন্দ রাখিয়া গাছে থাকে। কদম গাছের পাতা ঠিক্ আকন্দের পাতার

মতো বিপরীত ভাবে সাজানো থাকে। তোমরা যদি একটি কদমের চারা গাছ পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তাহার কুঁড়ি ও ডাল গুঁড়ি হইতে ঠিক বিপরীত ভাবেই বাহির হইতেছে।

আম গাছের পত্র-বিন্যাস ২/৫ এর ছন্দে থাকে। অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক পাতাটির সহিত উপর বা নীচের পঞ্চম পাতার মিল দেখা যায়। ইহার কুঁড়ি ও ডাল ঠিক এই নিয়ম রক্ষা করিয়াই বাহির হয়। কিন্তু নানা কারণে কোনো কুঁড়ি মরিয়া যায় বা কোনো ডাল নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই, আম গাছের ছোটো ডালগুলিকে প্রায়ই ২/৫ এর ছন্দে সাজানো দেখা যায় না। কিন্তু গোড়ায় ইহারা ছন্দ রক্ষা করিয়াই চলে।

গুঁড়ি বা ডাল হইতেই যে কেবল কুঁড়ি বাহির হয়, তাহা নয়। ডালের ডগাতেও কুঁড়ি দেখা যায়। পাতার গোড়াকার কুঁড়িতে যেমন নূতন ডালের সৃষ্টি করে, এ-রকম কুঁড়িতে তাহা করে না। এগুলি পুষ্ট হইয়া ডালকে লম্বা করে। আম কাঁটাল প্রভৃতি যে-কোনো গাছের ডালের আগা পরীক্ষা করিয়ো; তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে।

পাথরকুচি ও কয়েকজাতীয় পাতাবাহার গাছের পাতার কিনারাতেই কুঁড়ি দেখা যায়। পাথরকুচির পাতা হয়ত তোমাদের বাড়ীর কাছে অনেক আছে। তোমরা এই গাছের একটা পাতা কয়েকদিন ভিজা মাটিতে চাপা দিয়া রাখিয়ো;

দেখিবে, পাতার কিনারার কুঁড়ি হইতে এক-একটা নূতন গাছ বাহির হইতেছে।

অশথ, বট, আম, গাব, মহুয়া প্রভৃতি গাছের পাতাগুলি যখন কুঁড়ি হইতে টাট্‌কা বাহির হয়, তখন তাহাদের রঙ্‌ সবুজ না হইয়া লাল্‌চে থাকে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? সবুজের মাঝে কচি লাল পাতাগুলিকে বড়ই সুন্দর দেখায়। মনে হয়, কে যেন অন্য গাছের লাল পাতা আনিয়া সবুজ পাতার মধ্যে লাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এই রঙ্‌ বেশি দিন থাকে না। একটু বড় হইলেই পাতাগুলির রঙ্‌ সবুজ হইয়া যায়।

কচি পাতার রঙ্‌ লাল হওয়াতে কি উপকার হয়, সে-সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা গিয়াছে, তামার মতো রঙ্‌ লাগানো থাকে বলিয়াই রৌদ্রের প্রচণ্ড আলো ও তাপ কচিপাতার অনিষ্ট করিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখ, গাছের পাতার যে রকম-রকম রঙ্‌ দেখা যায়, তাহারো একটা উদ্দেশ্য আছে।

কুঁড়ি সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদিগকে বলা হইল। কুঁড়ির ভিতরে পাতার অঙ্কুরগুলি কি-রকমে জড়ানো থাকে, এখন সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

বাগানের কলাগাছ ঝড়ে পড়িয়া গেলে, তাহা কাটিয়া-কুটিয়া ছেলেবেলায় যে কত খেলা করিয়াছি, তাহা আজো

মনে আছে। কলার খোলার নৌকা তৈয়ারি করিয়া জলে ভাসাইয়াছি ; তাহার মাঝ পাতাটি কি-রকমে মোড়া আছে মোড়ক খুলিয়া দেখিয়াছি। মাঝ পাতাটাই কলা গাছের পাতার কুঁড়ি। কি-রকমে ইহা জড়ানো থাকে, তোমরা দেখ নাই কি ? একটা লম্বা কাগজকে চোঙের মতো করিয়া জড়াইলে যে-রকম হয়, কলাপাতা ঠিক্ সেই-রকমেই জড়ানো থাকে। সর্ব্বজয়া ও বাঁশের কুঁড়িতেও তোমরা পাতাগুলিকে ঠিক্ এই রকমেই জড়ানো দেখিবে।

কাঁটাল, বট, অশথ, পদ্ম, কচু প্রভৃতি গাছের কুঁড়িতে পাতাগুলিকে আবার অন্য রকমে জড়ানো দেখা যায়। একখানা লম্বা কাগজকে একই সময়ে দুই ধার হইতে দুইটি চোঙের মতো করিয়া জড়াইলে তাহার যে অবস্থা হয়, কুঁড়িতে পাতাগুলি ঠিক সেই অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ পাতার বামের ও ডাইনের অর্দ্ধেক পৃথক্ ভাবে পাক খাইয়া মধ্য-শিরার কাছে আসিয়া জমা হয়।

করবী গাছের পাতা জড়াইবার ভঙ্গী উহারি উল্টা। এই পাতার দুই অর্দ্ধেক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাক খাইয়া মধ্য-শিরার ভিতরের দিকে মিলিত না হইয়া পাতার পিঠের দিকে মিলিত হয়। । করবী গাছ যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। কুঁড়ির ভিতরকার একটা খুব কচি পাতা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো ; তাহাকে ঠিকু এই রকমেই জড়াইয়া থাকিতে দেখিবে।

তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের পাতা জড়াইবার ভঙ্গী আবার আর এক রকমের। কাগজের বা চন্দন কাঠের পাখা কি-রকমে গুটাইয়া রাখা যায় তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ঐ-সব গাছের লম্বা লম্বা পাতাগুলিকে কতকটা সেই রকমেই গুটানো দেখা যায়।

শাখা-প্রশাখা

অনেক পশুরই চারিখানা পা, দুইটা চোখ, দুইটা কান এবং একটা লেজ থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐ-সব পশুর আকৃতি আমাদের চোখে সমান বলিয়া বোধ হয় কি? কখনই হয় না। আমরা একবার দেখিলেই বলিয়া দিতে পারি, পশুদের মধ্যে কোন্‌টি ছাগল এবং কোন্‌টিই বা শিয়াল। সুতরাং বলিতে হয়, চারিখানা পা, দুইটা চোখ, দুইটা কান ইত্যাদি ছাড়া পশুদের আকৃতিতে আরো এমন কিছু আছে, যাহা দেখিলে তাহাদের প্রত্যেককে চিনিয়া লইতে পারা যায়। গাছদের মধ্যেও ঠিক্ এই রকমটিই দেখা যায়। ডাল, পাতা, গুঁড়ি প্রায় সকল গাছেরই থাকে, কিন্তু সকলের আকৃতি এক নয়। তোমাদের খেলার মাঠের ও-ধারে যে-সব গাছ দেখা যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি বট কোন্‌টি ঝাউ এবং কোন্‌টিই বা শিমূল, তাহা তোমরা দূর হইতে বলিয়া দিতে পার না কি? বটগাছের চেহারা কখনই শিমূলের চেহারার সহিত মিলে না এবং আম-গাছের চেহারাতে ঝাউ গাছের চেহারার একটুও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, পাতার কাছে এবং গুঁড়ির আগায় যে-সব কুঁড়ি হয়, তাহাই নূতন ডালের সৃষ্টি করিয়া গাছগুলিকে বাড়াইয়া তোলে। ঝাউ প্রভৃতি গাছে গুঁড়ির গায়ের কুঁড়ির চেয়ে গুঁড়ির মাথার উপরকার কুঁড়িই বেশি জোরালো হয়। কাজেই, ইহাতে গাছ পাশে না বাড়িয়া কেবল উঁচুতেই বাড়িয়া উঠে। তাই ঝাউ গাছের আশ-পাশের ডাল জোরালো হয় না। কেবল ঝাউ নয়,—পাহাড়ে জায়গার পাইন ও দেবদারু গাছেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

কিন্তু আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছে এ-রকমটি হয় না। এই সব গাছের মাথার কুঁড়িগুলি কেবল কয়েক বৎসর ধরিয়া গুঁড়িগুলিকে লম্বা করে, কিন্তু পরে সেগুলি দুর্ব্বল হইয়া শুকাইয়া ঝরিতে সুরু করে। কাজেই, তখন গুঁড়ির গা হইতে বা গাছের মাথার পাশ হইতে যে-সব কুঁড়ি গজায়, সেইগুলিই জোরালো হইয়া পড়ে। ইহাতে গাছের আশে-পাশে লম্বা-লম্বা ডাল বাহির হয় এবং গাছটি ক্রমে ঝাঁকড়া হইয়া দাঁড়ায়। এই সব গাছে তোমরা প্রায়ই পাঁচ ছয় হাতের উপরে আর সোজা গুঁড়ি দেখিতে পাইবে না। তাই গাছের উপরকার অংশে কোন্‌টি গাছের মূল-গুড়ি এবং কোন্‌টিই বা ডাল, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে।

তোমরা, নেবু, পেয়ারা, আম প্রভৃতি যে-কোনো গাছের তলায় দাঁড়াইয়া তাহাদের গুঁড়িগুলিকে পরীক্ষা করিয়ো ;

দেখিবে, কোনো গাছের গুঁড়িই ঝাউ বা তাল গাছের মতো সোজা হইয়া উঠে নাই,—গুঁড়িগুলির যেন ঢেউ-খেলানো চেহারা আছে। ডগার কুঁড়ি হইতে ডাল বাহির না হইয়া পাশ হইতে বাহির হয় বলিয়াই এই রকম আকৃতি। এই ঢেউ-খেলানো আকৃতি গাছের চেহারার একটি বিশেষ ভঙ্গী।
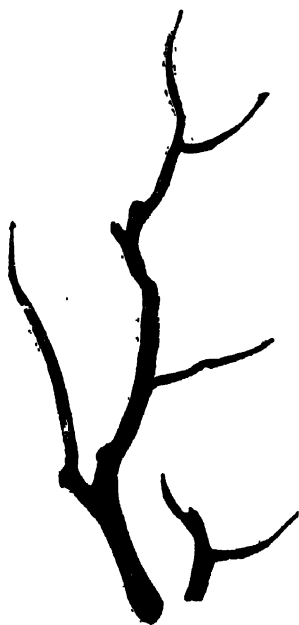
গুঁড়ির সাধারণ আকৃতি

দূর হইতে বট গাছ-গুলিকে কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ,—মনে হয় তাহাদের ডাল ও পাতাগুলিকে কে যেন কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া সুডৌল করিয়া রাখিয়াছে। বটের ডাল প্রায়ই মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বাহির হয়। একটা ডাল আকাশের দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই রকম আর একটা ডাল মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রায়ই বট গাছে দেখা যায় না। এইজন্যই বটগাছকে এমন সুন্দর দেখায়।

কাঁটা ও আঁক্‌ড়ি

গাছের ডালে কাঁটা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। তোমরা বোধ হয় মনে কর, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি যেমন গাছের নানা অঙ্গ,—কাঁটাগুলিও বুঝি তাই। কিন্তু তাহা নয়। পণ্ডিতরা বলেন, পাতা, ডাল এবং উপপত্র প্রভৃতি বিকৃত হইয়াই কাঁটার সৃষ্টি করে।

গাছের ডালে যে-সব কাঁটা সাজানো থাকে, তোমরা সেগুলিকে বোধ হয় ভালো করিয়া দেখ নাই। আজই বাগানে গিয়া প্রথমে নেবু গাছের কাঁটা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহার ডালের অনেক পাতারই কাছ হইতে এক একটি কাঁটা বাহির হইয়াছে। কাঁটা বাহির হইবার ইহাই এক রকম রীতি। তোমরা বেল এবং বৈঁচি গাছেও এই রীতি দেখিতে পাইবে। বেলের দুই-দুইটি কাঁটা পাতার বোঁটার উপর হইতেই বাহির হয়। বৈঁচি গাছে যে এক-একটি করিয়া কাঁটা থাকে, সেগুলিকেও পাতার কোলে কোলে বাহির হইতে দেখা যায়। গাছের ডাল, পাতার কোল ছাড়া অন্য কোনো জায়গা হইতে প্রায়ই বাহির হয় না। এখানে কাঁটাগুলি ঠিক্ সেই রকমেই বাহির হইতেছে না কি? ইহা দেখিয়া পণ্ডিতরা বলেন, নেবু, বেল, বৈঁচি প্রভৃতির কাঁটা ডালেরই রূপান্তর। হাজার হাজার বৎসর আগে হয়ত এই সব

গাছের ডালের কুঁড়ি কোনো কারণে বদ্‌লাইয়া কাঁটা হইয়াছিল। তার পরে সেই পরিবর্ত্তনটি স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। করঞ্চা ও বাব্‌লা গাছের কাঁটা পরীক্ষা করিয়ো ; সেখানেও ডালই কাঁটায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতেপারিবে।

কুল গাছের কাঁটার বিন্যাস আবার অন্য রকম। ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, প্রায় প্রত্যেক পাতার বোঁটার দুই পাশ হইতে দুইটা করিয়া কাঁটা বাহির হইয়াছে। এগুলি যে জায়গায় থাকে, সেখান হইতে ডালেব কুঁড়ি বাহির হয় না। কাজেই, কুলের কাঁটা ডালের বিকৃতি নয়। পণ্ডিতরা ঠিক্ করিয়াছেন উহা উপপত্রেরই বিকৃতি। অর্থাৎ কোনো এক-কালে কুলের পাতার উপপত্র ছিল, তাহাই এখন কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁটা-নটের পাতার দুই দিকে দুইটি করিয়া ধারালো কাঁটা থাকে, তাহাও উপপত্রের বিকৃতি।

যাহার পাতা কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ-রকম গাছও অনেক আছে। ফণী মন্‌সা বা মনসা সিজ গাছ তোমরা দেখ নাই কি ? ইহাদের পাতা হয় না। পাতাগুলিই বিকৃত হইয়া কাঁটা হইয়া দাঁড়ায়। তাই কাঁটার ঠিক্ কোল হইতে ফুল হয় এবং ডালের অঙ্কুর বাহির হয়। কয়েকজাতীয় লেবু গাছেও ইহা দেখা যায়। এই-সব গাছে যেখানে পাতা নাই বা ঝরা-পাতার দাগ নাই সেখানেও এক-একটা কাঁটা থাকে। সুতরাং বলিতে হয়, এগুলি পাতারই বিকৃতি।

গোলাপ গাছের কাঁটা তোমরা ভালো করিয়া দেখিয়াছ

কি না জানি না। এই-সব গাছের কাঁটা পাতার কোলে বাহির হয় না। সুতরাং এগুলি ডালের বিকৃতি নয়। ছোটো কাঁটা মাত্রেই ডালের বিকৃতি নয়। এগুলির সহিত ডালের ভিতরকার কাঠের যোগ থাকে না—গাছের ছালেই ইহাদের উৎপত্তি।

যে-সব কাঁটা ডালের কাঠ হইতে জন্মায় এবং যাহাদের গায়ে ডালের মতো ছাল লাগানো থাকে, সেগুলিই ডালের রূপান্তর। তাই বেল ও নেবুর কাঁটাকে আমরা ডালেরই বিকৃতি বলিয়াছি। এই কথাটি মনে করিয়া কোন্ কাঁটা ডাল হইতে এবং কোন্ কাঁটা পাতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তোমরা ঠিক্ করিয়ো।

যাহা হউক, কাঁটা থাকে বলিয়া অনেক গাছ শত্রুর হাত হইতে মুক্তি পায়। আমরা পুলিশ ডাকিয়া, পাহারা বসাইয়া বা বন্দুক ছুঁড়িয়া চোর-ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার পাই। অন্য প্রাণীরা শিঙ্ দিয়া খোঁচাইয়া, নখ দিয়া আঁচড়াইয়া এবং ধারালো দাঁত দিয়া কামড়াইয়া আক্রমণকারীদের সহিত লড়াই করে। যাহাদের শিঙ্, নখ বা দাঁত নাই, ভগবান্ তাহাদের দৌড়াইবার এমন শক্তি দিয়াছেন যে, কোনো প্রবল শত্রু ছুটিয়া গিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। গাছরা বড় নিঃসহায়, ইহাদের বুদ্ধি নাই, শিঙ্ নাই, দাঁত নাই, দৌড়াইবার শক্তিও নাই। তাই ইহাদের কতকগুলির গায়ে কাঁটা লাগাইয়া ভগবান্ শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করেন।

লতা গাছের আঁকড়ি একটা অদ্ভুত জিনিস। লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, শশা প্রভৃতি গাছের ডাল হইতে যে আঁকড়ি বাহির হয়, সেগুলি ইস্‌ক্রুপের পাকে কাছের জিনিসকে এমন শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরে যে, আঁক্ড়ি ছিঁড়িয়া গেলেও বাঁধন ছিঁড়ে না। যাহাতে ঝড় বা বাতাসে লতাগুলি নষ্ট না হয়, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা।

যাহা হউক, ডাল ও পাতা বিকৃত হইয়া যেমন কাঁটার সৃষ্টি করে, সেই রকমে আঁকড়িরও সৃষ্টি করে। মটর গাছের আঁকড়ি পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, সেগুলি তাহার বহু-ফলক পাতার মেরুদণ্ডের দুই পাশে পত্রকের মতোই বাহির হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহার শেষের দুইটি পত্রক বিকৃত হইয়া আঁকড়ির সৃষ্টি করে।

তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সাধারণতঃ লাউ, কাঁকুড়, তরমুজ, পটোল প্রভৃতি গাছে একটা করিয়া আঁকড়ি নাই ; এগুলিতে একটা মূল আঁকড়ি তিন চারিটি শাখায় ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে বলেন, পাতার শিরাগুলিই বিকৃত হইয়া এই রকম বহু আঁকড়ির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, সেগুলি পাতারই বিকৃতি। যাহাদের ডাল বিকৃত হইয়া আঁকড়ির সৃষ্টি করিয়াছে, এ-রকম গাছও অনেক আছে।

ফুল

জবা, পলাশ ও শিমূল ফুল লাল। টগর, চামেলি, জুঁই, মল্লিকা, মালতী দ্রোণ এবং গন্ধরাজের ফুল শাদা। অতসী, কুমড়া, শশা, ঝিঙে এবং কল্‌কে ফুলের রঙ্‌ হল্‌দে। অপরাজিতার ফুল প্রায় নীল। তার পরে আরো কত ফুলে যে কত রকম-রকম রঙ্‌ থাকে, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। ফুল, গাছের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কেহই ফুলকে অনাদর করে না। ফুল দেখিবামাত্রই শিশুরা তাহা লইবার জন্য হাত বাড়ায়। ভালো ফুল পাইলেই বৃদ্ধেরা সেগুলিকে দেবতার উদ্দেশে দান করেন।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, মানুষকে আনন্দ দিবার জন্যই ফুলের সৃষ্টি, কিন্তু তাহা নয়।

ষাট্‌ সত্তর আশী বা একশত বৎসরের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়। কেবল মানুষ নয়, কুকুর, শিয়াল, ঘোড়া, বাঘ, সাপ, পাখী সকলেই কিছু কাল বাঁচিয়া মরিয়া যায়। গাছদের অবস্থাও তাই,—তাহারাও মরে। মানুষ ও পশুপক্ষীদের যে-সব সন্তান জন্মে তাহারাই বড় হইয়া বংশের ধারা রক্ষা করে। কিন্তু প্রাণীদের মতো গাছের সন্তান জন্মে না। ফলের বীজ হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহাই উহাদের বংশ রক্ষা করে।

মনে কর, আশী বা নব্বুই বৎসর ধরিয়া কোনো আম গাছে আম ফলিল না এবং বীজের অভাবে একটিও নূতন গাছ জন্মিল না। পুরানো আম গাছগুলি মরিয়া গেলে এই অবস্থায় তাহাদের বংশলোপ হইবে না কি? তখন সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তোমরা একটি আম গাছ দেখিতে পাইবে না।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ফল ও বীজ উৎপন্ন করিয়া বংশরক্ষার জন্যই গাছরা এমন সুন্দর ফুলের উৎপত্তি করে। মানুষের প্রয়োজন বা আনন্দের দিকে তাহারা একটুও তাকায় না।

ফুল হইতে যাহাতে সহজে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, তাহার এমন সুব্যবস্থা ফুলে আছে যে, সে-সব কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। আমরা একে একে সেগুলির কথা তোমাদিগকে বলিব।

জবা, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া, সোঁদাল প্রভৃতি সাধারণ ফুল পরীক্ষা করিলে, তোমরা তাহাতে সুস্পষ্ট দুইটি পৃথক্ থাক্ দেখিতে পাইবে। গোড়ায় দেখা যায়, স্তবকাকারে সাজানো সবুজ পাতার মতো একটি থাক্ এবং তাহারি উপরে থাকে রঙিন্ পাপড়ির দল। ফুলের সব তলার এই সবুজ পাতাগুলির নাম কুণ্ড। কুণ্ড (Calyx) কথাটা নূতন, কিন্তু যাহাকে কুণ্ড বলিতেছি, তাহা তোমরা সকলেই জানো। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, তখন এই কুণ্ড অর্থাৎ সবুজ

আবরণটাই ভিতরকার কোমল পাপড়িগুলিকে ঢাকিয়া রৌদ্র ও হিমের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। তার পরে ফুল ফুটিলেই তাহা ফুলের তলায় থাকিয়া যায়। রঙিন্ পাপড়ির থাক্‌কে বলা হয় পুষ্পমুকুট (Corolla)। ফুলের মাথার উপরে নানা রঙের দলগুলি মুকুটের মতোই দেখায়।

কুণ্ড ও মুকুটকে ফুলের বাহিরের আবরণ বলা হয়। বাস্তবিকই ফুলের এই দুইটি অঙ্গ ফল জন্মাইবার বিশেষ সাহায্য করে না। গরু, ছাগল, ভেড়া, পাখী প্রভৃতির গায়ের লোম বা পালক যেমন বাহিরের বস্তু, এগুলিও তাই। আসল ফুলটিকে নিরাপদ রাখিবার জন্যই কুণ্ড ও মুকুট ফুলে লাগানো থাকে। ফুলের আসল অঙ্গ থাকে তাহার ঠিক মধ্যস্থলে। তোমরা ফুলের কেশর নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব কেশর ও তাহার নীচেকার অংশই আসল ফুল।

কৃষ্ণচূড়া ফুল বারো মাসই পাওয়া যায়। হয়ত তোমাদের বাগানেই এই ফুল আছে। ইহা পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, কয়েকটি লম্বা লাল কেশর চক্রাকারে ফুলের উপরে সাজানো আছে। এগুলিকে পিতৃকেশর (Stamens) বলা হয়।

তার পরে যদি আরো ভালো করিয়া পরীক্ষা কর, তবে প্রত্যেক কেশরের মাথায় এক একটা দানা জোড়া আছে, দেখিতে পাইবে। ইহার নাম পরাগস্থালী (Anther)। এগুলি যেন এক-একটি বাক্স। আমরা যাহাকে পরাগ

(Pollens) বা ফুলের রেণু বলি, তাহা এই-সব পরাগ-স্থালীতে ভর্ত্তি করা থাকে।

কৃষ্ণচূড়ার পরাগ-স্থালী একখানা আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে— কোষের দুই পাশ যেন চিরিয়া গিয়াছে। তোমরা এই চিরের ফাঁক দিয়া ভিতরকার পরাগও দেখিতে পাইবে।

সব ফুলেরই পিতৃকেশর এবং পরাগ-স্থালী যে কৃষ্ণচূড়া ফুলেরই মতো, তাহা নয়। তোমরা যদি কালকসিন্দা বা বক ফুলের কেশর পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, কৃষ্ণচূড়ার কেশরের মতো সেগুলি খাড়া না হইয়া বাঁকিয়া আছে। তা'ছাড়া ইহাদের পরাগস্থালীও কৃষ্ণচূড়ার মতো নয়। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।
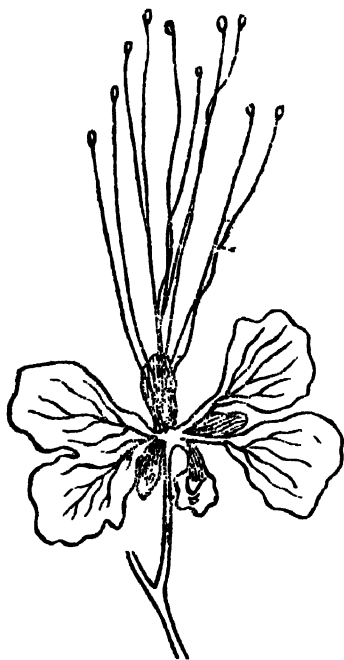
কৃষ্ণচূড়া ফুল

এখন কৃষ্ণচূড়া ফুলের ঠিক্ মাঝখানটি পরীক্ষা কর। দেখিতে অসুবিধা হইলে, ইহার কুণ্ড, মুকুট এবং পিতৃকেশর অতি সাবধানে ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ফুলের

ঠিক্ মাঝে সবুজ রঙের একটি লম্বা জিনিস রহিয়াছে এবং তাহারি মাথায় একটি লম্বা শুঁয়ো লাগানো আছে। ইহাকে মাতৃকেশর (Pistil) বলা হয় এবং মাথার লম্বা শুঁয়োটিকে দণ্ড (Style) নাম দেওয়া হয়। কৃষ্ণচূড়ার পিতৃকেশর অনেকগুলি থাকে, কিন্তু মাতৃকেশর একটির বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন মাতৃকেশরের যে সূতোর মতো অংশকে দণ্ড বলিলাম, তাহার আগাটি পরীক্ষা কর। দেখিবে, পিতৃকেশরের আগায় যেমন পরাগ-স্থালী আছে, এখানে তাহার নাম-গন্ধ নাই,—আছে কেবল একটা চ্যাপ্টা মতো অংশ। ফুলের মাতৃ-কেশরের ডগার এই অংশটিকে মুণ্ড (Stigma) বলা হয়।

এবারে মাতৃকেশরের নীচেকার সেই সবুজ জিনিসটি পরীক্ষা কর। যদি ছুরির ডগা বা আল্পিন্ দিয়া সাবধানে চিরিয়া ফেলিতে পার, তবে দেখিবে, ইহা নিরেট্ জিনিস নয়,—ভিতরটায় বেশ ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে অনেক-গুলি সবুজ রঙের খুব ছোটো বীজ সাজানো আছে। মাতৃ-কেশরের নীচেকার ঐ ফাঁপা অংশটির নাম বীজাধার (Ovary) এবং তাহার ভিতরকার সেই ছোটো বীজগুলিকে বলা হয় বীজাণু (Ovules)। এই বীজাধারই পরে ফল হইয়া দাঁড়ায় এবং ঐ বীজাণুগুলিই হইয়া পড়ে বীজ।

সুতরাং দেখা গেল, মাতৃকেশরের তিনটি অংশ আছে; গোড়ায় বীজাধার, তাহার উপরে দণ্ড এবং সকলের উপরে মুণ্ড।

কৃষ্ণচূড়া ফুল পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখা গেল, অন্য অনেক ফুলেই তোমরা ঐ-সব অংশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

এখানে একটা যে-কোনো ফুলের ছবি দিলাম। কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতোই ইহার গোড়ায় রহিয়াছে কুণ্ড, তার উপরে মুকুট, তার পরে পরাগস্থালী-ওয়ালা পিতৃকেশর। সকলের উপরে আছে, কলসীর আকারের বীজাধার ও তাহার মুণ্ড।

সম্পূর্ণ ফুল

অধিকাংশ গাছের ফুলেই ঐ কয়েকটি প্রধান অংশ দেখা যায়। কিন্তু এমন ফুলও অনেক আছে, যাহাতে এগুলির প্রত্যেকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও কোন্‌টি কোন্ অংশ তাহা শীঘ্র বুঝা যায় না। এখানে তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। চই, পিঁপুল এবং পাণ গাছ পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের ফুলে কুণ্ড এবং মুকুট নাই। টোপা পানার ফুলেও ঐ-সকল অংশ দেখা যায় না। কতক গাছে আবার কুণ্ড ও মুকুটের দুইটি পৃথক্ থাকের বদলে একটি থাক্ লইয়া ফুল ফুটিয়া উঠে। বেথুয়া শাক, পুঁই শাক, পালং শাক, ক্ষুদে নুনি, সিদ্ধি, গাঁজা, তুঁত এবং কয়েক জাতি শেওড়া গাছে তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে।
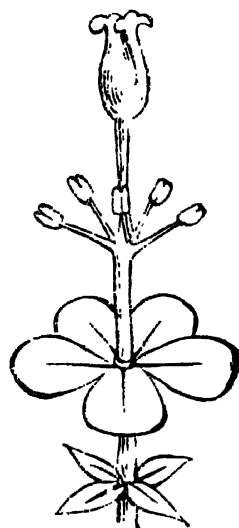
যখন এ-সব গাছে ফুল ধরিবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো ; দেখিবে, কয়েকটি পাতার মতো সবুজ অংশ লইয়াই ইহাদের ফুল। মনসা সিজ, কৃষ্ণকলি, পদ্ম প্রভৃতির ফুলে কেবল মুকুটই আছে—কুণ্ড নাই। লাল-পাতা, শাদা-পাতা এবং গোলাপী-পাতা প্রভৃতি পাতা-বাহার বিদেশী গাছের মঞ্জরীপত্রই (Bracts) রঙিন্ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের ফুলের বাহার একটুও নাই। এই মঞ্জরীপত্রই গাছগুলিকে যেন আলো করিয়া রাখে। ইহাদের ফুল সবুজে ও হল্‌দেতে মিশানো একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস।

ফুলে ফল-ধরা

ফুলে ফল-ধরা আশ্চর্য্য ব্যাপার। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, ফুল হইলেই তাহাতে ফল ধরে,—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু যে-প্রক্রিয়ায় ফুলে ফল ধরে, তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। পিতৃকেশরের পরাগ মাতৃকেশরের উপরকার মুণ্ডে আসিয়া না ঠেকিলে, কোনো ফুলেই ফল হয় না।

তোমরা যদি কোনো গাছের আধ-ফোটা ফুলের কুঁড়ি হইতে পিতৃকেশরগুলি সাবধানে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাও এবং তার পরে ফুলটিকে পাত্‌লা কাগজের ঠোঙা দিয়া ঢাকিয়া রাখ, তবে দেখিবে, ফুল ফুটিবে, পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িবে, কিন্তু সে-ফুলে কখনই ফল হইবে না। পিতৃ-কেশরের পরাগ মাতৃকেশরের মুণ্ডে লাগিতে পারে না বলিয়াই, ইহা ঘটে।

পিতৃকেশর ও মাতৃকেশর অনেক ফুলেই একত্র থাকে।

কিন্তু যাহাতে কেবল পিতৃকেশর বা কেবল মাতৃকেশর রহিয়াছে এ-রকম ফুলও অনেক আছে। কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শশা, বেগুন, উচ্ছে, তেলাকুচা ধোঁধল, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, এই সব গাছ এবং তাহাদের ফুল ও ফল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের মধ্যে তুই-একটি গাছ হয়ত তোমরা তোমাদের বাড়ীর উঠানের মাচাতেই দেখিতে পাইবে। কুমড়ার গাছে বড় বড় হল্‌দে ফুল ফুটিতেছে এবং শশা ও ঝিঙের গাছ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, অথচ একটিও ফল ধরিতেছে না, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। কুমড়া গাছে এ-রকম ফুল ফুটিলে লোকে তাহা ছিড়িয়া ভাজিয়া খায়। তাহারা জানে এ-সব ফুলে ফল ধরে না। তাই ফুলগুলিকে নষ্ট করে। এই সব ফুলে কেবল পিতৃকেশর থাকে। বড় বড় বীজাধার-ওয়ালা কুমড়ার ফুলগুলিকেই লোকে যত্ন করে, তাহাতেই ফল ধরে। এগুলিতে কেবল মাতৃকেশরই দেখা যায়।

কুমড়ার পিতৃফুল

যাহা হউক যে-সকল ফুলে কেবল পিতৃকেশর থাকে তাহাকে পিতৃফুল (Staminate) বলা হয় এবং যে-সকল

ফুলে কেবল মাতৃকেশরই থাকে তাহাকে মাতৃফুল (Pistilate) নাম দেওয়া হয়।

কেবল যে তরিতরকারির গাছেই পিতৃফুল মাতৃফুল পৃথক্ হইয়া ফুটে তাহা নহে। ওল, কচু প্রভৃতি অনেক গাছের ফুলের মঞ্জরীতে ঐ-রকম পৃথক্ ফুল দেখা যায়। তা'ছাড়া তুঁত, আমলকী, নারিকেল, কাঁটাল, বট, অশথ, বেগুন, ডুমুর, বিছুটি, ভেরেণ্ডা, রাংচিত্তির, মুক্তাঝুরি এবং অনেক সিজের একই গাছে পিতৃ ও মাতৃফুল পৃথক্ হইয়া ফুটে। এই সব গাছে পিতৃফুলের পরাগ মাতৃফুলের মুণ্ডে আসিয়া না পড়িলে ফল ধরে না।
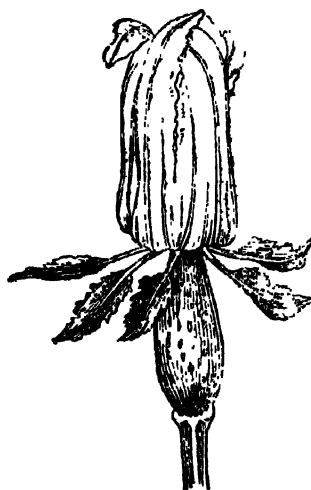
কুমড়ার মাতৃফুল

বাড়ীর বাগানে অনেকগুলি পেঁপে গাছ পোঁতা হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েকটি গাছে কেবল লম্বা লম্বা ফুলই ধরিতে লাগিল এবং বাকি কয়েকটি গাছে পেঁপে ধরিল। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। যে-সব পেঁপে গাছে কেবল ফুলই ধরে, অমঙ্গলের ভয়ে গৃহস্থেরা তাহা কাটিয়া ফেলে।

পেঁপে গাছের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। যাহার ফল হয় না সেই পেঁপে গাছগুলি পিতৃগাছ এবং

ফলযুক্ত গাছগুলি মাতৃগাছ। তোমরা পরক্ষা করিলে দেখিবে, পিতৃ-গাছে কেবল পিতৃকেশর-ওয়ালাই ফুল ধরিতেছে, তাহাতে মাতৃকেশরের চিহ্ন মাত্র নাই। মাতৃকেশরের নীচেই বীজাধার থাকে এবং তাহাই শেষে ফল হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, মাতৃকেশর না থাকায়, এই-সব গাছে ফল ধরে না।

এখানে পেঁপের মাতৃগাছের ও পিতৃগাছের ফুলের দুইটি ছবি দিলাম।

পেঁপের মাতৃগাছের ফুল   পেঁপের পিতৃগাছের ফুল

তোমরা মাতৃগাছের এই রকম একটি ফুল পরীক্ষা

করিয়ো; দেখিবে, তাহার নীচে ছবিটিরই মতো প্রকাণ্ড বীজাধার আছে। তাই এই গাছে ফল ধরে।

পেঁপের পিতৃগাছের ফুলেরও একটা ছবি দেওয়া হইল। পিতৃগাছ হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, এই ফুলে কেবল পিতৃকেশর আছে এবং তাহার মাথায় পরাগ-স্থালী আছে,—কিন্তু বীজাধার মোটেই নাই। তাই পিতৃগাছে ফল ধরে না।

কেবল পেঁপে গাছদের মধ্যেই যে পিতৃগাছ ও মাতৃগাছ আছে, তাহা নয়। তালগাছেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। যে-সব তালগাছে তাল না ধরিয়া কেবল জটার মতো লম্বা লম্বা ফুলের মঞ্জরীই ধরে, সেগুলি পিতৃগাছ। তা'ছাড়া হ্যাতাল, সিদ্ধি, গাঁজা, পিটালি, পটোল প্রভৃতি গাছেও পিতৃগাছ ও মাতৃগাছ পৃথক্ দেখা যায়। পিতৃগাছের ফুলের পরাগ, মাতৃগাছের ফুলে আসিয়া না পড়িলে মাতৃ-গাছে ফল হয় না।

একই গাছে পিতৃফুল এবং মাতৃফুল ফুটিতেছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তাহার উদাহরণও তোমাদিগকে অনেক দিলাম। কিন্তু একই গাছে পিতৃফুল, মাতৃফুল, এবং পিতৃকেশর ও মাতৃকেশরওয়ালা সম্পূর্ণ ফুল ফুটিতেছে ইহা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। এই তিন রকম ফুলওয়ালা গাছও আছে। তোমরা নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য কর নাই। আমাদের জানাশুনা গাছে ইহা প্রায়ই দেখা যায় না।

ধোপারা যে ভেলা-ফলের রস দিয়া কাপড়ে চিহ্ন দেয়, ইহা বোধ হয় তোমরা জানো। এই রসের দাগ কাপড় হইতে সহজে উঠে না। ভেলার গাছ ছোটনাগপুর অঞ্চলে হয়। পিতৃফুল, মাতৃফুল এবং সম্পূর্ণ ফুল ইহারি এক গাছে ফুটিতে দেখা যায়।

পুষ্পবিন্যাস

গাছের এক জায়গায় যখন অনেক ফুল কাছাকাছি থাকিয়া ফুটিয়া উঠে, তখন সেগুলিকে এক-একটা বিশেষ ভঙ্গীতে সাজানো দেখা যায়। ডালে পাতাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে, তাহা তোমরা আগেই দেখিয়াছ। গাছে ফুলের বিন্যাসও অতি-সুন্দর। তোমরা সূতা লইয়া মালা গাঁথিতে গেলে, ফুলগুলিকে সূতায় পরাইতে কত এলোমেলো কর। কিন্তু গাছে ফুল সাজানোতে একটুও এলোমেলো নাই।

ফুলের প্রথম নিয়মই হইতেছে এই যে, সেগুলি গাছের যে-কোনো অংশ হইতে বাহির হয় না। তোমরা বোধ হয় তাহা লক্ষ্য কর নাই। ডালের কুঁড়ি যেমন পাতার গোড়া হইতে বা পুরানো ডালের মাথা হইতে বাহির হয়, ফুলের কুঁড়িও ঠিক সেই রকমেই বাহির হয়। তোমাদের বাগানে যত ফুল আছে, তাহা আজই পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, এ-গুলির প্রত্যেকটি পাতার ঠিক্ কোল হইতে বা ঝরা-পাতার

দাগের কাছ হইতে বাহির হইয়াছে, অথবা ডালের ডগা হইতে গজাইয়া উঠিতেছে। যখন গাছের এই সব অংশ হইতে একটার বেশি ফুল বাহির না হয়, তখন তাহাকে একক ফুল বলা হয়। জবা, গোলাপ প্রভৃতি গাছে কেবল একক ফুলই ফোটে। তুলসীর গাছ ও তাহার ফুল সকলেই দেখিয়াছ। তোমাদের বাড়ীর আঙিনাতেই হয়ত তুলসী গাছ আছে। যে-একটা লম্বা দণ্ডের উপরে তুলসীর ফুল সাজানো থাকে, তাহাকে পুষ্পদণ্ড বলে এবং ফুলসমেত সমস্ত জিনিসটাকে বলে পুষ্প-মঞ্জরী।

মঞ্জরী যে কেবল তুলসী গাছেই আছে, তাহা নয়। হাতীশুঁড়া, কৃষ্ণচূড়া, গোয়ালঘসে বা দণ্ডকলস প্রভৃতি অনেক গাছেরই ফুল মঞ্জরীর আকারে সাজানো দেখা যায়। তাল, নারিকেল, ধান, গম এবং যবের গাছেও তোমরা মঞ্জরী দেখিতে পাইবে।

যাহার লম্বা পুষ্পদণ্ড মাথায় ফুলের কুঁড়ি লইয়া হঠাৎ মাটি হইতে বাহির হইয়া পড়ে, এ-রকম গাছ তোমরা দেখ নাই কি? পদ্ম, ভুঁইচাঁপা প্রভৃতি গাছে তোমরা এই রকম পুষ্পদণ্ড দেখিতে পাইবে। মাটি হইতে উঠে বলিয়া ইহাকে ভৌমপুষ্পদণ্ড (Scape) নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসে সরিষার ফুল আমাদের গ্রামের মাঠ-গুলিকে যেন আলো করিয়া রাখে! তোমরা সরিষার মঞ্জরী পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহার লম্বা বোঁটা-ওয়ালা

ফুল-ঝাড়

ফুলগুলি দণ্ডের চারিপাশে সুন্দর করিয়া সাজানো আছে। এই রকম মঞ্জরীকে ফুল-ঝাড় (Receme) বলা হয়।

তোমরা একটু খোঁজ করিলে এই রকম মঞ্জরী-ওয়ালা অনেক গাছ বাহির করিতে পারিবে। এই-সব মঞ্জরীতে যে ফুল থাকে তাহা এক সঙ্গে ফোটে না। ইহার ফুলফোটা গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আগায় গিয়া শেষ হয়। তাই লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যখন নীচেকার ফুলে ফল ধরিয়াছে, তখন দণ্ডের উপরকার অংশে হয়ত নূতন কুঁড়ি গজাইতেছে।

ফুল-ছড়ি

তোমরা ফুল-ছড়ি দেখ নাই কি? বিবাহের শোভা-যাত্রায়, ইহা অনেক দেখা যায়। রঙিন্ কাগজ-মোড়া বাঁশের গায়ে কতকগুলি রঙ্-বেরঙের কাগজের ফুল আঠা দিয়া জোড়া থাকে। ইহাই ফুল-ছড়ি। খোঁজ করিলে তোমরা ফুল-ছড়ির মতো মঞ্জরীও অনেক গাছে দেখিতে পাইবে। ফুল-ছড়ির আকারের মঞ্জরীতে (Spikes) যে-সব ফুল জন্মে তাহাদের বোঁটা থাকে না। চিড়্‌চিড়ে বা অপাং গাছের ফুল এবং

কলাগাছের মোচাতে তোমরা ফুলছড়ির মঞ্জরী দেখিতে পাইবে। অতসী, গম, জুয়ার এবং ঘাসের মঞ্জরীকে ফুল-ছড়ি বলা যাইতে পারে।

তাল, কচু প্রভৃতি কতকগুলি গাছের মঞ্জরী আবার অন্য রকম। ইহাদের পুষ্পদণ্ড বেশ মোটা। এই দণ্ডে বোঁটাহীন শত শত ফুল সাজানো থাকে এবং সমস্ত মঞ্জরী একটা আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণটির নামও মঞ্জরীপত্র (Spathe) বলা যাইতে পারে। কোনো কোনো কচুর মঞ্জরী-পত্রের ভিতর দিকটা কেমন সুন্দর লাল, তাহা তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। যাহাকে আমরা মোচার খোলা বলি, তাহাও এক রকম মঞ্জরী-পত্র।

যাহা হউক, ফুলের যে-সব মঞ্জরীর মোটা পুষ্পদণ্ডে ফুলগুলি একটু গভীরভাবে বসানো থাকে, তাহাকে তাল-মঞ্জরী (Spadix) নাম দেওয়া হয়। এগুলির গড়ন কতকটা তালের মঞ্জরীর মত বলিয়াই এই নাম দেওয়া হইল।

কচু ফুল

নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি গাছের ফুল হয়ত তোমরা অনেক দেখিয়াছ। ইহাদের ফুলগুলিও মঞ্জরীর আকারে সাজানো থাকে।

তাল-মঞ্জরীর দণ্ড যেমন মোটা এবং তাহার গোড়ায় যেমন মঞ্জরীপত্র থাকে, এগুলিতেও তাহাই দেখা যায়। তাই এই-সব মঞ্জরীকেও তালমঞ্জরী বলা যাইতে পারে ; ইহার মোটা পুষ্পদণ্ড হইতে যে-সব শাখা বাহির হয়, তাহারি উপরে ফুলগুলি সুন্দরভাবে সাজানো থাকে।

হুড়্‌হুড়ে, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছের মঞ্জরীর আকৃতি আবার আর এক রকমের। এই মঞ্জরীর পুষ্পদণ্ডে যে-সব ফুল লাগানো থাকে তাহাদের বোঁটা সমান লম্বা হয় না। নীচের দিক্ হইতে ফুলের বোঁটা ক্রমে ছোটো হইতে হইতে উপরে উঠে। কাজেই, ফুলগুলিকে মঞ্জরীতে যেন এক রেখায় থাকিতে দেখা যায়। এই মঞ্জরীকে "সমশিখ" (Corymb) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

পুষ্পদণ্ডের একই জায়গা হইতে যখন লম্বা বোঁটা-ওয়ালা অনেক ফুল বাহির হয়, তখন সেই মঞ্জরীকে ছত্রমঞ্জরী (Umbel) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। তোমরা ধনিয়া জোয়ান, মৌরী, প্রভৃতি গাছের মঞ্জরীতে ইহাই দেখিতে পাইবে।
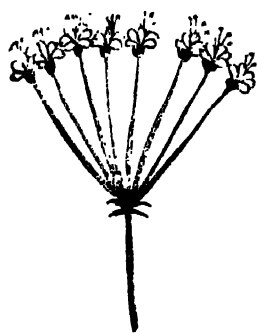
ছত্রমঞ্জরী

আম, জাম, লিচু, ঘেঁটু ইত্যাদি ফুলেরও মঞ্জরী হয় তোমরা সুবিধা-মতো এগুলি পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, এই-সব মঞ্জরীর সহিত পূর্ব্বেকার কোনো মঞ্জরীর ঠিক

মিল নাই। ছত্র-মঞ্জরীর সঙ্গেই কেবল কতকটা মিল ধরা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যদণ্ডে কোনো ফুল থাকে না। ফুল থাকে কেবল শাখা-দণ্ডে। এইজন্য এগুলিকে শাখায়িত মঞ্জরী (Pericle) নাম দেওয়া যাইতে পারে।
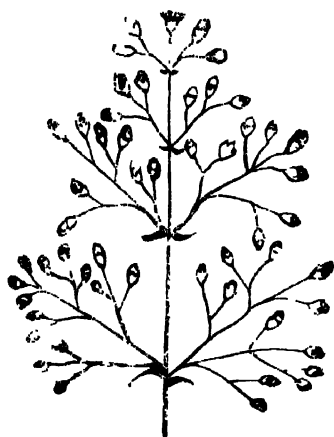
শাখায়িত মঞ্জরী

সূর্য্যমুখী, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল তোমরা অনেক দেখিয়াছ। জবা বা গোলাপ যেমন একটা পৃথক্ ফুল, একটি গাঁদা বা সূর্য্যমুখী ফুলকে সে-রকম পৃথক্ ফুল বলা চলে না। এই ফুলের একটিতে শত শত ছোট ফুল সাজানো থাকে। পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, এই রকম ফুলকে ছিঁড়িলে তাহা অনেক ছোটো ছোটো ফুলে ভাগ হইয়া যায়। এইগুলিই প্রকৃত ফুল।

সূর্য্যমুখী ফুলকে ভাঙিয়া ফেলিলে যে-রকম দেখায়, এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। ছবিতে
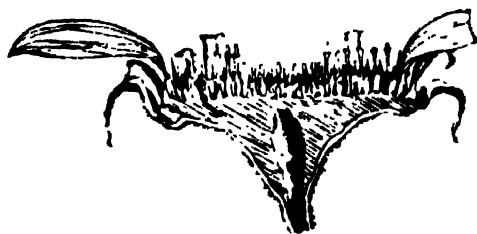
সূর্য্যমুখী ফুল

যে-সব গোটা-গোটা অংশ দেখিতেছ, সেই-গুলিই সূর্য্যমুখীর আসল ফুল। আমরা যাহাকে সূর্য্যমুখী ফুল বলি, তাহা ঐ-রকম অনেক ফুলের সমষ্টি। সুতরাং একটা সূর্য্যমুখী বা গাঁদা ফুলকে মঞ্জরীই বলিতে হয়। এই-সব গাছে সমস্ত ফুল দণ্ডের উপরে জড় হইয়া থাকে বলিয়া, ইহাদের মঞ্জরীকে মুণ্ডী (Capitus) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা প্রভৃতি ফুলের নীচে যে সবুজ অংশ দেখা যায় তোমরা তাহাকে হয়ত ফুলের কুণ্ড মনে করিতেছ। কিন্তু উহা কুণ্ড নয়। উহাকে পুষ্পাধার (Torus) বলা হয়। অনেক সাধারণ পাতা বা মঞ্জরীপত্র (Bract) জোট্ বাঁধিয়া পুষ্পাধারের সৃষ্টি করে এবং তাহারি উপরে সেই ছোটো ফুলগুলি সাজানো থাকে। মুণ্ডী-মঞ্জরীর এই রকম এক-একটা ছোটো ফুলকে পুষ্পক (Floret) বলা হয়। তোমরা কুকুর-শোঁকা, সোমরাজ, হিঞ্চে, ভৃঙ্গরাজ, চন্দ্রমল্লিকা, নাগদোনা, কুসুম প্রভৃতি নানা গাছে মুণ্ডী-মঞ্জরী দেখিতে পাইবে। এই রকম ফুলকে বহুপুষ্পক (Compound flower) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

এ-পর্য্যন্ত যে ফুল-বিন্যাসের কথা বলিলাম, তাহাকে কেন্দ্রোন্মুখ (Centripetal) রীতি বলা হয়। তোমরা পরীক্ষা করিলেই দেখিবে, এই নিয়মে সাজানো মঞ্জরীর আগাতে কুঁড়ি এবং গোড়ায় ফোটা ফুল রহিয়াছে। অর্থাৎ ফুলগুলি নীচের দিক হইতে ফুটিতে ফুটিতে উপর দিকে চলিতেছে। কেবল ইহাই

নয়, যখন কোনো মঞ্জরীর নীচেকার ফুল ফুটিতেছে, তখন সেই মঞ্জরীরই ডগা বাড়িয়া নূতন নূতন কুঁড়ি উৎপন্ন করিতেছে, তোমরা তাহাও এই সব মঞ্জরীতে দেখিতে পাইবে। একটি আমের মঞ্জরী লইয়া পরীক্ষা করিলে, ইহা সুস্পষ্ট তোমাদের নজরে পড়িবে। কাজেই বলিতে হয়, এই মঞ্জরী-গুলির বৃদ্ধির সীমা নাই,—অর্থাৎ কতগুলি ফুল ফুটিবে তাহা কুঁড়ি গুণিয়া যেমন অন্য গাছে বলা যায়, এ-সব গাছে তাহা বলা যায় না। এই জন্য এই সকল ফুলের মঞ্জরীকে অনিশ্চিত (Indeterminate) মঞ্জরীও বলা হয়।

রঙন্ ফুলের মঞ্জরী বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। তোমাদের বাগানে যদি এই ফুল থাকে, তাহা হইলে আজই উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাতে অনেক শাখা-দণ্ড আছে এবং প্রত্যেক দণ্ডে তিন-তিনটি করিয়া ফুল সাজানো রহিয়াছে। মঞ্জরীর ঠিক্ মাঝের শাখাতেও তিনটি ফুল আছে। এ যেন তিনেরি ছন্দ। কিন্তু এই ফুলগুলি কখনই এক সঙ্গে ফোটে না। গুচ্ছের ঠিক্ মাঝে তিনটি ফুলের মধ্য-ফুলটি ফোটে সকলের আগে। তার পরে চক্রাকারে বাহিরের ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে।

তাহা হইলে দেখ, পূর্ব্বের নানাপ্রকার মঞ্জরীতে যেভাবে ফুল ফোটে, ইহার ফুল-ফোটা যেন তাহারি বিপরীত। সেগুলির ফুল ফোটে নীচে হইতে উপরের দিকে, রঙনের ফুল ফোটে মাঝ হইতে বাহির দিকে। এইজন্য রঙন্ ফুলের গুচ্ছকে কেন্দ্র-বিমুখ

(Centrifugal) মঞ্জরী বলা হয়। আম, সরিষা, তাল প্রভৃতির মঞ্জরীর মতো রঙনের মঞ্জরীর ডগা বাড়ে না, বা তাহাতে নূতন কুঁড়ি উৎপন্ন হয় না। এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে সসীম (Determinate) মঞ্জরীও বলিয়া থাকেন।

কেন্দ্রবিমুখ বা সসীম মঞ্জরী যে কেবল রঙন্ গাছেই আছে, তাহা নয়। গোয়ালঘসে ও তুলসীর মঞ্জরীতেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। এই সব মঞ্জরীর ফুল উপর হইতে ফুটিতে ফুটিতে নীচের দিকে নামে।

হাতী-শুঁড়ো গাছের ফুল হয়ত তোমরা দেখিয়াছ। ইহার ছোটো গাছগুলিকে বাগানের স্যাঁতা জায়গায় জঙ্গলের

হাতী-শুঁড়োর মঞ্জরী

আকারে দেখিতে পাইবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার শাদা শাদা ছোটো ফুল ফোটে। ফুলের মঞ্জরীগুলিকে হাতীর শুঁড়ের আকারে জড়ানো দেখা যায় বলিয়া ইহাকে হাতী-শুঁড়ো

গাছ বলে। তোমরা ইহার একটি মঞ্জরী ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, শুঁড়ের তলার দিকে ফুল নাই এবং কুঁড়িও নাই।

যাহা হউক, হাতী-শুঁড়োর মঞ্জরী একটা কিম্ভূত-কিমাকার জিনিস। ইহাকে কেন্দ্রবিমুখ মঞ্জরীর দলে ফেলিতে পারা যায়।

কুণ্ড

ফুলের তলায় যে সবুজ রঙের অংশ জোড়া থাকে তাহাকে কুণ্ড বলা হয়, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, তখন তাহার পাপ্‌ড়ি দেখা যায় না, —সেটির আগা-গোড়াই সবুজ বা রঙিন্ কুণ্ড দিয়া মোড়া থাকে। ইহাতেই রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতে কুঁড়ির ভিতরকার পাপ্‌ড়ি, কেশর এবং বীজাধার নষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ফুলের কুঁড়িকে রক্ষা করাই কুণ্ডের প্রধান কাজ। তাই ফুল ফুটিলেই অনেক গাছের কুণ্ড ঝরিয়া পড়ে। শেয়াল-কাঁটা আফিং এবং পপি ফুলে তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে।

আবার এ-রকমও দেখা যায় যে, ফুল হইতে ফল হইল এবং সে ফল পাকিল, তথাপি তাহার কুণ্ড ঝরিল না। পেয়ারা এবং দাড়িম ফুলের কুণ্ডকে এই রকমই দেখা যায়। পাকা পেয়ারার মাথায় যে গোলাকার বেড় থাকে, তাহা উহার কুণ্ড। দাড়িম ফলের মাথাতেও তোমরা ঐরকম কুণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

ফুল-অবস্থা হইতে ফল পাকা পর্য্যন্ত চাল্‌তার কুণ্ড ফলের গায়ে লাগানো থাকে। আমরা যে অংশ দিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাই, তাহাই উহার কুণ্ড। চাল্‌তার ফল থাকে ভিতরে। তাহা আঠার মতো জিনিসে এবং ছোটো ছোটো বীজে পূর্ণ

দেখা যায়। তোমরা নারিকেল, তাল, খেজুর, মটর, বেগুন, ধুতুরা, লঙ্কা, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির ফলেও স্থায়ী কুণ্ড দেখিতে পাইবে। ফল পাকিলেও এগুলি হঠাৎ খুলিয়া পড়ে না।

টেপারি ফল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কাগজের চেয়েও পাতলা এক রকম আবরণে এই ফল ঢাকা থাকে। এই আবরণটা টেপারির কুণ্ড। ফুল অবস্থায় ইহা বড় থাকে না। ফল যতই পুষ্ট হইতে থাকে, ঐ কুণ্ডও তাহারি সঙ্গে বড় হইতে আরম্ভ করে। সেগুণ এবং ঘেঁটুর ফলেও তোমরা ঐ-রকম বড় কুণ্ড দেখিতে পাইবে।

আমকুসির ফল তোমরা দেখ নাই কি? লোকে ইহাকে হিজ্‌লি বাদামও বলে। ইহার ফল অতি অদ্ভুত। বীজের মত একটা অংশ থাকে ফলের বাহিরে। এই বীজটাই আমকুসির ফল। যে নরম অংশকে আমরা খাই, তাহা ঐ ফলেরই বোঁটা। তোমরা পাছে ইহাকে কুণ্ড মনে কর, তাহারি জন্য এই কথাটি এখানে বলিলাম।

পানিফল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ এবং হয়ত অনেকে খাইয়াছ। গোটা ফলটি দেখিতে শিঙাড়ার মতো। ফলের কোণে তিনটা ধারালো শিঙ্ লাগানো থাকে। ফুলের কুণ্ডই পানিফলের শিঙের সৃষ্টি করে। দোপাটি ফুলের যুক্ত কুণ্ডে একটা নলের মত অংশ লাগানো থাকে।

এগুলি ছাড়া রকম-রকম ফুলে রকম-রকম কুণ্ড দেখা

যায়। নূতন ফুল দেখিলেই তোমরা তাহার কুণ্ড পরীক্ষা করিয়ো। তাহাতে হয়ত নূতন কিছু দেখিতে পাইবে। কৃষ্ণচূড়া ফুলের কুণ্ডের নীচেকার অংশ সবুজ ও উপরকার অংশ রঙিন্। সোনাল ও কালকসিন্দা ফুলের কুণ্ড ঘোর সবুজ নয়।

যে-সকল সবুজ অংশ লইয়া কুণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা সকল সময়েই গোটা-গোটা পাতার আকারে থাকে না। কুণ্ডের পাতাগুলি জোট্ বাঁধিয়া একটা বাটির মতো আকার পাইয়াছে, এ-রকম তোমরা অনেক গাছের ফুলেই দেখিতে পাইবে। আবার যাহাদের কুণ্ড-পত্র (Sepal) নীচেতে জোড়া এবং উপরে বিচ্ছিন্ন, এ-রকম ফুলও তোমাদের নজরে পড়িবে। জোড়া কুণ্ডকে সংকীর্ণ কুণ্ড (Gamosepalous) এবং বিচ্ছিন্ন কুণ্ডকে বিকীর্ণ কুণ্ড (Polysepalous) নাম দেওয়া যাইতে পারে। লেবুর ও আতার ফুলের তলায় তোমরা সংকীর্ণ কুণ্ড দেখিতে পাইবে। কিন্তু গোপাল ফুলে তাহা নাই : সেখানে কুণ্ড-পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকে, সুতরাং উহাকে বিকীর্ণ কুণ্ড বলিতে হয়।

আমরা আগেই বলিয়াছি, কুণ্ডের রঙ্ পাতার মতো সবুজ। কিন্তু সকল ফুলে তাহা দেখা যায় না। দাড়িম ফুলের কুণ্ডে সিঁদুরের মতো রঙ্ থাকে। সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া এবং চাঁপা ফুলের কুণ্ডেও সবুজ রঙ্ নাই।

জবা ফুল পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহাতে দুইটি কুণ্ডের

বেড় দেখিতে পাইবে। ফুলের ঠিক্ তলায় যেটি থাকে তাহাই প্রকৃত কুণ্ড। ইহার নীচে যে কুণ্ডটি থাকে তাহাকে উপকুণ্ড (**Epicalyx**) বলা হয়। পূর্ব্বে তোমাদিগকে যে মঞ্জরী-পত্রের কথা বলিয়াছি, উপকুণ্ড সেই রকমেরই একটা বস্তু। কাপাসের ফুলের নীচে তোমরা খুব বড় বড় তিনটি সবুজ পাতা দেখিতে পাইবে। ঐ গাছের সাধারণ পাতার সহিত সেগুলির মিল নাই। এগুলিকেও কাপাস ফুলের উপকুণ্ড বলা যাইতে পারে। যখন ফুল কুঁড়ির অবস্থায় থাকে, তখন এইগুলিই রৌদ্র ও ঠাণ্ডা হইতে কুঁড়িদের রক্ষা করে।

গোলাপ, জবা প্রভৃতির কুণ্ড যেমন ঠিক বর্ত্তুলাকারে ফুলের তলায় লাগানো থাকে, সব ফুলে কিন্তু তাহা দেখা যায় না। এলোমেলো ভাবে সাজানো কুণ্ড তোমরা খোঁজ করিলে অনেক ফুলেই দেখিতে পাইবে। তুলসীজাতীয় ফুলের কুণ্ড পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের কুণ্ড এক পাশে উঁচু এবং আর এক পাশে নীচু হইয়া আছে। তাহা ছাড়া ঠিক্ নলের মতো বা তেল-ঢালার ফনেলের মতোও কুণ্ড তোমরা কোনো কোনো ফুলে দেখিতে পাইবে।

পুষ্প-মুকুট

যে-সব রঙিন দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি মুকুটের মতো ফুলের উপরে সাজানো থাকে, তাহাকে আমরা পুষ্প-মুকুট (Corolla) নাম দিয়াছি। এখানে তাহারি সম্বন্ধে বিশেষ কথা তোমাদিগকে বলিব।

সকল গাছেরই ফুলের মুকুট রঙিন্ নয়। যাহার মুকুট সবুজ রঙের, এমন ছোটো ফুলও অনেক আছে।

ফুলের পাপ্‌ড়ি যে কত রকমে সাজানো থাকে, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। কোনো ফুলে পাপ্‌ড়িগুলিকে এক-থাকে, কোনো গাছে দুই-থাকে, কোনো গাছে তিন বা চারি থাকে ফুলের উপরে সাজানো দেখিতে পাইবে। পেয়ারার ফুল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহার পাপ্‌ড়ি এক থাকে সাজানো থাকে। আবার পদ্ম ফুলে সেগুলিকে বহু থাকে সাজানো দেখা যায়। তাই পদ্মের নাম শতদল।

পাপ্‌ড়ির সংখ্যাও নানা ফুলে নানা রকম হয়, তিনটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত পাপ্‌ড়ি প্রায় সকল সাধারণ ফুলেই থাকে। আতা, পেয়ারা, রঙন্, আম প্রভৃতি যে-কোনো গাছের ফুল পরীক্ষা করিলে, তোমরা পাপ্‌ড়ির সংখ্যা গুণিয়া দেখিতে পারিবে।

পদ্ম ও গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকে। এই রকম পাপ্‌ড়ি লইয়া যে ফুল হয়, তাহাকে বহুদল

(Polypetalous) ফুল বলা হয়। কিন্তু সকল ফুলের পাপ্‌ড়িই কি গোলাপের পাপ্‌ড়ির মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে ? তাহা নয়। পাপ্‌ড়ির তলাকার অংশ জোট্ বাঁধিয়া নলের মতো হইয়াছে এ-রকম মুকুটও অনেক ফুলে দেখা যায়। এই রকম ফুলকে যুক্ত-দল (Gamopetalous) বলা যাইতে পারে। রজনীগন্ধা, ধুতুরা, যুঁই, রঙ্গন, বেগুন,

তিলের ফুল
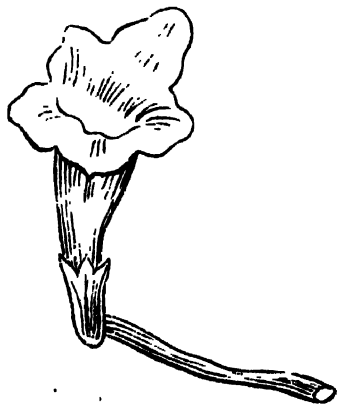
লঙ্কা, তিল, গোয়ালঘসে, আলু প্রভৃতির ফুলে তোমরা এই রকম মুকুট-ওয়ালা ফুল দেখিতে পাইবে।

মুকুটের দলগুলি আগাগোড়া জোড়া এবং দলের পৃথক্ চিহ্ন নাই, এ-রকম যুক্ত-দল মুকুটও কয়েক রকম ফুলে দেখা যায়। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি ? কলমি, রাঙা-আলু, তরুলতা, বিষতাড়ক প্রভৃতির ফুলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

কোনো কোনো ফুলের কুণ্ড একদিকে উঁচু এবং আর এক দিকে নীচু থাকে, ইহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। অনেক ফুলের বহুদল এবং যুক্তদল মুকুটও ঐ-রকমে টেরা-বাঁকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে অসমঞ্জস (Irregular) মুকুট

যাইতে পারে। শেয়াল-কাঁটা গোলক-চাঁপা, গোলাপ, শিউলি, লেবু-ফুলের মুকুট সুসমঞ্জস। কিন্তু দোপাটি, বক, তিল ফুলের মুকুট অসমঞ্জস। দোপাটি ফুলের কুণ্ডের কতক অংশ লম্বা হইয়া ফুলের তলায় একটি থলির সৃষ্টি করে। ইহা তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ। পিছনে এই রকম একটা অদ্ভুত থলি থাকায় দোপাটির ফুল অসমঞ্জস হইয়াছে।

দ্রোণ ফুল ছোটো। তোমরা আতসী কাচ দিয়া ইহার মুকুট পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহা অসমঞ্জস। এই ফুলের গাছ আমাদের দেশের সব জায়গায় আপনিই জন্মায়। ইহাকে কেহ দণ্ড-কলস, কেহ গোয়ালঘসে বলেন। আমাদের মুখের নীচেকার ওষ্ঠ যেমন মুখ হইতে একটু বাহির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, দ্রোণজাতীয় ফুলের মুকুটকে ঠিক সেই রকমটিই দেখা যায়। ইহার নীচের অংশকে সত্যই ওষ্ঠের মতো বলিয়া বোধ হয়। তোমরা তুলসীর ছোটো ছোটো ফুল পরীক্ষা করিলেও সেগুলিকে অসমঞ্জস দেখিতে পাইবে। এই সব ফুলের আকৃতি ঠিক হাঁ-করা মুখের মত বলিয়া, এগুলিকে ব্যাপ্ত-মুখ (Labiate) ফুল বলা যাইতে পারে।
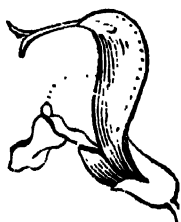
দ্রোণজাতীয় ফুল

সূর্য্যমুখীর ফুল বহু-পুষ্পকের সমষ্টি। ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এই ফুলের প্রান্ত হইতে কোনো একটি

পুষ্পক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, তাহার মুকুটও অসমঞ্জস। দেখিলেই মনে হয়, যেন মুকুটের একটা দিক জিভের মতো লম্বা হইয়া বাহির হইয়াছে। কেবল সূর্য্যমুখী নয়,—গাঁদা, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলের কিনারার দিকের প্রত্যেক পুষ্পকই অসমঞ্জস।

অসমঞ্জস ফুলের অভাব নাই,—পালিতামাদার অপরাজিতা, শণ, সীম, বনচাঁড়াল এবং কুঁচ গাছের ফুলে তোমরা ইহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। তা'ছাড়া তোমাদের বাগানে বা গ্রামের মাঠে যখন ছোলা, মটর, অরহর, মুগ বা কলাইয়ের গাছ হইবে, তখন তাহাদের ফুল পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের মুকুটও অসমঞ্জস।

এখানে একটি মটর ফুলের ছবি দিলাম। পাঁচ-পাঁচটি দল লইয়াই ইহাদের ফুল। এগুলির মধ্যে উপরের দলটি খুব বড়। তাহার পাশের দুইটি দল বাঁকানো রকমের। দেখিলেই এই দুটিকে পাখীর ডানার মতো বোধ হয়। তার পরে সাম্‌নে যে দু'টি দল থাকে, তাহা কোনো ফুলে জোড়া, কোনো ফুলে পৃথক্‌ও দেখা। এ দুটিও বেশ বাঁকানো, দেখিলে নৌকার খোলের কথা মনে পড়ে।

মটরফুলের পাপ্‌ড়ি

যাহা হউক, এই রকম পাঁচটি দল লইয়া যখন সীম, মটর, বক, পলাশ প্রভৃতি ফুল ফুটিবে তখন তাহাদের মুকুট পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের পাঁচটি দল মিলিয়া যেন এক

একটি ঘরের সৃষ্টি করিয়াছে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র লাগিয়া যাহাতে ফুলের ভিতরকার নরম অংশগুলি নষ্ট না হয়, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। জোরে বাতাস বহিলে অনেক সময়ে এই ফুলগুলি বাতাসের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাই ভিতরে বাতাস গিয়া পরাগ প্রভৃতিকে নষ্ট করিতে পারে না। এই সব ফুলের মুখ যেন এক-একটি খোলা দরজা এবং সম্মুখের দুইটি দল যেন একটি রোয়াক। আগে যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলেই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। যাহাতে প্রজাপতি ও মৌমাছিরা মধু খাইবার জন্য আসিলে রোয়াকে বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে এবং তার পরে দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা আছে। উপরের বড় দলটিকে পতাকা বলা যাইতে পারে। পতাকা মৌমাছিদের ডাকিয়া আনে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, প্রজাপতিদের ও মৌমাছিদের ডাকিয়া আনিবার জন্য ফুলে এত আয়োজন কেন? মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গেরা ফুলের অনেক উপকার করে। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

ফুলের অনেক রকম আকৃতির কথা তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু তবুও সব আকৃতির বিষয় বলা হইল না। তোমরা নানা রকম ফুল সংগ্রহ করিয়া আকৃতি পরীক্ষা করিয়ো। বহু-দল-মুকুটের চেহারা প্রায় সকল ফলেই এক রকম। চেহারার বিভিন্নতা যুক্তদল মুকুটেই বেশি দেখা যায়।

ধুতুরা, কলমি লতা, শাঁক আলু ইত্যাদি ফুলের আকৃতি কতকটা শানাই বাঁশির তলার মতো নয় কি ? আবার কুম্‌ড়ার ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মতো। বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি ফুলের মুকুটে খোলা-ছাতার শিকের মতো কতকগুলি শিরার চিহ্ন দেখা যায়। অন্য কোনো ফুলে এ-রকমটি প্রায়ই দেখা যায় না। আলকুসীর ফুল তোমরা দেখিয়াছ কি ? ইহার মুকুটের গোড়া সরু থাকে এবং আগার দিক্‌টা হঠাৎ মোটা হইয়া উপরদিকে ঠিক্ খাড়া হইয়া উঠে।

ফুলের নাম শুনিলেই তাহায় রঙিন্ পাপ্‌ড়ির মুকুটের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ফুলে পাপ্‌ড়ি নাই, এ-রকম গাছও অনেক আছে। তোমরা এ-রকম গাছ এবং তাহার ফুল দেখিয়াছ কি ? চাল মুর্গা, কাঁটা নটে, বেথুয়া, আপাং, চুকা পালং, ইশরমূল, পিঁপুল, পান, চন্দন প্রভৃতি গাছে যে-সব ফুল ফোটে, তাহাদের পাপ্‌ড়ি থাকে না। এই ফুলগুলি আকারে বড় হয় না,— তোমরা আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ইহাদের একটিতেও পাপ্‌ড়ি নাই।

ফুলের কুঁড়ির দলবিন্যাস

গাছের ডালে পাতাগুলি কি-রকমে সাজানো থাকে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ইহাতে বেশ একটা নিয়ম দেখা যায়। কোনো গাছে এলোমেলো ভাবে যেখানে-সেখানে

প্রত্যেক দলই একটু-একটু পিছাইয়া অপরের গায়ে লাগিয়াছে। এই রকম ব্যবস্থা থাকে বলিয়াই পাপ্‌ড়ির প্রান্তগুলিকে ইস্‌ক্রুপের আকারে থাকিতে দেখা যায়। নটকান্‌ ও জবার পাপ্‌ড়িতেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

এই সব ফুলের পাপ্‌ড়ি জোড়া নয়। তাই বাহিরের বাতাস পাপ্‌ড়ির ফাঁক দিয়া ভিতরে আসার ভয় থাকে। এই ভয় নিবারণের জন্যই পাপ্‌ড়িগুলির একটিকে আর একটির উপরে একটু চাপিয়া থাকিতে দেখা যায়।

জারুল ফুলের কুঁড়ির ভিতরে পাপ্‌ড়িগুলি কি-রকমে সাজানো থাকে তোমরা দেখিয়াছ কি? এই ফুলের পাপ্‌ড়ি-গুলি রেশমের কাপড়ের মতো পাত্‌লা। একখানি রেশমী রুমালকে হাতে মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিলে যে-রকমটি হয়, জারুল ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি ঠিক্‌ সেই রকমে ফুলের ভিতরে থাকে। ইহার পাপ্‌ড়ির বিন্যাসে কোনো নিয়মই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিয়াল কাঁটা ও আফিঙের ফুলেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। মটর, অরহর, বক প্রভৃতি ফুলের মাথায় পতাকা লাগানো থাকে। ইহাদের দলগুলিকেই তোমরা কুঁড়ির ভিতরে চাপাচাপিভাবে থাকিতে দেখিবে।

পিতৃকেশর

ফুলের দুইটি বাহিরের আবরণের কথা তোমাদিগকে একে একে বলিলাম। এখন তাহার ভিতরকার পিতৃকেশরের কথা তোমাদিগকে বলিব।

আমরা আগেই বলিয়াছি, মুকুটের পরেই ফুলে পিতৃকেশর সাজানো থাকে। কৃষ্ণচূড়া ফুল পরীক্ষার সময়ে তোমাদিগকে ইহার কথা বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া সকল ফুলেরই পিতৃকেশরকে কৃষ্ণচূড়ার পিতৃকেশরের মতো দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক জাতির গাছে পিতৃকেশরের গঠন ভিন্ন রকমের।

আফিংগাছের ফুল

তোমরা যখন কৃষ্ণচূড়া ফুল পরীক্ষা করিয়াছিলে, তখন তাহার পিতৃকেশরকে সরু সূতার মতো মোটা দেখিয়াছিলে। কিন্তু সকল ফুলেরই কেশর কি এই

রকম মোটা হয়? তাহা হয় না। খুব সরু কেশর-ওয়ালা ফুলও অনেক আছে। শেয়াল-কাঁটা, পপি প্রভৃতি ফুলের কেশর মোটা, কিন্তু ধানের ফুলের কেশর চুলের চেয়েও সরু। কত্‌বেল, নেবু প্রভৃতির ফুল তোমরা পরীক্ষা করিয়াছ কি? পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহাদের পিতৃকেশরগুলি যেন কতকটা চ্যাপ্‌টা। নাল ফুলের লম্বা লম্বা কেশরগুলিও ঐ রকমের। তোমাদের গ্রামের ডোবা বা খালে এই ফুল অনেক দেখিতে পাইবে।

নানা ফুলে পিতৃকেশরের সংখ্যাও নানা রকম দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে,—সর্ব্বজয়া ফুলে একটা, জুঁইফুলে, ছুইটা, গমের ফুলে তিনটা, রঙনে চারিটা, ধুতুরায় পাঁচটা, এবং ধানের ফুলে ছয়টা পিতৃকেশর আছে। পেয়ারা, শিরিষ, চাঁপা, পদ্ম, গোলাপ জাম, কেয়া ফুল, মনসা সিজের ফুলে যে কত পিতৃকেশর আছে, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না।
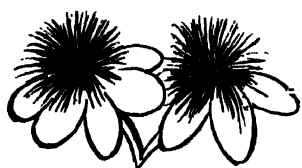
পেয়ারাফুলের পিতৃকেশর

যাহা হউক, কতকগুলি গাছের ফুলে পিতৃকেশর অনেক থাকিলেও, অধিকাংশ গাছেই ইহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। ফুলের পিতৃকেশরের সংখ্যা ঠিক্ করিবার একটি মজার নিয়ম আছে। অনেক ফুলেই এই নিয়মটি খাটে। তোমরা ইহা মনে করিয়া রাখিয়ো।

মনে কর, আমরা যেন পাঁচটি পাপ্‌ড়ি-ওয়ালা কোনো ফুল পরীক্ষা করিতেছি। তোমরা যদি ইহার পিতৃকেশর-গুলিকে গুণিয়া ফেল, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ ফুলে হয় পাঁচটি, না হয় দশটি বা পনেরোটি কেশর সাজানো আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, ফুলে যতগুলি পাপ্‌ড়ি থাকে তাহার কেশর গুণিলে প্রায়ই ততগুলি, কিংবা তাহার দ্বিগুণ, তিন গুণ কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে-সব ফুলের পাপ্‌ড়ি সম্পূর্ণ জোড়া থাকে, তাহাতে এ নিয়ম খাটে না।

আজই বাগান হইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া তোমরা এই নিয়মটির পরীক্ষা করিয়ো। বেগুন, লঙ্কা, আলু, রঙন্ প্রভৃতির ফুলে যতগুলি পাপ্‌ড়ি থাকে, ঠিক্ ততগুলিই কেশর দেখা যায়। রেঙ্গুন-ক্রিপার নামে লতা গাছ তোমরা দেখ নাই কি? ইহাতে নলের মতো মুকুটওয়ালা রঙিন ফুল থোলো থোলো ফোটে। ইংরাজিতে ইহাকে কুইস্‌কোয়ালিস্ বলে, আমরা বাংলায় বলি বসন্ত-মালতী। এই ফুলে পাপ্‌ড়ির সংখ্যার দ্বিগুণ পিতৃকেশর দেখিতে পাইবে। ইহাতে পাপ্‌ড়ির ফাঁকে ফাঁকে কেশরগুলিকে দুই থাকে অতি সুন্দর রকমে সাজানো দেখা যায়।

যে-সব ফুলের নাম করিলাম, তাহাদের সকলগুলির পাপ্‌ড়ি বিচ্ছিন্ন নয়,—মুকুটের খাঁজ গুণিয়া কতগুলি পাপ্‌ড়ি জুড়িয়া মুকুট তৈয়ারি হইয়াছে, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

কুকুরচিতা, তেজপাতা প্রভৃতি ফুলের কেশর চারি-থাকে সাজানো দেখা যায়। তোমরা যখন এই ফুল হাতের গোড়ায় পাইবে, পরীক্ষা করিয়ো।

তেঁতুলের ফুল খুব ছোটো। আতসী কাঁচ দিয়া ইহা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাতে পাঁচটি পাপ্‌ড়ি আছে, কিন্তু পিতৃকেশর তিনটির বেশি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এখানে পূর্ব্বের নিয়মের বুঝি অন্যথা হইল। কিন্তু তাহা নয়। ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে ইহাতে দুইটি শুঁয়োর আকারের জিনিস দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেগুলির মাথায় পরাগস্থালী খুঁজিয়া মিলিবে না। সুতরাং বলিতে হয়, তেঁতুল ফুলে যতগুলি পাপ্‌ড়ি থাকে, তাহার পিতৃকেশরও ততগুলি থাকে। সেগুলির মধ্যে কেবল দুইটি কেশর পরাগহীন। এই রকম পরাগহীন কেশরকে বন্ধ্যকেশর (Staminode) বলা হয়।

বন্ধ্যকেশর যে কেবল তেঁতুল ফুলেই থাকে, তাহা নয়। তোমরা অন্য ফুলে খোঁজ করিলেও ইহা দেখিতে পাইবে। একটি সর্ব্বজয়া ফুল লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; ইহাতে তিনটি লাল পাপ্‌ড়ি লাগানো দেখিবে। সুতরাং নিয়মানুসারে ইহাতে অন্ততঃ তিনটি পিতৃকেশর থাকারই কথা,—কিন্তু দেখা যায় কেবল একটি। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে ইহাতে দুইটি বন্ধ্যকেশর দেখিতে পাইবে।

সফেদা ফল তোমরা অনেকেই খাইয়াছ। এই গাছ অনেক দিন আগে আমেরিকা হইতে আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছিল। আজকালকার অনেক বাগানেই সফেদা গাছ আছে। ইহার ফুলের মুকুট আটটি পাপ্‌ড়ি দিয়া প্রস্তুত। এই ফুলের ভিতরেও অনেক বন্ধ্যকেশর আছে।

পিতৃকেশরের আকৃতি যে কত রকম হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা এখানে কয়েকটি জানাশুনা ফুলের কেশরের আকৃতির কথা বলিব।

তুলসী, ভাঁট, নিসিন্দে, বামুনহাটি এবং বাকসের ফুল তোমরা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, এগুলিতে দুইটি করিয়া লম্বা কেশর আছে,—ইহাদের অন্য কেশরগুলি খাটো।

যাহার পিতৃকেশরগুলি মাতৃকেশরের চারিদিকে নলের মতো জড়াইয়া আছে,এ-রকম ফুল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দেখা যায় অনেক, কিন্তু কাজের সময়ে মনে থাকে না। সেইজন্য জবা, ঢেঁড়স্‌, মুচকুন্দ, কনকচাঁপা, মেস্তা ফুলের নাম করিতেছি। এই সব ফুলে জড়ানো কেশর দেখিতে পাইবে। জবাফুল বারোমাসই ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রাখে। ইহার কেশর পরীক্ষা করিলে দেখিবে, পিতৃকেশরগুলি জোট্‌ বাঁধিয়া মাঝখানের মাতৃকেশরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই রকম কেশরকে একগুচ্ছ (Monodelphous) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

মটর, সীম প্রভৃতি ফুলের কেশর আবার আর এক রকমের। এগুলিতে দশটি করিয়া কেশর থাকে। তাহার মধ্যে নয়টিকে গোড়ায় জোট বাঁধিয়া ফুলের মধ্যে ঘাড় বাঁকাইয়া থাকিতে দেখা যায়। বাকি কেশরটি মুক্ত থাকে। কাজেই, সমস্ত কেশরের ছুইটি ভাগ হয়। এইজন্য মটর, সীম, বক প্রভৃতির পিতৃকেশরকে দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

নেবুর ফুল হয়ত তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহার পিতৃকেশরগুলির মধ্যে তিনটি বা চারিটি একত্র হইয়া অনেকগুলি গুচ্ছের সৃষ্টি করিয়াছে। এই রকম কেশরকে বহুগুচ্ছ (Polydelphous) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

শিমূল ফুলের কেশরগুলি পাঁচ গুচ্ছে ভাগ করা থাকে। প্রত্যেক গুচ্ছের কেশরগুলিকে তলার দিকে সংযুক্ত দেখা যায়।

কেবল নেবুর ফুলেই যে বহুগুচ্ছ কেশর আছে, তাহা নয়। কত্‌বেল এবং কামিনী ফুলের কেশরেও তোমরা ঠিক্ এই রকমটি দেখিতে পাইবে। আস্‌-শেওড়ার শাদা-শাদা ছোটো ফুলেও বহুগুচ্ছ কেশর থাকে।

রেড়ি ভেরেণ্ডার ফুলে মূল পিতৃকেশর হইতে কয়েকটি করিয়া শাখা-কেশর বাহির হইতে দেখা যায়। এই রকম প্রত্যেক শাখার উপরে এক-একটি পরাগস্থালী থাকে। সুতরাং

বলিতে হয়, এই গাছে যতগুলি কেশর থাকে, তাহার চেয়ে অনেক পরাগস্থালী থাকে।

যাহার কেশর জোড়া নয়, কিন্তু মাথার উপরকার পরাগস্থালী পরস্পর জোড়া, এ-রকম ফুলও অনেক আছে। সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি বহুপুষ্পক ফুলের পুষ্পকে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। এগুলি খুব ছোটো জিনিস, তাই আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা না করিলে দেখা যাইবে না। এই কেশরগুলিকে যুক্তস্থালী নাম দেওয়া যাইতে পারে।

তরমুজ, কুমড়া, শশা ইত্যাদির পিতৃফুলের কেশর তোমরা পরীক্ষা করিয়াছ কি? বোধ হয়, কর নাই। ইহাদের পরাগস্থালীএবং কেশর-দণ্ড(Filament) আগাগোড়া সম্পূর্ণ জোড়া দেখা যায়। কতগুলি কেশর জুড়িয়া এগুলির উৎপত্তি, তাহা গুণিয়া ঠিক্ করিবার উপায় থাকে না।

পিতৃকেশর যে-রকম ভাবে ফুলের উপরে লাগানো থাকে, তাহা সব ফুলে একই দেখা যায় না। পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, গোলাপ ফুলের কেশরগুলি কুণ্ডের গায়ে লাগানো আছে। কুল ও আমের ফুলেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। কিন্তু বসন্তকরবী, লিচু, নেবু, দোপাটি, মাধবীলতা, জবা, শাল প্রভৃতি ফুলের কেশরগুলিকে তোমরা ঐ-রকমে লাগানো দেখিবে না। পুষ্পাধারের (Receptacle) উপরেই এগুলি লাগানো থাকে। ইহা কতকগুলি ফুলের একটা প্রধান বিশেষত্ব।

যাহাদের পিতৃকেশর বীজাধারের উপরে লাগানো আছে, এ-রকম ফুল তোমরা দেখিয়াছ কি? সূর্য্যমুখী ফুলের পুষ্পক-গুলিতে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। আমাদের জানাশুনা ফুলের মধ্যে এ-রকমটি আর প্রায়ই দেখা যায় না।

এগুলি ছাড়া যাহাদের পিতৃকেশর পাপ্‌ড়ির গায়ে জোড়া আছে, এ-রকম ফুলও অনেক রহিয়াছে। তোমরা রঙন্, তুলসী, সফেদা প্রভৃতির ফুলে ইহা দেখিতে পাইবে।

পিতৃকেশর দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ির গায়ে লাগিয়া আছে, এ-রকম ফুল অনেক দেখা যায়। বেগুন ও ধুতুরা ফুলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। পিতৃকেশরগুলি মাতৃকেশরে লাগিয়া আছে, এ-রকম ফুলও অনেক আছে। আকন্দ ও রাস্নার ফুলে ইহা দেখিতে পাইবে।

পরাগ-স্থালী

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, পিতৃকেশরের মাথায় পরাগ-স্থালী থাকে এবং তাহারি ভিতরে পরাগ পুষ্ট হয়। তোমরা জবা, পেয়ারা, নেবু প্রভৃতি যে-কোনো ফুলের কেশর পরীক্ষা করিয়ো ; প্রত্যেক কেশরের মাথায় পরাগ-স্থালী দেখিতে পাইবে। কিন্তু মাথা কোনো স্থালীর ঠিক্ নীচে বা পিঠে যুক্ত থাকিতেও দেখা যায়। সরিষার ও তুলিচাঁপার ফুলে ইহা দেখা যাইবে। ঘাসের ফুলের পরাগ-স্থালী, দণ্ডের সঙ্গে এক জায়গায় সংযুক্ত হইয়া তুলিতে থাকে। কুল ও আমরুলের কেশরেও উহাই দেখিতে পাইবে।

একটা মুশুরি বা মুগ ডালের উপরকার ছাল উঠাইয়া ফেলিলে তাহাকে যেমন দেখায়, পরাগ-স্থালীর আকৃতি কতকটা যেন সেই রকমের, দুইটি চাকার মতো অংশ মিলিয়া এক-একটি মুশুর ডালের উৎপত্তি হয়। পবাগ-স্থালীও সেই রকম দুইটি অংশ জুড়িয়া তৈয়ারি হয়। আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে, তোমরা জোড়ের মুখ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। কেশরের দণ্ড হইতে যে সংযোজন-তন্তু (Connective) বাহির হয়, তাহা কখন কখন জোড়ের গায়ে লাগানো থাকে। পরাগ-স্থালীতে সাধারণতঃ চারিটি করিয়া কুঠারি থাকে।

সকল ফুলেরই যে কেশরদণ্ড (Filament) থাকে, তাহা

নয়। যাহার পিতৃকেশরে দণ্ড নাই, কেবল পরাগ-স্থালী আছে, —এই রকম ফুল তোমরা অনেক দেখিতে পাইবে। বকুল ফুলের পিতৃকেশরে দণ্ড নাই, কেবল পরাগ-স্থালী লইয়াই ইহার কেশর।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙে প্রভৃতির একই গাছে দুই রকম ফুল ফোটে। ইহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এগুলির একটা পিতৃফুল লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাতে পরাগ-স্থালী কেশরদণ্ডে লাগানো নাই। এই সব ফুলে পরাগ-স্থালী পরস্পর জোট বাঁধিয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়ায়।

নেবু গাছের একটি ফুটন্ত ফুল তুলিয়া যদি তাহাকে শাদা কাগজের উপরে ঝাড়িতে থাকো, দেখিবে, কাগজের উপরে অনেক হল্‌দে রঙের পরাগ ঝরিয়া পড়িয়াছে। কেয়া ফুলে যে কত পরাগ থাকে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ,—একটু নাড়া দিলেই ফুল হইতে একগাদা পরাগ ঝরিয়া পড়ে।

যাহা হউক, পরাগগুলি কি-রকমে পরাগ-স্থালী হইতে বাহির হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। কোনো ফোটা ফুলের বড় পরাগ-স্থালী লইয়া তোমরা যদি আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, স্থালীর জোড়ের মুখ আগাগোড়া চিরিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতেই পরাগ বাহির হইতেছে। পরাগ পুষ্ট হইলে অনেক ফুলেরই স্থালীর জোড়ের মুখ দিয়া এই রকমে পরাগ বাহির হয়।

বেগুন, চাল্‌তা, লটকান প্রভৃতি কতকগুলি গাছের ফুলের পরাগ বাহির হইবার প্রণালী একটু অন্য রকমের। এই সব ফুলের পরাগ-স্থালীর গায়ে ছিদ্র হয় এবং সেই পথে পরাগ বাহিরে আসে।

পরাগের আকৃতি তোমরা আতসী কাচে ভালো বুঝিতে পারিবে না,—ছোটো অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই ইহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। অধিকাংশ ফুলের পরাগ প্রায় গোলাকার এবং মসৃণ —কেবল কতকগুলি ফুলের পরাগের গায়ে শুঁয়ো বসানো থাকে। অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে তোমরা কোনো কোনো ফুলের তিন-চারিটি পরাগকে দলা পাকাইয়া থাকিতে দেখিবে। গায়েব শুঁয়োতে শুঁয়োতে আট্‌কাইলে সেগুলি এই রকমে দলা পাকায়। আকন্দ ফুলের জোট্‌-বাঁধা পরাগগুলিকে খুব ছোটো শুক্‌না পাতার মতো দেখায়। তোমরা মোটা আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে, এগুলিকে ফুলের পিতৃকেশরের উপরে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিবে।

পরাগ জিনিসটি ফুলের অতি দরকারী। ইহাই ফুল হইতে ফলের সৃষ্টি করে। এইজন্যই ঠাণ্ডায়, গরমে, ঝড়ে বা বৃষ্টিতে সেগুলি যাহাতে নষ্ট না হয়, ফুলে তাহার ব্যবস্থা আছে।

যে-সকল পরাগ-স্থালী সম্পূর্ণ পুষ্ট হয় নাই, জল লাগিলেই সেগুলি ফাটিয়া যায় এবং ফাটার সঙ্গে সঙ্গে স্থালীর পরাগ-গুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে। এই রকম পরাগ ফুল উৎপন্ন করিতে পারে না। আমের মুকুল প্রায় ফুটিয়া আসিয়াছে

এমন সময়ে বৃষ্টি হইলে কি হয়, তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ,—তখন মুকুলগুলি নষ্ট হইয়া যায়—তাহা হইতে একটিও ফল হয় না। স্থালীতে জল লাগায় অপক্ব পরাগ বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই ইহা ঘটে। এই কারণে যখন ধানের শীষে ফুল ফুটিতেছে, তখন বেশি বৃষ্টি হইলে ধান ভাল হয় না। ইহাতে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

মাতৃকেশর

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, ফুলের ঠিক মাঝখানটিতে মাতৃকেশর থাকে। মাতৃকেশরের তলার অংশকে বলা হয় বীজাধার। ইহারি উপরে যে সরু লম্বা দণ্ড লাগানো থাকে তাহাাক কেশর-দণ্ড (Style) বলা হয়। কেশর-দণ্ডের মাথায় যে থ্যাব্ড়ানো অংশ থাকে তাহার নাম মুণ্ড (Stigma)। কাজেই, বীজাধার, দণ্ড এবং মুণ্ড এই তিন অংশ লইয়াই মাতৃকেশর।

জবাফুলের মাঝামাঝি খণ্ডিত চিত্র

একটা নেবুর ফুলের পাপ্ড়ি এবং পিতৃকেশরগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তোমরা মাঝের মাতৃকেশরগুলি পরীক্ষা করিয়ো; তাহার বীজাধার, দণ্ড এবং মুণ্ড পরে পরে লাগানো দেখিবে। নেবুর ফুলের মাতৃকেশরের মুণ্ডে একরকম আঠার মতো জিনিষ লাগানো থাকে। ধীরে ধীরে আঙুল লাগাইয়া তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়ো।

নেবু, সীম, পেয়ারা প্রভৃতির বীজাধার নিতান্ত ছোটো

নয়। তোমরা যদি ইহাদের মধ্যে কোনো একটিকে ধারালো
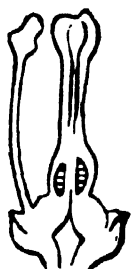
খণ্ডিত বীজাধার

ছুরি দিয়া লম্বালম্বি চিরিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে, ইহা নিরেট জিনিস নয়। তোমরা সীম বা মটরের বীজাধারকে ফাঁপা এবং নেবু বা পেয়ারার বীজাধারকে কতকগুলি ছোটো কুঠারিতে ভাগ করা দেখিতে পাইবে। তার পরে আরো ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে সেই সব কুঠারির ভিতরে অনেক বীজাণু দেখিবে; এইগুলিই পুষ্ট হইয়া বীজের সৃষ্টি করে।

সকল ফুলেরই যে বীজাধার নেবু বা মটরের মতো হয়, তাহা নয়। জবা ফুলকে বারো মাসই ফুটিতে দেখা যায়। তোমরা যদি ইহার বীজাধার চিরিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, তাহাতে পাঁচটি কুঠারি আছে। এই রকম, কাপাসে তিনটি কুঠারি দেখিতে পাইবে।

এড়োএড়িভাবে কাটিলে যে-রকম দেখায়, এখানে সে-রকমে কাটা দুইটি বীজাধারের ছবি দিলাম। প্রথমটিতে তিনটি এবং দ্বিতীয়টিতে দশটি কুঠারি রহিয়াছে দেখিবে। প্রথম চিত্রে বীজাণুগুলি বীজাধারের ঠিক্ মাঝের একটা উঁচু অংশে সাজানো আছে। দ্বিতীয় চিত্রে
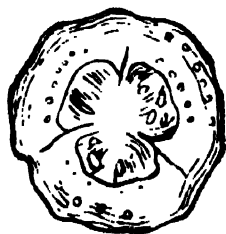
বীজাধার—১ম চিত্র

সেগুলিকে বীজাধারের গায়েই লাগানো দেখিবে। যে উঁচু অংশের উপর বীজাণু সাজানো থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বীজপীঠ (Placenta) বলা হয়।

প্রথম চিত্রের মতো বহুকুঠারী বীজাধারের অভাব নাই। কাপাস, নেবু, জবা ইত্যাদি অনেক গাছেই ঐ-রকম বীজাধার দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রের অনুরূপ বীজাধার তোমরা শশা, শেয়ালকাঁটা, প্রভৃতি গাছের বীজাধারে দেখিতে পাইবে। তোমরা নানা রকম ফুলের বীজাধার চিরিয়া তাহাতে বীজাণু কি-রকমে সাজানো আছে পরীক্ষা করিয়ো।

বীজাধার—২য় চিত্র
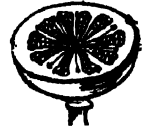
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ফুলের বীজাধার এক রকম নয়।

তোমরা একটি মটর বা সীমের ফুলের বীজাধার পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, কে যেন একটি সবুজ পাতাকে মুড়িয়া সুঁটি তৈয়ারি করিয়াছে এবং বীজাণুগুলিকে তাহারি মধ্য-শিরায় সাজাইয়া রাখিয়াছে। পাতার মতো যে-অংশগুলি জুড়িয়া এই রকমের বীজাধার প্রস্তুত হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিকরা কিঞ্জল্ক (Carpel) বলেন। মটরসুঁটি, সীম প্রভৃতিতে একটি কিঞ্জল্কই বীজাধার তৈয়ারি করে,—সেইজন্য এ-রকম বীজাধারকে এক-কিঞ্জল্ক (Apocarpous) বীজাধার বলা হয়। নেবুর বীজাধার পরীক্ষা করিয়ো; তাহাতে একটি

কিঞ্জল্ক দেখিতে পাইবে না। অনেক কিঞ্জল্ক মিলিয়া ইহার বীজাধার প্রস্তুত। এই রকম কিঞ্জল্ককে যুক্ত-কিঞ্জল্ক (Syncarpous) নাম দেওয়া হয় হয়।

নেবুর ফুলে আট দশটি ছোটো কিঞ্জল্ক পরস্পর জোট্ বাঁধিয়া একটি বড় বীজাধারের সৃষ্টি করে। নেবুর এক-একটি কোওয়াই এক-একটা কিঞ্জল্কের পরিচয় দেয়। শশা, তরমুজ, আপেল প্রভৃতি অনেক গাছেরই বীজাধার বহু কিঞ্জল্ক দিয়া প্রস্তুত।

নারিকেল তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহা কতকগুলি কিঞ্জল্ক দিয়া প্রস্তুত, তোমরা বলিতে পার কি ? ইহার চেহারা কতকটা তিনপলযুক্ত। ইহা দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায় তিনটি কিঞ্জল্ক দিয়া ইহার বীজাধার তৈয়ারি। নারিকেলের খোলার উপরে যে তিনটি চোখ্ থাকে তাহা দেখিলেও উহা বুঝা যায়। তিনটি কিঞ্জল্কের মধ্যে দুইটি অপুষ্ট অবস্থায় থাকে। তাই একটি কিঞ্জল্কের একটি চোখ দিয়া গাছের অঙ্কুর বাহির হয়।
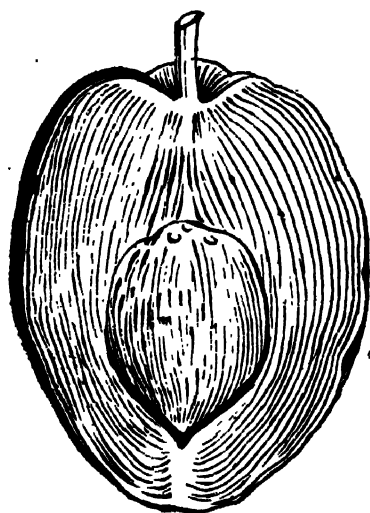
নারিকেল (খণ্ডিত)

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, শশা, তরমুজ প্রভৃতির বীজাধার নেবুর মতো বহু-কিঞ্জল্ক হইলে উহাদের ভিতরে নেবুর মতো কোওয়া থাকারই কথা,—কিন্তু শশা বা তরমুজের ভিতরে তাহা থাকে না কেন ? ইহার উত্তর আছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কিঞ্জল্কের প্রাচীর নেবুতে লোপ পায় নাই, তাই সেই প্রাচীরে-ঘেরা এক একটি কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শশা, তরমুজ প্রভৃতির কিঞ্জল্কের প্রাচীর জোড় বাঁধিয়া ক্রমে লোপ পাইয়াছে। তাই এখন সেগুলিতে নেবুর মতো কোওয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

তোমরা অনেক ফুটি বা পাকা তরমুজ কাটিয়া খাইয়াছ। খাইবার সময়ে ইহার ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি ? বোধ হয়, কর নাই। এবারে যখন তোমাদের বাড়ীতে তরমুজ কাটা হইবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো ; দেখিবে, এগুলিতে নেবুর কোষের মতো কোষ না থাকিলেও কুঠারির মতো কতকগুলি ভাগ আছে এবং প্রত্যেক ভাগে বীজ সাজানো আছে। এই ভাগগুলিই এক-একটা কিঞ্জল্ক দিয়া তৈয়ারি। কিঞ্জল্কের প্রাচীর যদি লোপ না পাইত, তাহা হইলে ফুটি, তরমুজ ও কাঁকুড়ের মধ্যেও তোমরা কোওয়া দেখিতে পাইতে।

বীজাধারের কথা যাহা বলিলাম, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে কি না জানি না। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝানো যাউক। শাল, কাঁটাল বা বটের একটি পাতাকে মধ্যশিরার দুই দিকে ভাঁজ করিয়া কি-রকমে ঠোঙা তৈয়ারি করা যায়, তাহা

বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। এই রকম ঠোঙা বোতলের মুখে দিয়া বোতলে তেল ঢালা যাইতে পারে। তোমরা দেখ নাই কি? মটর, কলাই, মুগ, অরহর প্রভৃতির বীজাধার যেন সেই রকম একটি কিঞ্জল্ক দিয়া তৈয়ারি ঠোঙা। পাতার মধ্য-শিরার দুই পাশকে গুটাইলে যে-রকমটি হয়, ইহার আকৃতি সেই রকমের। দুইটা, তিনটা, বা তাহারো বেশি পাতা জুড়িয়া ঠোঙা তৈয়ারি করা যায়। ইহাও হয়ত তোমরা দেখিয়াছ। দোকানে বেশি খাবার কিনিতে গেলে দোকানদার শালপাতায় তৈয়ারি এই রকম ঠোঙায় খাবার দেয়। কুমড়া লাউ, তরমুজ প্রভৃতির বীজাধার এই রকমের অনেক কিঞ্জল্ক দিয়া তৈয়ারি ঠোঙা। কতগুলি কিঞ্জল্ক দিয়া সেগুলি প্রস্তুত, তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। ছুরি দিয়া চিরিয়া বীজাধারের বীজাণু সাজানো দেখিয়া তাহা বুঝিতে হয়।

বীজাধারের ভিতরে কি-রকমে বীজ সাজানো থাকে, তাহা বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য কর নাই। ভিতরকার যে উঁচু মতো জায়গায় বীজ সাজানো থাকে, তাহাকে বীজপীঠ বলে,—তোমাদিগকে আগেই সে-কথা বলিয়াছি। শেয়াল-কাঁটার গাছ আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে পুকুরধারে অনেক জন্মে। তোমরা ইহার একটি ফল পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাতে বীজাধারের ভিতর-গায়ে সারি সারি অনেক বীজ সাজানো আছে। সুতরাং বলিতে হয়, ইহার খোলার সমস্ত প্রাচীরটাই বীজপীঠ। আফিঙের ফলেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

আপেল, নাসপাতি, কাপাস, জবা প্রভৃতির বীজাধারও অনেক কিঞ্জল্ক দিয়া প্রস্তুত। বীজাধারের ভিতর যে-সব কুঠারির মতো অংশ থাকে, তাহারি ভিতর দিকের কোণে অর্থাৎ বীজাধারের মাঝে ইহাদের বীজপীঠ দেখা যায়। এই রকম বীজপীঠকে আক্ষিক (Axillary) পীঠ বলা হয়।

মাতৃকেশরের দণ্ড ও মুণ্ড

বীজাধারের উপরে যে লম্বা অংশ লাগানো থাকে তাহাকে মাতৃকেশরের দণ্ড (Style) বলে। সব মাতৃকেশরেই দণ্ড থাকে না। কৃষ্ণচূড়া বা মটর প্রভৃতি গাছের ফুল পরীক্ষা করিলে দেখিবে, তাহার বীজাধারের উপরে বেশ লম্বা দণ্ড আছে। কিন্তু শেয়ালকাঁটা বা পপির বীজাধারে দণ্ড নাই ; যেখান হইতে সাধারণতঃ দণ্ড বাহির হয়, সেখানে এক-একটি মুণ্ড বসানো থাকে।

অধিকাংশ ফুলেই একটি করিয়া মুণ্ড দেখা যায় কিন্তু যাহাদের মুণ্ডের সংখ্যা একটার বেশি, এ-রকম ফুলও বড় কম নাই। বহু-মুণ্ড-ওয়ালা ফুল তোমরা দেখ নাই কি ? জবা ফুলে ইহা দেখিতে পাইবে। ইহাতে বীজাধার হইতে একটি দণ্ড সোজা হইয়া উঠিয়া আগায় পাঁচটা ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ভাগের আগায় মখমলের মতো লোম বসানো থাকে। সুতরাং বলিতে হয়, জবাফুলে পাঁচটি মুণ্ড আছে। করবী, ধান, গম প্রভৃতি অনেক ফুলেরই মুণ্ডে তোমরা ঐরকম লোম বসানো দেখিতে পাইবে। নেবু, আম, প্রভৃতি গাছের ফুলের মুণ্ডে যেমন আঠা লাগানো থাকে, এগুলিতে তাহা থাকে না। মুণ্ডের উপরে পরাগ পড়িলে সেগুলি যাহাতে বাতাসে উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া না যায়,

তাহারি জন্য কোনো ফুল মাথায় আঠা মাখিয়া এবং কোনো ফুল মুণ্ডে চুল লাগাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

যাহা হউক, তোমাদের বাগানে যত ফুল আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়ো; তাহা হইলে নানা ফুলে মুণ্ডের নানা রকম আকৃতি দেখিতে পাইবে।

আকন্দ ফুলের মুণ্ড বড় অদ্ভুত। এই ফুলে দুইটা করিয়া বীজাধার থাকে। তাহা হইতে দুইটি পৃথক্ দণ্ড বাহির হইয়া কিছু উপরে জোড়া হইয়া যায় এবং সেই জোড়া দণ্ডে আঠা-মাখানো একটি মাত্র মুণ্ড থাকে। লিলি ফুলের মুণ্ড পলকাটা এবং সীমজাতীয় ফুলের মুণ্ড লম্বা। এই রকমে ফুলে ফুলে মুণ্ডের যে কত রকম আকৃতি হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।
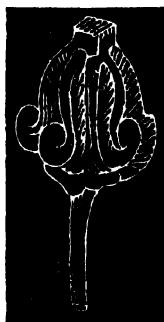
আকন্দ ফুল

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ফুলের দণ্ড এবং মুণ্ডের আকৃতির মধ্যে বুঝি কোনো নিয়ম নাই। কিন্তু তাহা নয়; বৈজ্ঞানিকরা ইহাতেও একটা মোটা-মুটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বীজাধারে যতগুলি কুঠারি থাকে, তাহার মুণ্ডকে প্রায় ততগুলি শাখায় বা অংশে ভাগ হইতে দেখা যায়। জবাফুলে তোমরা ইহার পরীক্ষা করিতে পারিবে। ইহার বীজাধারে যেমন পাঁচটি

কুঠারি থাকে, তেমনি মুণ্ডেও পাঁচটি ভাগ থাকে। কিন্তু এই নিয়মের অন্যথাও অনেক স্থলে দেখা যায়। সূর্য্যমুখী ফুলের এক-একটি পুষ্পক অর্থাৎ ছোটোফুলে একটির বেশি কুঠারি থাকে না, অথচ তাহার মুণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়।

ফুলের উপর যে প্রণালীতে বীজাধার বসানো থাকে, তাহা সকল ফুলে একই রকম দেখা যায় না। বাগান হইতে একটি নেবুর ফুল তুলিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ফুলের উপরেই বীজাধার সাজানো আছে। এইরকম বীজাধারকে উত্তম (Superior) বীজাধার বলা হয়। বেগুন, তাল, খেজুর, নারিকেল, বকুল, সীম, মটর, ধুতুরা, তামাক, টেপারি প্রভৃতি অনেক গাছের ফুলেই তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। আবার এমন ফুলও আছে যাহার বীজাধার কুণ্ডের নীচে লাগানো থাকে। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি জাতীয় অনেক গাছেরই মাতৃফুলে তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে। তা-ছাড়া দালিম. পেয়ারা, জাম, গোলাপ জাম প্রভৃতি গাছেও ঐরকম বীজাধার দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকরা ইহাকে অধম (Inferior) বীজাধার বলিয়া থাকেন।

ফলের উৎপত্তি

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, পিতৃকেশরের পরাগ মাতৃকেশরের মুণ্ডের উপরে না পড়িলে, বীজাধারের বীজাণু

পুষ্ট হয় না এবং ফুল হইতে ফলও হয় না। পরাগ দ্বারা কি-রকমে ফল ধরে, এবং কি-রকমে বীজ পুষ্ট হয়, এখন সেই সব কথা তোমাদিগকে বলিব। মাঘ মাসে আম গাছে মুকুল ধরিল। চৈত্র মাসে ফুল হইতে গুঁটি হইল এবং বৈশাখ মাসে সেগুলি বড় হইয়া জ্যৈষ্ঠে পাকিয়া গেল। ইহা প্রতি বৎসরেই আমরা দেখিতে পাই। কেমন করিয়া আমের মুকুল হইতে ফল হয়, তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি?

গাছ হইতে একটা পাতা ছিঁড়িলে সাধারণতঃ তাহা শুকাইয়া যায়, তখন তাহাতে আর জীবনের কাজ চলে না। কিন্তু পরাগ-স্থালীকে ফাটাইয়া যে লক্ষ লক্ষ পরাগ-কণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেগুলি গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও পাতার মতো মরে না। টাট্‌কা পরাগ জীবন্ত বস্তু। ফুল হইতে তফাৎ হইয়াও কোনো কোনো গাছের পরাগ দুই-তিন ঘণ্টা হইতে দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর পরীক্ষা আছে। এক গ্লাস জলে খানিকটা চিনি মিশাইয়া তাহাতে কতকগুলি টাট্‌কা পরাগ ফেলিয়া দিয়ো। তিন-চার দিন পরে, তোমরা যদি সে-গুলিকে সাবধানে আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, প্রত্যেক পরাগ-কণা হইতে যেন এক-একটা সরু শিকড়ের মতো নল বাহির হইয়াছে। যাহা শুক্‌না বা মরা, তাহা কি এই-রকমে বাড়িয়া নূতন কিছুর সৃষ্টি করিতে পাবে? কখনই পারে না। কাজেই বলিতে হয়, ফুলের পরাগ

জীবন্ত বস্তু এবং জীবন্ত বলিয়াই ইহা দ্বারা ফুলে ফল এবং বীজের সৃষ্টি হয়।

যে-প্রক্রিয়ায় বীজাধারে ফল পুষ্ট হয়, তাহা বড় আশ্চর্য্য। পরাগ-স্থালী হইতে যে-সব পরাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, মুণ্ডে আসিয়া ঠেকিবামাত্রই সেগুলি মুণ্ডের আঠা বা লোমে জড়াইয়া যায়। কাজেই, সেগুলি মুণ্ডের উপরেই লাগিয়া থাকে,—কিন্তু নির্জীবভাবে পড়িয়া থাকে না। মুণ্ডে পড়িয়াই ইহারা রস চুষিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে পুষ্ট হইয়া নিজেদের গা হইতে একটা খুব সরু নল বাহির করিতে আরম্ভ করে। বীজ হইতে যেমন শিকড় বাহির হয়, এই ব্যাপারটা যেন ঠিক্ সেই রকমেরই। শিকড় মাটির তলায় নামে, পরাগের শিকড় সে-রকমে মাটিতে নামে না। সেগুলি মাতৃ-কেশরের দণ্ডের ভিতর দিয়া একেবারে বীজাধারে গিয়া হাজির হয়। তার পরে বীজাধারের ভিতরে যে-সব বীজাণু সাজানো থাকে, তাহাদের একবারে পেটের ভিতরে গিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। ইহাই বীজ ও ফলের উৎপত্তির প্রণালী। পরাগের নলিকা একবার বীজাণুর ভিতরে গেলেই, যেন ভেল্‌কি-বাজীর মতো বীজ পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফলও দিনে দিনে বড় হইতে থাকে। তখন ফুলের পাপ্‌ড়ি, মাতৃকেশর, দণ্ড এবং মুণ্ডের দরকারই থাকে না, তাই সেগুলি প্রায়ই ঝরিয়া পড়ে।

বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? পরাগ এবং বীজাণুর এই রকম মিলনকে আধান (Fertilisation) বলা হয়।

এখানে কোনো একটি ফুলের মুণ্ডের ছবি খুব বড় করিয়া আঁকিয়া দিলাম। ইহার পাশেই পরাগ-স্থালী রহিয়াছে। পরাগগুলি স্থালী হইতে বাহির হইয়া মুণ্ডে আসিয়া পড়িলে যে-রকমে তাহাদের গা হইতে নলিকা বাহির হয়, তাহা ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। মুণ্ডের ভিতরে যে একটি কালো দাগ রহিয়াছে, তাহা পরাগ-নলিকা।
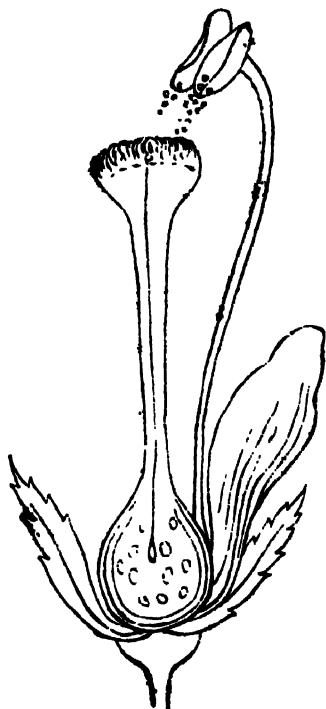
তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, পরাগ-নলিকা যখন বীজাধারের কচি বীজাণুর ভিতরে প্রবেশ করে তখন বুঝি সেগুলিকে ফাটাইয়া নষ্ট করে। কিন্তু তাহা করে না। যে-রকমে পরাগ-নলিকা বীজাণুর ভিতরে যায় তাহাও বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

তোমাদের বাড়ীতে এবারে যখন ছোলা বা মটর ভিজাইতে দেওয়া হইবে, তখন একটি ভিজা দানা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, জলে-ফোলা মটরের ছালের উপরে দুইটি দাগ আছে।

তাহার মধ্যে একটি দাগ যেন কালো। যে বোঁটার মতো অংশ দিয়া কাঁচা মটর সুঁটির গায়ে লাগানো থাকে, ইহা তাহারি চিহ্ন। এই চিহ্নের নীচে তোমরা আর একটি চিহ্ন দেখিতে পাইবে ; তাহা কালো নয়। ভিজা মটরের দানাটিকে টিপিলে তোমরা এই চিহ্নের ভিতর হইতে জল বাহির হইতে দেখিবে। সুতরাং ইহা কেবলি চিহ্ন নয়; ইহা ভিতর হইতে বাহির দিকের একটা খোলা পথ। বীজাণুর সৃষ্টির সময় হইতেই ঐ পথ বীজাণুর গায়ে থাকে, ইহাকে বীজপথ (Mycropyle) নাম দেওয়া যাইতে পারে। তোমরা পরীক্ষা করিলে দেখিবে, বীজ হইতে যখন শিকড়ের অঙ্কুর বাহির হয়, তখন ঐ বীজ-পথ দিয়াই উহা বাহিরে আসে। পরাগের নলিকাও ঐ অতি-ছোটো পথ দিয়াই বীজাণুর ভিতরে প্রবেশ করে, তাই সেগুলি কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট হয় না। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি ? ছোটো ফুলটিতে ফল ধরাইবার জন্য এত খুঁটিনাটি সুব্যবস্থার কথা শুনিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়।

পরাগ-পাতন

যাহাতে পিতৃকেশরের পরাগ মাতৃকেশরের মুণ্ডে অনায়াসে আসিতে পারে, তাহার জন্য ফুলে যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলিও অদ্ভুত। এখানে তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, মুণ্ডের কাছে যে-সব পরাগ-স্থালী থাকে, তাহার পরাগ বাতাসে উড়িয়া মুণ্ডে আসিয়া পড়িলেই ফুলে ফল ধরে। সুতরাং পরাগ-পাতনের (Pollination) জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। কোনো কোনো গাছে এই রকমেই পরাগ-পাতন হয় বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুবই অল্প : যে-সব ফুল নিজের পরাগেই নিজের বীজাধারকে পুষ্ট করে, তাহারা ইতর ফুল। ফুল যখন গাছে ফোটে তখন সেই জাতির আর একটি ফুলের পরাগ অন্য ডাল বা অন্য গাছ হইতে আসিয়া মুণ্ডে পড়ে, ইহাই সে চায়। নিজের পরাগ নিজের মুণ্ডে লাগিলে যে ফল জন্মে, তাহা ভালো হয় না। কাজেই, ভালো ফলের জন্য এক ফুলের পরাগ সেই জাতীয় অন্য ফুলের মুণ্ডে আনিয়া ফেলা দরকার হয়,—কেবল বাতাসের দ্বারা এই রকমের পরাগ-বহন চলে না।

এ-রকম গাছও অনেক আছে, যাহাতে কতক ফুল কেবল মাতৃকেশর এবং কতকগুলি কেবল পিতৃকেশর লইয়া জন্মে। তোমরা লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙে প্রভৃতি গাছে ইহা আগেই

দেখিয়াছ। এখানে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের মুণ্ডে বহিয়া আনিয়া না দিলে ফুলে ফল হয় না। সব সময়ে বাতাসের দ্বারা এ-কাজটি কখনই হয় না। সুতরাং অন্য উপায়ের দরকার হয়।

তাল, পেঁপে প্রভৃতি গাছের পিতৃগাছ ও মাতৃগাছ আলাদা থাকে। পিতৃগাছ কেবল পিতৃকেশরওয়ালা ফুল ফোটে, মাতৃগাছে কেবল মাতৃকেশরওয়ালা ফুল ধরে। এখানেও দূরের পিতৃগাছের পরাগ মাতৃগাছের ফুলে আনিয়া ফেলা দরকার হয়,—তাহা না হইলে মাতৃগাছের গাদা গাদা ফুল ধরিলেও একটা ফুলেও ফল ধরে না। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? আমাদের বাড়ীতে কিছু দিন আগে পেঁপের একটা মাতৃগাছ ছিল, কিন্তু পাড়ার কোনো জায়গাতেও পিতৃগাছ ছিল না। মাতৃগাছে অনেক মাতৃকেশরওয়ালা ফুল ধরিত কিন্তু তাহা হইতে একটাও পেঁপে হইত না। আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি। সুতরাং দেখ, মাতৃকেশরের পরাগ পেঁপের পিতৃ-কেশরের মুণ্ডে আসিয়া লাগা দরকার। কেবল বাতাসের দ্বারা এক গাছের পরাগ অন্য গাছে আনা চলে কি? কখনই চলে না। তাই এখানে পরাগ-বহনের অন্য ব্যবস্থার দরকার হয়।

সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বিলের পদ্মবনে শত শত পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল এবং ভ্রমর ও মৌমাছিরা দলে দলে আসিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তোমরা বোধ হয় মনে কর, মৌমাছি ও ভ্রমরদের পেট

ভরাইবার জন্য ফুলেরা তাহাদের বুকের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। কিন্তু তাহা নহে। মধুর ভাণ্ড বুকে ধরিয়া এবং গন্ধ ছড়াইয়া মৌমাছি ও প্রজাপতিদের দলে ফুলেরা যে নিমন্ত্রণ পাঠায়, তাহা কেবল উহাদের পেট ভরাইবার জন্য নয়। এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যাইবার ইহাই একটি ফন্দি। ভ্রমর, প্রজাপতি প্রভৃতির পায়ে লম্বা লম্বা লোম লাগানো থাকে; ফুলের গন্ধে ছুটিয়া আসিয়া তাহারা যেই মধু খাইবার জন্য ফুলের উপরে বসে, অমনি ফুলের পরাগ উহাদের পায়ে, লোমে এবং ডানায় লাগিয়া যায়। ফুলে বেশি মধু থাকে না এবং পদ্মজাতীয় অনেক ফুলে একেবারেই মধু থাকে না,—থাকে কেবল গন্ধ। এইজন্য অনেক ফুলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ভ্রমর ও মৌমাছি প্রভৃতির পেট ভরাইতে হয়। কাজেই, মধুর চেষ্টায় ইহারা যখন এক ফুল হইতে অন্য নূতন নূতন ফুলে গিয়া বসে তখন তাহাদের গায়ের ও পায়ের সেই পরাগগুলি নূতন ফুলের মুণ্ডে লাগিয়া যায় এবং তাহাতে বীজাধারের বীজাণু পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে।

এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যাইবার ইহা সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি? তাহা হইলে দেখ, প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছি এবং আরো অনেক পতঙ্গ গাছদের পরম বন্ধু— ইহাদের সাহায্য না পাইলে অনেক গাছে ফলই ধরিত না। টুনটুনি প্রভৃতি ছোটো পাখীও এই কাজে ফুলদের কম সাহায্য করে না। ইহারা লম্বা ঠোঁট ফুলের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া মধু খাইয়া বেড়ায়। সেই সময়ে তাহারা এক ফুলের পরাগ আর এক ফুলে দিয়া আসে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কোনো ফুলের পরাগ অপর যে-কোনো ফুলের মুণ্ডে লাগিলেই তাহাতে ফল ধরে। কিন্তু তাহা নয়। পেয়ারা ফুলের পরাগ আমের ফুলে লাগিলে, আম গাছে কখনই ফল ধরে না। আমের ফুলের পরাগ যদি অন্য এক আমের ফুলের মুণ্ডে আসিয়া ঠেকে, তবেই তাহাতে ফল হয়। আমের পরাগ আতার ফুলে আসিয়া পড়িলে আতা গাছে ফল ধরে না।

যে-সব কথা বলিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, ফুলের এত সুগন্ধ এবং মধু কেবল ভ্রমর ও মৌমাছিদের ডাকিয়া আনিবার জন্য। গাছের কোন্ ডালে, কোন্ পাতার আড়ালে ফুল আছে, তাহা উহারা গন্ধ শুঁকিয়াই অনেক সময়ে বাহির করে। তার পরে সেই ফুলের মধু খাওয়া শেষ হইলে তাহারা কতকগুলি পরাগ গায়ে মাখিয়া অন্য ফুলে দিয়া আসে। ইহাতে পতঙ্গরা মধু খাইয়া যেমন খুসি হয়, অন্যফুলের পরাগ পাইয়া ফুলেরাও সেই রকমে উপকার পায়। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি? একজন মানুষ যখন আর একজনের সঙ্গে কোনো কাজ করে, তখন তাহার মধ্যে কত কপটতা, কত শঠতা এবং কত চাতুরী থাকে। কিন্তু পতঙ্গ ও গাছপালাদের মধ্যে যে কারবার চলে, তাহাতে সে-রকম মিথ্যা ব্যবহার বা শঠতা একটুও দেখা যায় না।

তোমাদের গ্রামের ঠাকুরবাড়ীর মাঠে দোলপূর্ণিমার মেলা বসিয়াছে। দোকানে ও লোকে সমস্ত মাঠ পরিপূর্ণ। কত দূরদূরান্তর হইতে দোকানদার আসিয়া দোকান সাজাইয়াছে। বাসনের পটিতে কেবল বাসনেরই দোকান এবং ময়রা-পটিতে ভালো ভালো খাবারের দোকান সারি-সারি বসিয়া গিয়াছে। কত ছবি, কত রঙিন্ নিশান, কত লতা-পাতা ও ফুলে খাবারের দোকানগুলি সাজানো। এই সব দোকানের মধ্যে কোন্‌টিতে বেশি খরিদ্দার জড় হইবে, তোমরা বলিতে পার কি ? তোমরা নিশ্চয়ই দেখিবে, যে দোকানটি রঙিন্ কাগজের লতাপাতায় ও বড় সাইনবোর্ডে সাজানো আছে, অধিকাংশ লোকই সেইখানে গিয়া হাজির হইতেছে। লোকে হয় ত ভাবে, যাহার বাহিরের বাহার এত বেশি, তাহার ভিতরে না-জানি কত ভালো খাবারই আছে। তাই বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়াই অনেক খরিদ্দার দোকানে জমা হয়। দোকানদাররা লোকের মনের ভাব খুবই ভালো করিয়া বুঝে, তাই তাহারা বড় বড় রঙিন্ সাইন্‌বোর্ডে ও কাগজের লতাপাতায় দোকানগুলি সাজাইয়া রাখে। ইহাকে দোকান-দারী করা বলে।

ফুলদের মধ্যেও এই রকম দোকানদারীর ভাব আছে। তোমাদের বাগানের ও বন-জঙ্গলের গাছে গাছে নানা রকমের ফুল যে-সব লাল নীল হল্‌দে পাপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া উঠে, সেগুলিই তাহাদের সাইনবোর্ড। দূরের প্রজাপতি এবং

মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গের দল ঐ রকম রঙিন্ সাইনবোর্ড দেখিয়াই ছুটিয়া ফুলের উপরে আসিয়া বসে এবং তার পরে মধু খাওয়া শেষ হইলে সেই-সব ফুলের পরাগ গায়ে মাখিয়া অন্য ফুলে রাখিয়া আসে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমূল গোলাপ প্রভৃতি ফুলের রঙিন্ পাপড়ি ভ্রমর ও মৌমাছিদের ভুলাইবার জন্যই ফুলে ফুলে এমন সুন্দরভাবে সাজানো থাকে।

রাত্রি হইলে খরিদ্দার আসে না, তাই বাজারের অনেক দোকানদারই সাইনবোর্ডগুলি ঘরে তুলিয়া দোকান-পাট বন্ধ করে। কিন্তু এমন দোকানও অনেক আছে, যেখানে রাত্রিতেই বেচা-কেনার কাজ চলে। দোকানদাররা তখন দোকানের বাহিরে আলো জ্বালাইয়া খরিদ্দার ডাকিয়া আনে। ফুলদের মধ্যে এইরকম দোকানদারী তোমরা দেখ নাই কি? রজনীগন্ধা, জুঁই, চামেলি, মল্লিকা প্রভৃতি যে-সব ফুল রাত্রিতে ফোটে তাহারাই ঐ রকমেরর দোকানদারী করে। রাত্রির অন্ধকারে লাল, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি রঙ্‌গুলিকে চেনাই যায় না। তোমার গায়ের লাল, নীল বা সবুজ রঙের জামাটিকে রাত্রির অন্ধকারে মিশমিশে কালো বলিয়াই বোধ হয় না কি? রঙিন্ ফুলকেও রাত্রির অন্ধকারে সেই রকম কালো দেখায়। তাই রজনীগন্ধা বেলা প্রভৃতি যে-সব ফুল রাত্রিতে ফোটে, তাহাতে রঙিন পাপ্‌ড়ির বদলে কেবল শাদা

পাপ্‌ড়িই থাকে। অন্ধকারে কেবল শাদা জিনিসকে দূর হইতে দেখা যায়।

তাহা হইলে দেখ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, জুঁই প্রভৃতি ফুলের শাদা রঙ্‌ এবং সুগন্ধ পতঙ্গদের ডাকিয়া আনিবারই ফন্দি। রাত্রির অন্ধকারে এই সব শাদা ফুল দেখিয়া অনেক পতঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া মধু খাইবার জন্য ফুলের উপরে বসে এবং তার পরে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যার সময়ে বাড়ীর কাছের জঙ্গলে যখন কচুর ফুল ফোটে, তখন কি বিশ্রী গন্ধই বাহির হয়। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? ইহাও পরাগ-পাতনের আর একটা ফন্দি। প্রজাপতি ও মৌমাছিরা খুব ভদ্রশ্রেণীর সৌখীন পতঙ্গ। তাই যেখানে ভালো গন্ধ ও ভালো রঙ আছে, সেখানেই তারা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এ-রকম পতঙ্গও অনেক আছে, যাহারা ভালো গন্ধ ও ভালো রঙ্‌ পছন্দ করে না। ইহারা কুৎসিত জিনিস খাইতে এবং খারাপ গন্ধ শুঁকিতেই ভালোবাসে। কচুর ফুল দুর্গন্ধ ছড়াইয়া এই সকল ইতর পতঙ্গদেরই ডাকিয়া আনে। যাহার ফুল হইতে ঠিক পচা মাংসের মতো দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে এ-রকম গাছও আমরা দেখিয়াছি। যে-সব মাছি কসাইখানার পচা মাংস খাইয়া বেড়ায়, সেইগুলিই ফুলের দুর্গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া এই সব ফুলে আসিয়া বসে এবং

তার পরে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যায়।

পরাগ-পাতন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা ফুলের বাহিরের ব্যাপার। যাহাতে পতঙ্গ দ্বারা পরাগ সহজে আদান-প্রদান হয়, তাহার জন্য ফুলের ভিতরে যে-সব ব্যবস্থা আছে, তাহা আরো আশ্চর্য্যজনক।

আমরা আগেই বলিয়াছি, কোনো ফুলের পরাগ যদি তাহারি নিজের মুণ্ডে আসিয়া ঠেকে, তবে তাহাতে ভালো ফল ধরে না। পরাগ ও মুণ্ডের এই রকম মিলন যাহাতে না হয়, তাহার জন্য অধিকাংশ ফুলেই পরাগ-স্থালী এবং মুণ্ড ঠিক একই সময়ে পুষ্ট হয় না। যে-সকল ফুলের পরাগ বাতাসে উড়িয়া অন্য ফুলের উপর পড়ে, সেগুলির মুণ্ড আগে পরিণত হয় এবং তাহার অনেক পরে পরাগ-স্থালী হইতে পরাগ বাহির হয়। কাজেই, এই সকল ফুল নিজের পরাগে ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। যে-সকল ফুলে মৌমাছি ও পতঙ্গেরা আনাগোনা করে, সেগুলিতে ইহার ঠিক উল্‌টা ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিতে আগে পরাগ-স্থালী হইতে পরাগ বাহির হয় এবং সেই-সব পরাগ পতঙ্গেরা অন্য ফুলে লইয়া গেলে, মুণ্ড পরিণত হয়। কাজেই, নিজের পরাগে যে ফুলে ফল ধরিবে তাহার একটুও সম্ভাবনা থাকে না। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি?

তুলসী, দণ্ড-কলস প্রভৃতি ফুলে ওষ্ঠের মতো একটা অংশ

বাহির করা থাকে। বাকস, মটর, বক প্রভৃতি ফুলের নীচেকার দুইটা পাপড়ি এমনভাবে বাহির করা থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, কে যেন জিভ মেলিয়া রহিয়াছে। ফুলের এই সব আকৃতিও পতঙ্গদের ডাকিয়া আনিবার জন্য।

মনে কর, আমরা যেন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। দুই তিন মাইল বেড়াইয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে যদি মাঠের মাঝে একখানি সুন্দর বেঞ্চি পাতা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা কি করি? আমরা তখনি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ি না কি? শ্রান্ত প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গের দল উড়িতে উড়িতে যখন ঐ সকল ফুলের কাছে যায়, তখন সেগুলির সম্মুখের রঙিন্ পাপড়িগুলিকে বেঞ্চির মতো দেখিতে পাইয়া চট্ করিয়া তাহাতে বসিয়া পড়ে এবং তার পরে মধুর গন্ধ পাইয়া ফুলের মধ্যে ঢুকিয়া মধু খাইতে আরম্ভ করে।

মৌমাছিরা দুরন্ত ছেলেদের মতো ভয়ানক ব্যস্ত প্রাণী। তাহারা যে-ফুলে গিয়া বসে, তাহাকে লণ্ডভণ্ড না করিয়া ছাড়ে না। কিন্তু প্রজাপতিরা সে-রকম নয়। ইহারা খুব শান্ত ও সৌখীন। তাই অতি ধীরে ধীরে আসিয়া ইহারা ফুলের উপরে বসে এবং অতি সাবধানে লম্বা জিভটা বাহির করিয়া মধু চুষিতে আরম্ভ করে। এই সব কারণে অনেক ফুল মৌমাছির চেয়ে প্রজাপতিদেরই বেশি পছন্দ করে। মৌমাছিদের তাড়াইবার জন্য এই সব ফুলে কি ব্যবস্থা আছে,

তোমরা বোধ হয় তাহা লক্ষ্য কর নাই। দুরন্ত ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা ভালো জিনিসপত্র তাকের উপরে বা উঁচু কুলুঙ্গীতে রাখিয়া দিই। তাই ছেলেরা হাত বাড়াইয়া সেগুলির নাগাল পায় না। মৌমাছি প্রভৃতি দুরন্ত পতঙ্গদের অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রঙন্, রজনীগন্ধা, ধুতুরা, কলিকা প্রভৃতি ফুল কতকটা এই রকমেরই উপায় অবলম্বন করে। এই সব ফুল তাহাদের নলের মতো লম্বা মুকুটের তলায় তাহাদের বীজাধার ও মধু লুকাইয়া রাখে। তাই মৌমাছিরা কোনো রকমেই সেই সরু ছিদ্র দিয়া মধুকোষের কাছে পৌঁছিতে পারে না। কাজেই, ইহাদের মধু প্রজাপতিদের জন্যই সঞ্চিত থাকিয়া যায়। তাহারা সুবিধামত ফুলের উপরে আসিয়া বসে এবং তার পরে লম্বা শুঁড়গুলিকে ফুলের নলের ভিতরে চালাইয়া মধু খাইয়া ফেলে।

যাহাতে রঙিন্ পাপড়ি, মধু বা গন্ধ নাই এ-রকম ফুল অনেক আছে। ইহাদের কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। প্রজাপতি মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গরা এই সব ফুলের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকায় না। কাজেই, ইহাদের পরাগ-পাতনের জন্য অন্য ব্যবস্থার দরকার হয়।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে তোমাদের বাগানের নারিকেল গাছে যে লম্বা লম্বা ফুলের মঞ্জরী বাহির হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। নারিকেল-মঞ্জরীতে পিতৃফুল ও মাতৃফুল একত্র ফোটে। কিন্তু সেগুলি কখনই এলোমেলো ভাবে সাজানো

থাকে না। মঞ্জরীর গোড়ায় মাতৃফুল এবং আগায় পিতৃফুল সাজানো দেখা যায়। নারিকেল ফুলে রঙিন্ পাপড়ি বা সুগন্ধ থাকে না। কাজেই, ভ্রমর বা মৌমাছিরা কখনই ইহাতে আসিয়া বসে না,—বাতাসই পিতৃফুলের পরাগ মাতৃফুলে লইয়া যায়। কিন্তু মঞ্জরীর আগায় সাজানো পিতৃফুলের পরাগ গোড়াকার মাতৃফুলে না পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য ইহাতে মাতৃফুলের চেয়ে অনেক বেশি পিতৃফুল থাকে। নারিকেল গাছে এই ব্যবস্থা থাকে বলিয়াই কোনো-না-কোনো ফুলের পরাগ বাতাসে ভাসিয়া মাতৃফুলে আসিয়া পড়ে। তাই পতঙ্গদের সাহায্য না পাইয়াও গাছ নিষ্ফল হয় না। তোমরা নারিকেল গাছের তলায় যে ফুলগুলিকে ছড়াইয়া থাকিতে দেখ, সেইগুলিই পিতৃফুল। পরাগ-স্থালী হইতে পরাগ বাহির হইয়া পড়িলেই, সেগুলি ঝরিয়া পড়ে। আমরা ইহা দেখিয়া মনে করি, নারিকেল গাছের ভাল ফুলগুলিই বুঝি কোনো কারণে ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু তাহা নয়।

কচুফুল

কেবল যে নারিকেল গাছেই এই রকমে পরাগ-পাতন হয়, তাহা নয়। অন্য গাছে যে-সব বর্ণহীন ও গন্ধহীন ফুল মঞ্জরীতে

সাজানো থাকে, তাহাদের মাতৃফুল ও পিতৃফুল অনেক সময়ে নারিকেল ফুলের মতই সাজানো দেখা যায় এবং তাহাদের পরাগ-পাতন নারিকেল ফুলের মতই হয়।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় কচু ফুলের একটি ছবি দিলাম। নারিকেলের মতো ইহার নীচে ফুলগুলি মাতৃফুল। ইহারই উপরে ফুলগুলি সাজানো দেখিতেছ, সেগুলি বন্ধ্যফুল। অর্থাৎ এই ফুলে মাতৃকেশর বা পিতৃকেশর কোনোটাই দেখা যায় না। ইহার উপরে যে ফুল আছে, সেইগুলিই পিতৃফুল। কচু গাছের এই রকম মঞ্জরীতে উপরের পিতৃফুলের পরাগ পোকামাকড়ে বহিয়া নীচে-কার মাতৃফুলে লাগাইয়া দেয়।

ধানের ফুল

ধানের ফুল ছোটো জিনিস। ইহা তোমরা বোধ হয় পরীক্ষা কর নাই। যখন ধানে ফুল ধরিবে তখন একটি শীষ ছিঁড়িয়া আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, ইহার ফুলে রঙিন পাপড়ি

নাই। ধানের গায়ে যে তুষ লাগানো থাকে, তাহাই দুইটি পাপ্‌ড়ির আকারে ফুলের ভিতরকার অংশকে ঢাকিয়া রাখে। ইহাকে তুষপত্র বলা যাইতে পারে। পাকা ধানে তুষপত্র জোড়া থাকে। ধানের ফুলে উহা আলাদা থাকে। তুষের চেহারা কি-রকম তাহা তোমরা ধানেই দেখিতে পাও। ধান হইতে চাল বাহির হইলে দুই ধারের তুষপত্রকে ঠিক্ নৌকার মতো দেখায়।

এখানে ধানের ফুলের একটা খুব বড় ছবি আঁকিয়া দিলাম। দেখ, ফুলের তলায় কুণ্ড আছে, এবং তাহারি উপরে তুষপত্র দুটি পাপড়ির মত ভিতরের অংশকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

পাপ্‌ড়ি খুলিয়া ফেলিলে ধানের ফুলকে যে-রকম দেখায় পার্শ্বের চিত্রে তাহা দেখানো হইল। ফুলে ছয়টি পিতৃকেশর এবং একটি মাতৃকেশর আছে। মাতৃকেশরের মুণ্ড দুইটি শুঁয়োওয়ালা শাখায় বিভক্ত।

ধানের ফুলের পিতৃকেশর ও মাতৃকেশর

যাহাতে পিতৃকেশরের পরাগগুলি ঠিক্ সময়ে মাতৃকেশরের উপরে পড়ে, তাহার

জন্য ধানের ফুলে যে ব্যবস্থা আছে তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক। বৃষ্টির সময়ে ফুলের পরাগগুলি ধুইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। তাই ঝড়বৃষ্টির দিনে ফুলের তুষপত্র দুটি ভিতরকার কেশর-গুলিকে এমনভাবে আট্‌কাইয়া রাখে যে, কোনোক্রমে বাহিরের জল ফুলের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি না থাকিলে তুষপত্র দুটি আপনিই খুলিয়া যায়, তখন ছয়টা পিতৃকেশর ফুলের ছয়দিকে ঝুলিতে থাকে। তার পরে পরাগ-স্থালী হইতে যে পরাগ বাহির হইতে আরম্ভ করে, তাহা বাতাসে উড়িয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যাওয়া-আসা সুরু করিয়া দেয়। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি? তাহা হইলে দেখ, ধানের ফুলের পরাগ-পাতনে, পতঙ্গদের সাহায্য লাগে না। বাতাসই এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যায়।

মধুকোষ

লোভ দেখাইয়া পতঙ্গদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অনেক ফুলে মধু থাকে। তোমাদিগকে আগে সে-কথা বলিয়াছি। আমরা ছেলেবেলায় বাকস, রঙন্ প্রভৃতি ফুল চুষিয়া যে কত মধু খাইয়াছি, তাহার হিসাবই হয় না। তোমরা খাও নাই কি? ফুলের টাট্‌কা মধু মন্দ লাগে না। এই মধু চাকের মধুর মত গাঢ় নয়, জলের মত পাত্‌লা।

ইহাই চাকে লইয়া গিয়া মৌমাছিরা উগ্‌লাইয়া চাকের ছিদ্রে ছিদ্রে জমা রাখে। তখন উহা গাঢ় হয়।

যাহা হউক, ফুলের মধ্যে কোথায় মধু থাকে, সে-কথা তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এখানে একটা ফুলের ছবি দিলাম। তোমরা ছবিটি দেখিয়া হয়ত ভাবিতেছ, ইহা কোনো একটা বিদেশী গাছের কিম্ভূতকিমাকার ফুল। কিন্তু তাহা নয়—ইহা আমাদের আম গাছেরই একটি ফুল। আমের ফুল খুব ছোটো। অণুবীক্ষণে সেটিকে যেমন দেখায়, ছবিটি সেই রকম করিয়াই আঁকা হইয়াছে।
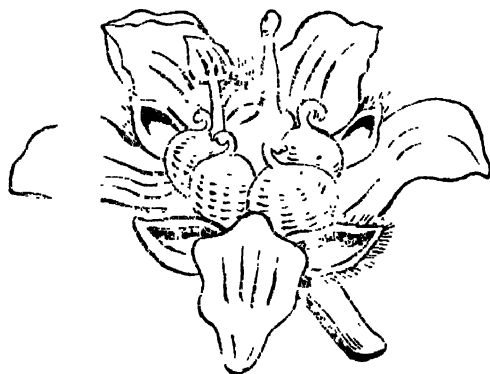
আমের ফুল

ছবি দেখিলেই বুঝিবে, আমের ফুলে পাঁচটি পাতাওয়ালা কুণ্ড থাকে এবং তাহারি উপরে একটু হল্‌দে রঙের পাঁচটি পাপ্‌ড়ি সাজানো দেখা যায়। আমের ফুলে চারি পাঁচটি পিতৃকেশর থাকে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে সাধারণতঃ একটিরই

মাথায় পরাগ-স্থালী দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হয়, আমের ফুলের পাঁচটি কেশরের মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলি বন্ধ্যা। ছবিতে ঠিক্ মাঝের মাতৃকেশরের চারিদিকে যে পাঁচটি গোলাকার বস্তু সাজানো দেখিতেছ, সেগুলি ইহার মধুকোষ। ফুল পুষ্ট হইলে এই সকল কোষ হইতে মধু বাহির হয়। পতঙ্গেরা ফুলের গন্ধে এবং ঐ মধুর লোভে ছুটিয়া আসিয়া মাতৃকেশরের মুণ্ডে পিতৃকেশরের পরাগ লাগাইতে আরম্ভ করে।

অধিকাংশ ফুলেরই মধুকোষ আমের ফুলের মতো মাতৃকেশরের চারিদিকে সাজানো থাকে। পোকাখেগো গাছরা যেমন পাতার বিশেষ বিশেষ কোষের সাহায্যে জারক রস জমা করে, ফুলেরাও ঠিক সেইরকমেই কতকগুলি কোষ দিয়া মধু সঞ্চয় করে।

এক-একটা আমের মঞ্জরীতে শত শত ফুল থাকে। ঠিক সময়ে পরাগ-পাতন হইলে প্রত্যেক ফুল হইতেই এক-একটি সরিষার দানার মতো ফল বাহির হয়। কিন্তু এই ফলগুলি বেশিদিন গাছে থাকে না। আট দশ দিনের মধ্যে তাহাদের প্রায় সবগুলিই ঝরিয়া পড়ে। শেষে দেখা যায় এতগুলি গুঁটির মধ্যে তিন চারিটি মাত্র গুঁটি বড় হইতেছে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? সরিষা বা মটরের মত আমের গুঁটিগুলি যখন গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, তখন আমরা মনে করি, বুঝি রৌদ্রের তাপেই তাহাদের এমন দশা হইতেছে। কিন্তু আসল ব্যাপার

তাহা নয়। এক-একটি মঞ্জরীতে যে শত শত গুঁটি ধরে, তাহাদের সকলগুলিতে খাদ্যরস চালান করার সাধ্য গাছের থাকে না। তাই প্রত্যেক মঞ্জরীর কেবল চারি পাঁচটি ফলে তাহারা খাদ্য জোগাইতে আরম্ভ করে। কাজেই, খাদ্য না পাইয়া বাকি ফলগুলি আপনিই শুকাইয়া ঝরিতে আরম্ভ করে। সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করিলে লোকে দেউলিয়া হইয়া যায়। শেষে তাহার এমন দুর্গতি হয় যে, সে নিজেই খাইতে পায় না। কতগুলি ফলকে খাওয়াইয়া বড় করিতে পারিবে, তাহা গাছরা জানে। তাই তাহারা সব ফলকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল কয়েকটি ফলকে আদর-যত্ন করিয়া পালন করে।

পাতার নানা মূর্ত্তি

তোমাদিগকে পাতা, পাপড়ি এবং কেশরের কথা মোটামুটি বলিলাম। বৈজ্ঞানিকরা গাছের এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কথা বলেন, তাহাই তোমাদিগকে এখানে বলিব।

তাঁহারা বলেন, এই যে গোলাপ, পদ্ম, জবা প্রভৃতি ফুলের রঙিন্ পাপ্ড়ি তোমরা দেখিতেছ, তাহা পাতারই রূপান্তর অর্থাৎ সাধারণ সবুজ পাতাই নানা রকমেই বদ্লাইয়া গিয়া এই সব রঙ্ওয়ালা পাপ্ড়ি হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ইহা কখনই হইতে পারে না। পাপ্ড়ির আকৃতি পাতার চেহারার সঙ্গে মিলে না,—অবার রঙেও পাপ্ড়ি ও পাতার মধ্যে অনেক তফাৎ। তবে কেমন করিয়া পাতা পাপ্ড়ি হইয়া দাঁড়াইবে? কিন্তু তাহাই হয়। তোমরা গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি ফুল পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহাদের নীচের পাপ্ড়ির রঙ্ সবুজ। দেখিলেই মনে হইবে, যেন বিধাতা পুরুষ সাধারণ পাতার রঙ্ বদ্লাইয়া এবং তাহাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া পাপ্ড়ি তৈয়ারি করিয়াছেন। তোমরা সন্ধান করিলে আরো অনেক ফুলের নীচের পাপ্ড়িগুলির আধ্খানাকে ঠিক পাতার মতো দেখিতে পাইবে। সুতরাং পাতা হইতেই যে পাপ্ড়ির সৃষ্টি, তাহা বুঝা যায় না কি?

কেবল ইহাই নয়, পাপ্‌ড়ি পরিবর্ত্তিত সইয়া মাতৃকেশর ও পিতৃকেশরের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাও পণ্ডিতেরা বলেন। এই কথাটি যে খুব সত্য, হাতে হাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমরা গোলাপ ফুল ও পদ্মফুলেই ইহার প্রমাণ পাইবে। তোমরা গোলাপের খুব ভিতরদিকের পাপ্‌ড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাকো, আজই এই ফুলের কতকগুলিকে পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহাদের কোনো-কোনোটির ভিতরকার সরু পাপ্‌ড়ির মাথাতেই এক-একটা পরাগ-স্থালী লাগানো আছে। পাপ্‌ড়িই বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে যে ক্রমে পিতৃকেশর এবং মাতৃকেশর হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহা হইতে তাহা বুঝা যায় না কি? পদ্মফুল তোমরা কত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া নষ্ট করিয়াছ,—উহার ভিতরকার পাপ্‌ড়িগুলিকে লক্ষ্য করিয়াছ কি? বোধ হয়, কর নাই। এবারে পদ্মফুল হাতে পাইলে তাহার পাপ্‌ড়ি পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ভিতরের পাপ্‌ড়ি ক্রমেই চওড়ায় ছোটো হইয়া আসিতেছে, এবং খুব ভিতরের পাপ্‌ড়িগুলির মাথায় এক-একটি পরাগ-স্থালী রহিয়াছে।

সুতরাং পাতা হইতে পাপ্‌ড়ি এবং পাপ্‌ড়ি হইতে কেশর তৈয়ারি হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না কি? বড় বড় পণ্ডিতরা আরো অনেক খোঁজ-খবর লইয়া এই কথাই বলেন।

ফল

ফুলের বীজাধার যখন পুষ্ট হয়, তখন তাহাকেই আমরা ফল বলি। বীজাধারের বীজাণুগুলি বীজ বা আঁঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বীজাধারের প্রাচীরই পুষ্ট হইয়া ফলের চেহারা পায়। তাই অধিকাংশ ফলেরই একটি করিয়া বহিরাবরণ থাকে। তাহাই আঁঠি বা বীজকে ঢাকিয়া রাখে।

তোমরা আম, জাম, তাল, নারিকেল, কাঁটাল, আতা, ভুট্টা প্রভৃতি কত রকমেরই ফল দেখিয়াছ। ইহাদের সকলের আকৃতি-প্রকৃতি কি সমান? আম ও জামের পাত্‌লা ছালের নীচে শাস থাকে। নারিকেলের ছাল ভয়ানক পুরু। ধান গম প্রভৃতিতে একটু ত রস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, রকম-রকম ফলে রকম-রকম প্রকৃতি দেখা যায়। তাই বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের জানাশুনা ফলগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। আমরা প্রথমে সেই কথাটি তোমাদিগকে বলিব।

মটর, অরহর, কাপাস, অপরাজিতা প্রভৃতি গাছের ফল তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পাকিলে এই সব ফলের আবরণ শুকাইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের ভিতরকার বীজগুলি ঝরিয়া মাটিতে পড়ে। এই ফলগুলিকে আমরা স্ফোটক (Dehiscent) নাম দিতেছি।

আম, জাম, পেয়ারা, তরমুজ প্রভৃতি ফল পাকিলে সেগুলি কাপাস বা মটর-ফলের মতো ফাটিয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকরা এই-সব ফলকে অস্ফোটক (Indehiscent) নম দিয়াছেন।

সুতরাং বলিতে হয়, ফলের মধ্যে স্ফোটক এবং অস্ফোটক এই দুইটি প্রধান ভাগ আছে।

স্ফোটক ফল

স্ফোটক ফল তোমরা কত দেখিয়াছ জানি না, আমরা কিন্তু এই শ্রেণীর অনেক ফল দেখিয়াছি এবং পরীক্ষা করিয়াছি। শুঁটি-ওয়ালা ফলের মধ্যে মটর, সীম, বাবলা-ফল প্রভৃতি যখন শুকাইয়া যায়, তখন সেগুলির দুই পাশই চিরিয়া যায়। তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য কর নাই। যখন ঐ-সব ফল পাকিবে, তখন দেখিয়ো। এই রকম ফলকে উভয়-স্ফোটী (Legume) নাম দেওয়া যাইতে পারে। ফলের দুই পাশই চিরিয়া যায় বলিয়া, এই নাম দেওয়া হইল।

গালফিরিঙ্গী বা বসন্ত-করবী, আকন্দ প্রভৃতি গাছেও শুঁটি হয় এবং পাকিলে সেগুলিও ফাটিয়া বীজ ছড়ায়। কিন্তু ইহাদের ফাটিবার প্রণালী মটর বা সীমের মতো নয়। এই-সব ফলের কেবল একটা পাশ চিরিয়া যায় এবং সেই এক পাশের ফাটাল দিয়া বীজ বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

কাজেই, এগুলিকে উভয়-স্ফোটী বলা যায় না। ইহাদিগকে বীজকোষী (Follilce) নাম দেওয়া যাইতে পারে।

দোপাটি, রেড়ি ভেরেণ্ডা, শেয়ালকাঁটা, ধুতুরা, লট্‌কন্‌, আমলকী, সর্ব্বজয়া, জারুল প্রভৃতি ফল পাকিলে শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। ইহা তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। সুতরাং এগুলিও স্ফোটক শ্রেণীর ফল,—কিন্তু উভয়-স্ফোটী বা বীজকোষীর দলের নয়। এই সব ফল অনেক কিঞ্জল্ক দিয়া প্রস্তুত। পাকিলে ইহাদের কিঞ্জল্কের জোড়ের মুখ জায়গায় জায়গায় চিরিয়া যায় এবং সেই ফাঁক দিয়া বীজ বাহির হয়। কিন্তু চিরিবার প্রণালী ইহাদের সব গুলিতে একই রকম দেখা যায় না।

শেয়ালকাঁটা

শেয়াল-কাঁটার ফল পাকিলে তাহার আগাগোড়া চিরিয়া যায় না,—উপরটা ফাঁক হয়। তার পরে ফলগুলি যখন বাতাসে হেলিতে-দুলিতেথাকে তখন সেই ফাঁকদিয়া বীজ মাটিতেপড়ে।

পপির ফলে এবং আফিঙের ফলে তোমরা মাথার গোড়ায় ছিদ্র দেখিতে পাইবে। সেই সব ছিদ্র দিয়া বীজ বাহিরে আসে। এই রকম ফলকে ছিদ্র-স্ফোটী নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আফিঙের ফল
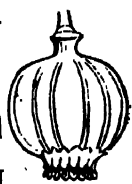
ধুতুরা, লটকন্ প্রভৃতি ফলের আগা-গোড়াই প্রায় চিরিয়া যাইতে দেখা যায়। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? এই রকম ফলকে পেটিকা নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ধোঁধল, ঝিঙে প্রভৃতি ফল কচি বেলায় সরস থাকে। তথাপি ইহাদিগকে স্ফোটক ফলের দলে ফেলিতে হয়। তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি বেশি পাকিলে পচিয়া যায়, কিন্তু ধোঁধল এবং ঝিঙে পাকিলে শুকাইয়া যায়। কাজেই, এগুলিকে এক রকম পেটিকা ফলই বলিতে হয়। ধোঁধলের বীজ ফল ফাটিলে বাহির হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? একটা শুক্‌না ধোঁধল লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহার ঠিক্ মাথার উপর হইতে একটি চাকি খুলিয়া গেলে ভিতরকার বীজ আপনিই বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।
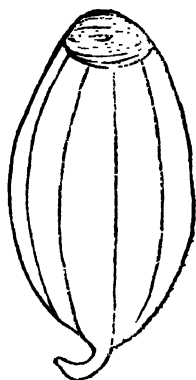
ধোঁধল

রাই, সরিষা প্রভৃতি গাছের শুক্‌না ফলকে সীমের জাতীয় বলিয়াই হয়ত তোমরা মনে কর। কিন্তু তাহা নয়। এগুলি একরকম পেটিকা ফল। ইহাদের বীজ সীমের

সরিষার শুঁটি

মতো বাহিরে আসে না। মূলা বা সরিষার শুক্‌না ফল পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, এগুলির শুঁটি বোঁটার দিক হইতে ফাটিয়া চিরিয়া যাইতেছে।

আমরা এখানে কয়েকটিমাত্র স্ফোটক ফলের কথা বলিলাম। বাগানে এবং নিকটের বন-জঙ্গলে খোঁজ করিয়ো ; এই শ্রেণীর আরো অনেক ফল তোমাদের নজরে পড়িবে।

অস্ফোটক ফল

যেগুলি পাকিলে ফাটিয়া যায় না, এ-রকম জানা-শুনা ফল যে কত আছে তাহার হিসাবই হয় না। আম, জাম, নারিকেল, সুপারি, বেগুন, কলা, কাঁটাল, আতা, তরমুজ প্রভৃতি ফল কখনই অপরাজিতা বা দোপাটির ফলের মতো ফাটিয়া বীজগুলিকে ছড়াইয়া ফেলে না। আবার ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যকেও আমরা ফাটিতে চটিতে দেখি না। কাজেই, ইহাদের সকলেই অস্ফোটক ফল।

বৈজ্ঞানিকরা অস্ফোটক ফলগুলিকে মোটামুটি বার্ত্তাকু (Berry), সাষ্ঠিক (Drupe) এবং এক-বীজক (Achene) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। আমরা একে একে প্রত্যেক শ্রেণীর ফলের কথা তোমাদিগকে বলিব।

নেবু, পেঁপে, আঙুর, বেগুন, দাড়িম, পেয়ারা, তরমুজ, উচ্ছে, টেপারি, শশা, কুমড়া প্রভৃতি ফল তোমরা সকলেই দেখিয়াছ এবং কাটিয়া খাইয়াছ। এই-সব ফলের ছাল প্রায়ই পুরু হয় না এবং তাহাদের প্রায় আগাগোড়াই শাঁসে

পূর্ণ দেখা যায়। এই শাঁসই আমাদের খাদ্য। এগুলির ভিতরে যে বীজ থাকে, তাহা আমরা ফেলিয়া দিই। এই সকল ফলকেই বার্ত্তাকু ফল বলা হয়। নানা ফলের মধ্যে কোন্‌গুলি বার্ত্তাকু, তোমরা এখন নিজেরাই চিনিয়া বলিতে পারিবে। ভিতরে বীজ এবং সরস শাঁস থাকাই বার্ত্তাকু ফলের প্রধান লক্ষণ।

বেগুন, পেয়ারা প্রভৃতি যে-সকল ফলের কথা আগে বলিয়াছি, তাহাদের সহিত আম, বাদাম, আখ্‌রোট্‌, কুল, হরীতকী, বহেড়া, প্রভৃতি ফলের তুলনা করিয়া দেখ। ইহাদের কতকগুলির ছাল ও শাঁস বার্ত্তাকু ফলের মতোই নরম এবং সরস, কিন্তু ভিতরে বীজ নাই। বীজের পরিবর্ত্তে আঁঠিই দেখা যায়। এই রকম ফলকেই সাষ্ঠিক অর্থাৎ আঁঠিওয়ালা ফল বলা হয়। জলপাই, পিচ্‌, তাল প্রভৃতি ফলও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু লিচু, জামরুল, বকুল, মহুয়া এবং জামকে এই দলের মধ্যে ফেলা যায় না। এ-গুলির ভিতরে আঁঠি থাকে না, কেবল বীজই থাকে। পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ইহাদের বীজের গায়ে বীজ-পথের চিহ্ন আছে। সুতরাং যে-সব ফলের মধ্যে বীজ নাই, কেবল আঁঠিই আছে, তাহারাই সাষ্ঠিক ফল।

নারিকেল একটি অদ্ভুত ফল। আমের ছাল ও শাঁস যেমন সরস, ইহার সে-রকম নয়। নারিকেলের সবই যেন শুক্‌না। শক্ত কাঠের মতো গোলাকার মালুইটাই ইহার

আঁঠি এবং ভিতরে যে শাঁস ও জল থাকে তাহাই বীজ। ঝুনো নারিকেলের ভিতরকার যে-জিনিসটাকে আমরা "ফোঁপল" বলি, তাহাই বীজাঙ্কুর। কাজেই, বলিতে হয়, নারিকেল আঁঠিওয়ালা ফল। তাই ইহাকে সাষ্ঠিকের দলেই ফেলিতে হয়। দুই একটি ছাড়া অধিকাংশ সাষ্ঠিক ফলেরই বহিরাবরণ সরস ও শাঁসালো হয়, ইহা তোমরা মনে রাখিয়ো।

যে দুই জাতীয় ফলের কথা বলা হইল, সেগুলিকে পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহাদের প্রত্যেকটির উপরে তিনটি করিয়া স্তর দেখিতে পাইবে। প্রথম স্তরে দেখা যায় ছাল বা খোসা (Epicarp), মাঝের স্তরে থাকে শাঁস (Mesocarp) এবং শেষের স্তরে থাকে বীজাবরণ। আমের খোসা এবং শাঁস বেশ সরস, কিন্তু বীজাবরণ শক্ত। নারিকেলের ছাল এবং মাঝের স্তর দুইটাই নীরস এবং বীজাবরণ কাঠের চেয়ে শক্ত। তোমরা নানা ফলে ঐ তিনটি স্তর নানা অবস্থায় দেখিতে পাইবে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ফল যেমন পাকিতে থাকে, ঐ স্তরগুলি বুঝি বীজ হইতে একে একে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা নহে, ফুলের মাতৃকেশরই পুষ্ট হইয়া ফলের ছাল, শাঁস এবং বীজাবরণের সৃষ্টি করে, কোনো নূতন জিনিস লইয়া ফলের উৎপত্তি হয় না।

অস্ফোটক ফলের দুই শ্রেণীর কথা বলা হইল। এখনো তৃতীয় শ্রেণীর ফলের কথা বলিতে বাকি আছে। তোমরা

গাঁদা, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি বহু-পুষ্পক ফুল দেখিয়াছ। কিন্তু ইহাদের এক একটা ফুলে যে শত শত পুষ্পক থাকে, সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়াছ কি না জানি না। তোমাদের বাগানের গাঁদা, সূর্য্যমুখী বা জিনিয়া ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া গেলে একটি ফুল ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহার অনেক পুষ্পকেরই নীচে এক-একটি লম্বা বীজ আছে। ইহাই ঐ-সব ফুলের ফল। কিন্তু এই ফলে একটুও রস থাকে না, থাকে কেবল এক-একটা বীজাবরণ। ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যও এই রকম নীরস ফল। এক-একটা বীজাবরণ ছাড়া এই সকল ফলে আর কিছু দেখা যায় না। এই রকম বীজাবরণে-ঢাকা নীরস ফলগুলিই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সব ফলের বীজই সর্ব্বস্ব—কিন্তু একটার বেশি বীজ ইহাদের কোনো ফলেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই এই সব ফলকে এক-বীজক নাম দেওয়া হইয়া থাকে।
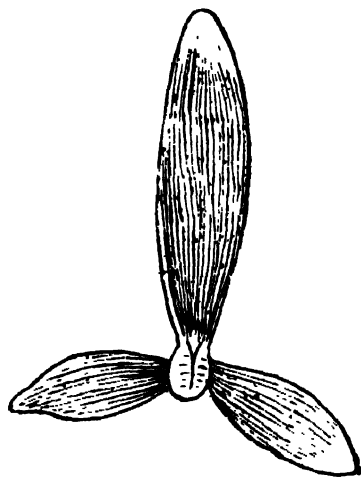
মাধবীলতার ফল

মাধবীলতার ফুল হইতে যে ফল হয়, তোমরা তাহা দেখিয়াছ কি? ইহা এক প্রকার এক-বীজক ফল। ইহার বীজাবরণই উপরের দিকে

বাড়িয়া তিনটি পাখ্‌নার সৃষ্টি করে। যখন শুক্‌না পাকা ফলগুলি গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, তখন ঐ পাখ্‌নায় বাতাস আট্‌কাইয়া যায়। ইহাতে ফলগুলি ঘুরপাক্ খাইতে খাইতে গাছ হইতে অনেক দূরে ছড়াইয়া পড়ে। শাল গাছের ফলও এক-বীজক। ইহাতেও মাধবীলতা ফলের মতো পাখ্‌না লাগানো থাকে।

পুঞ্জী ফল

তোমরা সর্ব্বদা যে-সব ফল দেখিতে পাও, তাহাদের কথা মোটামুটি বলিলাম। আনারস, কাঁটাল, মাদার, তুঁত, কদম, অশথ, বট, ডুমুর, আতা প্রভৃতি গাছে যে কিম্ভূতকিমাকার ফল হয়, এখন তাহাদেরি কথা তোমাদিগকে বলিব। এই সব ফলের চেহারা এবং ভিতরকার শাঁস এমন অদ্ভুত যে, সেগুলিকে বার্ত্তাকু বা সাষ্টিক এই দুই দলের মধ্যে কোন্‌টিতে ফেলিব, কিছুই বুঝা যায় না। একটা কাঁটাল বা আনারসকে তোমরা একটাই ফল বলিয়া মনে কর, কিন্তু এগুলি এক-একটা গোটা ফল নয়। ইহারা অনেক ফলের সমষ্টি। অনেকগুলি ছোটো ছোটো ফল মিলিয়া একটা আনারস বা একটা কাঁটালের উৎপত্তি বলিয়া এই সব ফলকে পুঞ্জী ফল বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে কাঁটাল, আনারস ও তুঁত ফলের কথা বলা যাউক। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, কাঁটাল গাছে এক-একটি

মঞ্জরী-পত্রে ঢাকা যে-সব "মুচি" ধরে, সেগুলি ফুলেরই মঞ্জরী। কাঁটালের একই গাছের কোনো মঞ্জরীতে কেবল ছোটো পিতৃফুলই আগাগোড়া সাজানো থাকে এবং কোনো মঞ্জরীতে কেবল মাতৃফুলই থাকে। পিতৃমঞ্জরীর ফুলের পরাগ যখন মাতৃফুলে আসিয়া পড়ে, তখন মাতৃমঞ্জরী পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। তোমরা কাঁটালের পিতৃমঞ্জরী দেখ নাই কি? এগুলিকে কাঁটালের মুচির আকারেই গাছে দেখা যায়। গায়ের ছোটো ছোটো পিতৃফুলগুলি ফুটিলেই এই সব মুচি ঝরিয়া পড়ে। এগুলিকে প্রায়ই আমাদের হাতের আঙুলের চেয়ে অধিক মোটা হইতে দেখা যায় না।

যাহা হউক, আমরা যাহাকে কাঁটাল বলি, তাহা মাতৃ-মঞ্জরীর শত শত বীজাধার পুষ্ট হইয়া এবং গায়ে গায়ে লাগিয়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং বলিতে হয়, কাঁটালের গায়ে যতগুলি কাঁটা থাকে, ফলও প্রায় ততগুলি থাকে। কাঁটাগুলিই কাঁটালের বীজাধারের চিহ্ন। ইহার আসল ফল থাকে ভিতরে কোষ ও চাঁপির আকারে। মাঝের মোটা অক্ষদণ্ড পুষ্পশাখা।

আনারসেও আমরা কাঁটালের মতই অবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু পিতৃফুলের মঞ্জরী এবং মাতৃফুলের মঞ্জরী আনারস গাছে পৃথক্ থাকে না। ইহার একই মঞ্জরীতে অনেক সম্পূর্ণ ফুল ফোটে। তার পরে পরাগ-পাতন হইলে যখন বীজাধার পুষ্ট হয়, তখন সেগুলি পরস্পর এমন জমাট

বাঁধিয়া যায় যে, শেষে সমস্ত জিনিসটাকে একটা ফল বলিয়াই ভুল হয়। আনারসের এক-এটা চোখই এক-একটা ফল।

আতার ফুল তোমরা দেখিয়াছ কি? জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন আতা গাছে ফুল ধরিবে, তখন আতসী কাছ দিয়া ইহার ফুল পরীক্ষা করিয়ো। আতার ফুলের নীচে কুণ্ড থাকে। তা'ছাড়া তিনটি মোটা পাপ্‌ড়ি এবং মোচার আকারে সাজানো অনেক পিতৃকেশর ও মাতৃকেশরও দেখা যায়। পিতৃকেশর থাকে চূড়ায়, এবং মাতৃকেশর থাকে তলায়। ফুল ফুটিলে পিতৃকেশরের পরাগ পাইয়া মাতৃকেশরের বীজাধার পুষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু বীজাধারগুলি এত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সাজানো থাকে যে, সেগুলি এক-একটি পৃথক্ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। কাজেই, আতা ফল অনেক ছোটো ফলের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

চাঁপা ফুলের কেশর-বিন্যাস কতকটা আতা ফুলেরই মতো। আতার মতোই চাঁপার এক ফুলে অনেক মাতৃ-কেশর সাজানো থাকে। তাই চাঁপার ফল একত্র অনেকগুলি দেখা যায়। কিন্তু আতার ফলের মতো সেগুলি গায়ে-গায়ে লাগিয়া একটি ফল হইয়া দাঁড়ায় না। এই জন্য চাঁপা ও আতার ফুলের মধ্যে কতকটা মিল থাকিলেও, তাহাদের ফলের মধ্যে মিল নাই। চাঁপার ফলকে পুঞ্জী ফল বলা যায় না।

ডুমুরের ফুল তোমরা দেখিয়াছ কি? ডুমুর ফুল দেখিলে রাজা হওয়া যায়। তাই মনে হইতেছে; তোমরা এখনো উহা

দেখ নাই। কিন্তু আমরা অনেকবার এই ফুল কাটিয়া কুটিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। তোমরা ডুমুরের ফুল পরীক্ষা করিয়ো, উহা বড় আশ্চর্য্য জিনিস। বট-অশথের ফুলও ডুমুর ফুলের জাতীয়।

তোমরা গাছে যে থোলো-থোলো ডুমুর দেখিতে পাও, সেগুলি ডুমুরের ফল নয়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সেগুলি ফুলের কুঁড়ি,—কিন্তু তাহাও নয়। যাহাকে তোমরা ডুমুরের ফল বল, তাহা উহার পুষ্পাধার। পুষ্পাধারের কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। যাহার উপরে অনেক পুষ্পক অর্থাৎ ছোটো ফুল সাজানো থাকে, তাহাকেই বলা হয় পুষ্পাধার। সূর্য্যমুখী ফুলের তলায় যে গোলাকার চাকা থাকে, তাহাই উহার পুষ্পাধার। যাহাকে আমরা ডুমুরের ফল বলি, তাহা ডুমুরের ফুলের পুষ্পাধার। কিন্তু সূর্য্যমুখীর পুষ্পক যেমন পুষ্পাধারের উপরে সাজানো থাকে, ডুমুর-ফুল সে-রকমে সাজানো থাকে না। ডুমুরের ফুল থাকে, পুষ্পাধারের ভিতরে লুকানো। সূর্য্যমুখীর পুষ্পাধারকে যদি কেহ উল্‌টাইয়া মুড়িয়া একটা বলের মতো গোলাকার জিনিস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহার ছোটো ছোটো ফুলগুলি বলের ভিতরে থাকিয়া যায় না কি? ডুমুর, অশথ, বট প্রভৃতির পুষ্পাধার ঐ-রকমে বলের মতো পিণ্ডাকার করা থাকে বলিয়াই, ইহাদের ফুলগুলিকে পুষ্পাধারের বাহিরে দেখা যায় না।

তোমরা একটি ডুমুর ছুরি দিয়া চিরিয়া পরীক্ষা করিয়ো;

দেখিবে, তাহার ভিতরে শত শত ছোটো ফুল সাজানো রহিয়াছে। বাহির হইতে এই সব ফুল দেখা যায় না বলিয়া লোকে বলে, ডুমুরের ফুল হয় না।

ডুমুরকে চিরিলে যে-রকমটি দেখায়, এখানে তাহারি একটি ছবি দিলাম। ভিতরকার শুঁয়ো-শুঁয়ো অংশগুলিই ইহার ফুল। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ ফুল নয়। ইহাদের কতকগুলি পিতৃফুল এবং কতকগুলি মাতৃ-ফুল। তোমরা যদি আতসী কাচ লইয়া একটা আধ-পাকা ডুমুর বা বটের ফল পরীক্ষা কর, তবে ইহার ভিতরে বোঁটার গোড়ায় মাতৃফুল এবং মাথার কাছে পিতৃফুল সাজানো দেখিবে। এই সব ফুলে কেশর, পাপ্‌ড়ি প্রভৃতি সকল অঙ্গই থাকে।

ডুমুর ফুল

পিতৃফুলের পরাগ মাতৃফুলে বহিয়া লইবার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহা না হইলে ফুলে ফল ধরে না। বাতাস, মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গেরা পরাগ-বহনের কাজ করে, ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। ডুমুরের ভিতরকার ছোটো ছোটো ফুলে যে রকমে পরাগ-

পাতন হয়, তাহা বড় মজার। তোমরা একটা লাল রঙের বটের ফুল বা ডুমুর লইয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহার ঠিক মাথার উপরে একটি ছিদ্র আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন কোনো পোকা ফলের মাথায় ছিদ্র করিয়াছে। কিন্তু তাহা নয়, এই ছিদ্র কচি বেলা হইতেই থাকে এবং ফল যত বড় হয়, ততই উহা ফাঁক হয়। এই ছিদ্রই পতঙ্গদের প্রবেশ-পথ। ডানা-ওয়ালা একরকম পোকা ফলের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভিতরে থাকিয়াই পিতৃফুলের পরাগ গায়ে মাখিয়া মাতৃফুলে লাগাইয়া দেয়।

বড় মজার ব্যাপার নয় কি ? ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, তাই ঐ উপায়ে পতঙ্গদের ডাকিয়া আনিয়া কত কৌশলে পরাগ-পাতন করা হয়। এই সব দেখিলে শুনিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তোমরা একটা পাকা বট বা ডুমুরের ফল চিরিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; ভিতরে ঐ-সব পরাগ-বাহক পোকা দেখিতে পাইবে এবং সেখানে ছোটো ছোটো ফুল হইতে যে সরিষার চেয়েও ছোটো বীজ-ওয়ালা যে-সব ফল জন্মে, তাহাও দেখিবে। আমরা ছেলেবেলায় পাকা বটের ফলের ভিতরে ঐ-রকম অনেক পোকা দেখিয়াছি এবং দেখিয়া ভাবিয়াছি, ফল পাকিয়া নষ্ট হইয়াছে,—তাই বুঝি এত পোকা। তোমরাও বোধ হয় তাহাই মনে কর। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়। পরাগ-বহনের জন্যই ঐসব পোকাকে বটের ফল ও ডুমুরের ভিতরে ডাকিয়া আনা হয়।

গাছের বংশ-বিস্তার

তোমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে যতগুলি আম খাইয়াছ, তাহাদের আঁঠি যদি উঠানের ছ'হাত জমিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখ, তবে আষাঢ় মাসে সেগুলি হইতে চারা বাহির হইবে। কিন্তু সেই ঘেঁসাঘেঁসিতে একটি চারাও বেশি দিন বাঁচিবে না। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? তাই আমের বাগান করিতে হইলে, আঁঠিগুলিকে কুড়ি-পঁচিশ হাত অন্তর পুঁতিতে হয়। ইহাতে তাহারা ডাল-পালা এবং শিকড় ছড়াইবার জায়গা পায় এবং মাটির তলায় অনেক খাবার পাইয়া তাড়াতাড়ি বড় হয়।

তোমাদের বাগানের জামগাছ-তলায় বীজ হইতে কত জামের চারাই বাহির হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? কিন্তু গাছের আওতায়, আলো ও খাদ্যের অভাবে সেগুলির একটিও বাঁচে না। তাই বাগানে নূতন জামের গাছ তৈয়ারি করিতে হইলে গাছতলার ছোটো চারাগুলিকে দূরের ফাঁকা জায়গায় পুঁতিতে হয়। এই-রকমে পোঁতা গাছই ক্রমে বড় হয় এবং তাহাতে ফল ধরে।

মানুষ বুদ্ধিমান্ প্রাণী, তাই তাহারা ফাঁক ফাঁক করিয়া চারা পুঁতিয়া বাগান তৈয়ারি করে। যেখানে জনপ্রাণীর বসতি নাই, এমন জায়গার বনে কি-রকমে গাছের বীজ চারি-

দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং হাজার হাজার নূতন গাছ জন্মায়, তাহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? গাছের বংশ-বিস্তারের জন্য সেখানে মানুষের বুদ্ধির দরকারই হয় না। গাছের জ্ঞান-বুদ্ধি নাই এবং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবারও শক্তি নাই। তাই জল, বাতাস, পশু, পাখী সকলেই নানা রকমে উহাদের বংশ-বিস্তারের সাহায্য করে।

গাছের বংশ-বিস্তারের প্রণালীর কথাই এখন তোমা-দিগকে বলিব।

মনে কর, তুমি নীচে দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমার বন্ধু ছাদের উপরে আছে। এখন তোমার হাতে যে ক্রিকেট বল্‌টি আছে, তাহা তোমার বন্ধুর কাছে দেওয়া দরকার। এই অবস্থায় তুমি কি কর? সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বল্‌টিকে তোমার বন্ধুর হাতে দিয়া আস কি? কখনই তাহা কর না। তুমি নীচে দাঁড়াইয়া বল্‌টিকে উপরে ছুঁড়িয়া দাও এবং বন্ধু তাহা লুফিয়া লয়। নানা গাছের ফলে এই-রকমে বীজ ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিবার ব্যবস্থা আছে। আমরুল ও দোপাটির যে ফল হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পাকিলে এই-সব ফলকে আস্তে আস্তে লইয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র সেগুলির ভিতরকার বীজ ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িবে। বীজগুলি যাহাতে গাছের তলায় আওতায় পড়িয়া নষ্ট না হয়, তাহারি জন্য এই সব গাছে বীজ ছুঁড়িয়া ফেলিবার এই রকম ব্যবস্থা আছে।

আমরা কেবল আমরুল ও দোপাটির ফলের কথা বলিলাম, খোঁজ করিলে তোমরা অনেক শুঁটি-ওয়ালা গাছকেই ঐরকমে বীজ ছুঁড়িতে দেখিবে। অপরাজিতার শুক্‌না পাকা ফল ফট্‌-ফট্‌ শব্দে ফাটিয়া যায় এবং তাহার বীজগুলি দুই তিন হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাই বাগানে একটি অপরাজিতা গাছ থাকিলে, যেখানে-সেখানে তাহার চারা বাহির হইতে দেখা যায়।
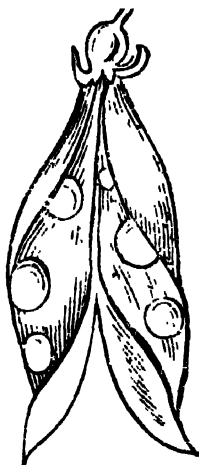
পট্‌-পটে ফল তোমরা দেখ নাই কি? ছেলে বেলায় ঝোপ-জঙ্গল হইতে তাহার যবের মতো ছোটো লম্বা লম্বা ফল যে কত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার হিসাবই হয় না। তার পরে ফলের উপরে একটু জলের ছিটা দিয়াছি,—অমনি ফলগুলি ফট্‌-ফট্‌ করিয়া ফাটিয়া চারিদিকে বীজ ছড়াইয়াছে।

আকন্দ, কাপাস, শিমূল প্রভৃতির বীজ যাহাতে গাছ হইতে দূরে যায়, তাহার জন্য যে কি ব্যবস্থা আছে, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। এ-সব বীজের কাহারো গায়ে, কাহারো মাথায় তূলা লাগানো থাকে। তূলা খুব পাতলা জিনিস। তাই বাতাস লাগিলে উহা এক জায়গায় স্থির থাকে না। কাজেই, কাপাস, আকন্দ প্রভৃতির বীজ

উড়িতে উড়িতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। মাথায় তূলার ঝুঁটি-ওয়ালা আকন্দের এবং মধুমালতীর (Rangoon Creeper) বীজকে আমরা এক ক্রোশ দূরে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। করবী ও মালতী ফুলের গাছে যে লম্বা লম্বা শুঁটি হয়, তাহার ভিতরকার বীজগুলিকে তোমরা ঝুঁটি-লাগানো দেখিতে পাইবে। সূর্য্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি বহুপুষ্পক গাছের পুষ্পক-গুলিতে ঝুঁটির বদলে, কাগজের চেয়েও পাতলা এক-একটা অংশ জোড়া থাকে, তাহাই বাতাসে উড়িয়া বীজগুলিকে দূরে ছড়াইয়া দেয়।

শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখ্‌নার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। শালের ফলে পাঁচটা ও মাধবীলতার ফলে তিনটা পাখ্‌না লাগানো থাকে। শালের ফলকে দেখিলেই মনে হয়, যেন সেটি ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলার পালক-লাগানো বল্। শুক্‌না ফলগুলি গাছ হইতে ঝরিয়া কখনই গাছ তলার ছায়ায় পড়ে না—চাকার মতো বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেগুলি প্রায় আট দশ হাত তফাতে আসিয়া নামে। আমরা এই সব ফলের পাখ্‌না
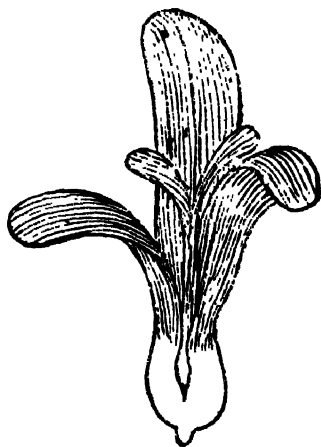
শালের ফুল

কাটিয়া উঁচু হইতে ফেলিয়া দেখিয়াছি, এই অবস্থায় ফলগুলি

কখনই দূরে ছড়াইয়া পড়ে না। সুতরাং বলিতে হয়, শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখ্ নাই, ফলগুলিকে ছড়াইয়া ফেলে।

পানিফলের গায়ে যে তুইটি ধারালো কাঁটা লাগানো থাকে, তাহা কোন্ কাজে লাগে, তোমরা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখ নাই। এই গাছ জলের তলায় পাঁকে জন্মে। ডাঙায় বা জলের তলাকার বেলে মাটিতে ইহারা বাঁচে না। বড় বড় মহাজনী নৌকায় যে-সব নোঙর থাকে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? নদীর কিনারায় নৌকা বাঁধিতে হইলে, মাঝিরা নোঙর জলে ফেলিয়া দেয়। ইহা কাদায় আট্কাইয়া গেলে, স্রোতের টানে নৌকা দূরে যাইতে পারে না। পানিফলের কাঁটা তুইটি নোঙরেরই কাজ করে। জলের তলায় পাঁক পড়িলেই উহা পাঁকে ডুবিয়া যায়, কিন্তু জমাট বালি মাটিতে ডুবে না। কাজেই, পানিফল স্রোতের টানে দূরে না গিয়া, পাঁকের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পায়।

ফল ও বীজ যেমন বাতাসে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি সেগুলি জলের স্রোতেও দূরে ভাসিয়া যায়। ইহা তোমরা দেখি নাই কি? শুক্না পাকা নারিকেল ও সুপারির গায়ে পুরু ছোব্ড়া থাকে এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস থাকে। তাই জলে পড়িলেই এই সব ফল ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রের ধারের গাছ হইতে যে নারিকেলগুলি জলে পড়ে, তাহা অনেক সময়ে এই রকমে জলে ভাসিয়া এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গিয়া হাজির হয় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন

গাছের উৎপত্তি করে। পিটুলি ও কল্‌কে ফুলের গাছ খাল বিল ও নদীর ধারেই বেশি হয় এবং ইহাদের পাকা ফল প্রায়ই জলে ঝরিয়া পড়ে। এগুলিও নারিকেলের মতো ভাসিয়া দূরে নূতন গাছের সৃষ্টি করে। একটু লক্ষ্য করিলে তোমরা আরো অনেক গাছের ফলকে এই-রকমে ভাসিয়া দূরে যাইতে দেখিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের বাগানে যে-সব হল্‌দে, সিঁদুরে রঙের পাকা আম ও লাল টক্‌টকে লিচু গাছে গাছে ঝুলিয়া থাকে, তাহাদের এমন সুন্দর রঙ্‌ কেন হয়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই সব ফল ভয়ানক ভারি, কাজেই বাতাসে সেগুলিকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না, বীজ ছড়াইবার জন্য পশুপক্ষী ও মানুষের সাহায্যের দরকার হয়। পাখী, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীরা সুন্দর রঙ্‌ দেখিয়া এই সব ফলের কাছে যায় এবং তার পরে ঠোকর মারিয়া যখন ইহাদের শাঁসের স্বাদ বুঝিতে পারে, তখন তাহা পেট ভরিয়া খায় এবং শেষে আধ-খাওয়া ফল মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। এই-রকমে নানা জন্তু-জানোয়ারের সাহায্যে আম, জাম, লিচু, বট, অশথ, পেয়ারা, বাদাম, কুল, নেবু, সুপারি, তেলাকুচা, লঙ্কা, নিম, বকুল প্রভৃতি কত গাছেরই ফল ও বীজ যে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না।

তালের ফল প্রকাণ্ড বড়, তাই পাখী, ইঁদুর বা কাঠ-বিড়ালীতে ইহাকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না। ভাদ্র

মাসের পাকা তাল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িলেই গরু-বাছুরেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহা খায় এবং আঁশ-ওয়ালা আঁঠিগুলির ঝুঁটি মুখে করিয়া দূরে ছড়াইয়া ফেলে।

সুতরাং দেখ, ফলের সুন্দর রঙ্ এবং সুমিষ্ট শাঁস তোমার বা আমার জন্য নয়। পশুপক্ষীদের ডাকিয়া আনিবার জন্যই ফলে এমন রঙের চটক্ এবং সুস্বাদ থাকে।

পেয়ারা, অশথ, বট, নিম প্রভৃতি ফলের বীজের উপরকার ছাল ভয়ানক শক্ত। পাখী বা অপর জন্তুরা এই সব বীজ গিলিয়া হজম করিতে পারে না। কাজেই, মলের সঙ্গে সেগুলি যেখানে পড়ে, সেখানেই অঙ্কুরিত হয়। এই-রকমে পাকা প্রাচীরের ফাটালে, এমন কি দোতলা-তেতলা পাকা বাড়ীর মাথায় এবং মন্দিরের চূড়ায় আমরা বট, অশথ, নিম প্রভৃতি গাছকে জন্মিতে দেখিতে পাই।

কুঁচের বীজগুলি কেমন সুন্দর, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন তুলি দিয়া তাহার মাথাগুলিতে কালো রঙ্ এবং নীচেতে সিঁদুরের রঙ্ লাগাইয়া পালিশ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ভিতরের শাঁস একটুও মিষ্ট নয়। তার পরে উপরকার ছাল এত শক্ত যে, দাঁত দিয়াও চিবানো যায় না। এ-রকম বীজে এত রঙের বাহার কেন? বীজগুলি যাহাতে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, ইহা তাহারি আর এক ফন্দি।

কুঁচের শুঁটি পাকিলে তাহা কি-রকমে ফাটিয়া যায়,

তোমরা তাহা দেখ নাই কি? ইহার একদিকের জোড়ের মুখ চিরিয়া ফাঁক হইয়া যায়, কিন্তু সেই ফাঁক দিয়া কুঁচগুলি মাটিতে ঝরিয়া পড়ে না। পাখীরা শুঁটির উপরে লাল টুক্‌টুকে কুঁচগুলিকে সাজানো দেখিয়া সেগুলিকে খাইয়া ফেলে, কিন্তু হজম করিতে পারে না। তার পরে সেগুলি যেখানে পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে, সেখানেই তাহাদের চারা হয়।

লট্‌কন্ গাছ তোমরা হয়ত দেখিয়াছ এবং তাহার বীজ দিয়া কাপড় রঙ্ করিয়াছ। এগুলিও শুঁটি হইতে ঝরিয়া পড়ে না। বোকা পাখীরা লট্‌কনের রাঙা বীজগুলিকে উপাদেয় খাদ্য ভাবিয়া গিলিয়া ফেলে। তার পরে শরীর হইতে বাহির হইলে সেই বীজেই নূতন গাছ জন্মিতে থাকে।

পাখীরা ছোটো পোকামাকড় খাইতে ভালোবাসে। বৃষ্টির পরে মাঠে পোকা উড়িলে, কত কাক, কত শালিক, কত ফিঙে, পোকা ধরিবার জন্য মাঠে কিচিমিচি সুরু করে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। গরমের দিনে ঠাণ্ডা পাইলেই পোকা বাহির হয়, তাহা পাখীরা জানে। তাই পোকা শিকারের জন্য উহাদের এত চীৎকার। শুক্‌না গাঁদা ফুলে যে ছোটো ছোটো বীজ থাকে, দেখিলেই মনে হয় সেগুলি যেন এক-একটা ফড়িং। পাখীরা তাহাই ভাবে এবং বীজগুলিকে ঠোঁটে লইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

ঘাসের যে ফলগুলিকে আমরা ভাঁটুই এবং চোর-কাঁটা বলি তাহা দেখিয়াছ কি? এই ঘাসের মধ্য দিয়া গেলেই কাপড়ে

চোর-কাঁটা ফুটিয়া যায়। সেগুলিতে ছুঁচের মতো সরু শুঁয়ো লাগানো থাকে। কাপড়ে লাগিলে সেগুলিকে যতক্ষণ ছাড়ানো না যায়, ততক্ষণ কাঁটার খোঁচা সহ্য করিতে হয়। গায়ের লোমে আট্‌কাইলে গরু, ভেড়া ছাগল প্রভৃতি জন্তুরাও চোর-কাঁটার খুব খোঁচা খায়। কাজেই, তখন উহারা দূরে পালাইয়া গা ঝাড়া দিয়া সেগুলিকে ছিট্‌কাইয়া ফেলে। তাহা হইলে দেখ. চোর-কাঁটা প্রভৃতির ছুঁচের মতো হুলগুলিও তাহাদের বংশবিস্তারের জন্য।

যাহারা পশুপক্ষীদের গায়ে আট্‌কাইয়া বংশবিস্তার করে সে-রকম ফল যে আরো কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না। আপাং অর্থাৎ চিড়্‌চিড়ের পাকা ফল কাপড়ে আট্‌কাইয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? গরু-বাছুরের গায়েও আমরা এগুলিকে আট্‌কাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

পুকুর বা খালের ধারে যে চিরুণী ফলের গাছ হয়, তোমরা হয়ত তাহা দেখিয়াছ। এই গোল গোল ফলের গায়ে কাঁটা বসানো থাকে। আমরা ছেলে বেলায় এই ফল দিয়া মাথা আঁচ্‌ড়াইতাম। এগুলিও গরু-বাছুরের গায়ে লাগিয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

জলের ছিটে পাইলে আপনিই গড়াইতে গড়াইতে দূরে চলিয়া যায়, এ-রকম ফল তোমরা দেখ নাই কি? বোধ হয় লক্ষ্য কর নাই। এক-রকম ঘাসের ফলে ইহা দেখা যায়। এই ফলের মাথায় এক-একটা ঢেউ-খেলানো আঁকা-বাঁকা

শুঁয়ো লাগানো থাকে। শিশির বা বৃষ্টির ছিটা পাইলে সেই বাঁকানো শুঁয়ো যেমনি সোজা হইতে চায়, অমনি তাহা গড়াগড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই-রকমে এই ঘাসের ফলগুলি ক্রমে চারি পাঁচ হাত তফাতেও ছড়াইয়া পড়ে।

এক টুক্‌রা কাগজকে বাতাসে ছাড়িয়া দিলে, তাহা কি রকম ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। জঙ্গলের অনেক গাছের বীজের চারিদিকে কাগজের চেয়েও পাত্‌লা ডানা জোড়া থাকে। এই সব বীজ গাছ হইতে খসিয়া পড়িলে, কাগজের টুক্‌রার মতো বাতাসে ভাসিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে। তোমরা চুকো-পালঙের ফলে ও সজিনার বীজে ঐ-রকম ডানা লাগানো দেখিতে পাইবে। বাতাস আট্‌কাইয়া সেগুলি যাহাতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা।

গোবরে-পোকা পাখীদের উপাদেয় খাদ্য। রেড়ি ভেরেণ্ডা এবং নাটা ফলের দাগ-কাটা শক্ত বীজগুলি যখন মাটিতে পড়িয়া থাকে, তখন মনে হয় যেন এক-একটা গোবরে-পোকা মাটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। পাখীরা কখনো কখনো এগুলিকে পোকা ভাবিয়াই পরম আনন্দে ঠোঁটে করিয়া দূরে লইয়া যায় এবং তার পরে যখন দেখে সেগুলি পোকা নয়, তখন ফেলিয়া দেয়। এই রকমের কতকগুলি গাছের বংশ অনেক দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

আঠা-লাগানো বীজ তোমরা দেখ নাই কি? বেল

পরগাছা জাতীয় বাঁদ্‌রা, চাল্‌তা এবং সোঁদালের বীজে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। বেলের খোলা পুরু, তাই পাখীরা গাছ হইতে ইহা খাইতে পারে না। বেল পাকিয়া মাটিতে পড়িলেই চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায়। তার পরে গরু-বাছুর ও পাখীরা যখন সেই ভাঙ্গা বেল খাইতে আরম্ভ করে, তখন আঠাওয়ালা বীজগুলি তাহাদের গায়ে-মুখে লাগিয়া যায়। শেষে সেগুলি শরীর হইতে যেখানে ঝরিয়া পড়ে সেখানেই তাহাদের গাছ হয়। সোঁদালের লম্বা লম্বা সুঁটির মধ্যে যে কালো রঙের আঠালো শাঁস থাকে তাহার মিষ্ট স্বাদ আছে। ইহার বীজও ঠিক ঐ-রকমে গরু-বাছুর এবং পাখীতে ছড়াইয়া ফেলে। মান্দা অর্থাৎ বাঁদ্‌রার ফলে শাঁস ভয়ানক আঠালো কিন্তু সুমিষ্ট। তোমাদের বাগানের বুড়ো আমগাছের ডালে খোঁজ করিলেই, বাঁদ্‌রার গাছ দুই চারিটি দেখিতে পাইবে। পাখীরা ইহার ফল খাইতে খুব ভালবাসে। খাইবার সময়ে যে-সব বীজ ঠোঁটে ও মুখে লাগিয়া যায়, ঠোঁট ঘসিবার সময়ে তাহারা সেগুলিকে অন্য গাছের ডালে লাগাইয়া দেয়। এই রকমে বাঁদ্‌রার বীজ এক গাছ হইতে অন্য গাছে গিয়া সেখানে বংশ-বিস্তার সুরু করে।

যখন দেশে লোকসংখ্যা অধিক হয় তখন দেশে বাসের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই অবস্থায় তাহারা ঘর-বাড়ী করিবার জায়গা পায় না এবং দেশে যে-খাদ্য জন্মে তাহাতে পেট ভরে না। তাই তাহারা আপন দেশ ছাড়িয়া পালায়

এবং যে-দেশে অনেক জমি আছে অথচ বেশি লোক-জন নাই সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর যে-সব জায়গায় লোকের বাস ছিল না, এই রকমে সেখানে বিদেশী লোক বহু পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে। গাছপালারা মানুষের মত জাহাজে চড়িয়া বা রেলে চাপিয়া বিদেশে বাস করিতে যাইতে পারে না। এই কারণে চারিদিকে ছড়াইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্যই উহাদের ফলে পূর্ব্বোক্ত নানা ব্যবস্থা থাকে।

বীজের অঙ্কুর

মটর ছোলা বা সরিষার বীজ ভিজা মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেই কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি হইতে শিকড় এবং পাতা বাহির হয়। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কেবল ছোলা-মটরেরই যে এ-রকম হয়, তাহা নয়। আম, কাঁটাল, তাল, জাম, বকুল প্রভৃতি অনেক গাছেরই বীজ হইতে ঐ রকমে চারা বাহির হয়। কি-রকমে বীজ হইতে চারা বাহির হয়, তোমাদিগকে এখানে সেই কথা বলিব। কিন্তু সে-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ।

ছোলা, মটর, আম, কাঁটাল প্রভৃতির প্রথমে দু'টা করিয়া পাতা বাহির হয়, এইজন্য এ-সব গাছকে দ্বি-বীজপত্রী নাম দিয়াছিলাম। ধান, গম, যব, তাল, খেজুর ইত্যাদির বীজ হইতে প্রথমে একটা করিয়া পাতা বাহির হয়। তাই ইহাদিগকে এক-বীজপত্রী নাম দেওয়া হইয়াছিল।

তেঁতুল, সীম প্রভৃতির বীজ হইতে চারা বাহির হইলে বীজের যে দুইটা অংশ চারার গায়ে দু'পাশে লাগানো

থাকে, তাহাই বীজ-পত্র। কিন্তু সকল গাছে এ-রকম বীজপত্র দেখা যায় না। মটরের বীজপত্র দুটি ঐ-রকমে চারার উপরে লাগানো থাকে না। সেগুলি মাটির তলাতেই থাকে। মটরের কয়েকটি চারা তৈয়ারি করিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের বীজপত্র তেঁতুল বা সীমের বীজপত্রের মতো গাছের উপরে লাগানো নাই। আমের বীজপত্র তোমরা দেখিয়াছ কি? আঁঠির ভিতরে যে দুটি কুশী থাকে, তাহাই উহার বীজপত্র। এই বীজপত্রও মাটির উপরে উঠে না। কুমড়া, লাউ, শশা প্রভৃতির বীজপত্র তোমরা ত সকলেই দেখিয়াছ। বীজের শাঁসে যে দুইটি পাত্‌লা ডালের মতো অংশ থাকে তাহাই উহাদের বীজপত্র। চারা গাছে এই দুইটিই প্রথম পাতার আকারে অঙ্কুরে দেখা যায়। প্রথমে ইহাদের রঙ্‌ শাদা থাকে, তার পরে আলো পাইলে সেই রঙ্‌ সবুজ হইয়া দাঁড়ায়। তোমাদিগকে আগেই

তেঁতুলের চারার বীজপত্র

বলিয়াছি, মায়ের দুধ শিশু প্রাণীদের যে উপকার করে, বীজ-পত্রগুলি ছোটো গাছেরও ঠিক্ সেই উপকারই করে। তাই
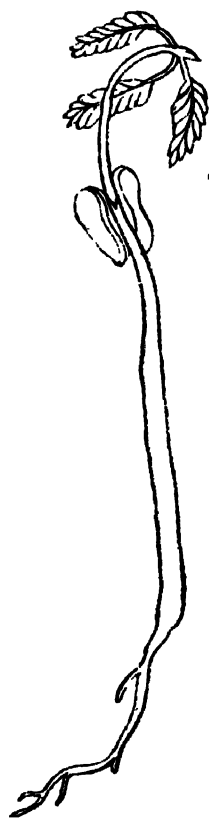
অনেক গাছেরই বীজপত্র খুব মোটা এবং তাহাতে অনেক

মটরের বীজপত্র ও তাহার গুঁড়ির অঙ্কুর

শ্বেতসার জমা থাকে। বীজের ভিতরকার পাতা ও গুঁড়ির অঙ্কুর এই খাবার খাইয়াই বড় হয়।
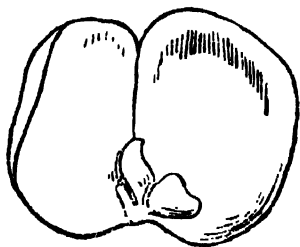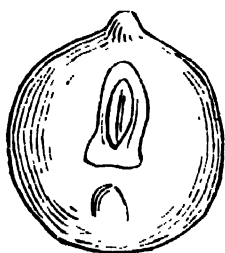
যাহাদের বীজপত্র খুব পাত্‌লা, এ-রকম গাছও অনেক আছে। রেড়ি-ভেরেণ্ডার বীজ হইতে যখন চারা বাহির হইবে, তখন তাহাতে তোমরা পাত্‌লা বীজপত্র দেখিতে পাইবে। ইহারা বীজপত্র হইতে খাবার খায় না। বীজের মধ্যেই শাঁসের আকারে খাদ্য জমা থাকে, তাহা খাইয়াই ইহাদের অঙ্কুর-গুলি বড় হয়।

রেড়ি ভেরেণ্ডার বীজ

ভুট্টা, গম, যব, ধান, খেজুর প্রভৃতির প্রথমে একটি করিয়া বীজপত্র বাহির হয়। তাই এই সব গাছকে এক-বীজপত্রী নাম দেওয়া হয়। ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। এক-বীজপত্রী গাছের প্রথম পাতা পুরু হয় না। শিশু অঙ্কুর-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে খাদ্যের দরকার হয়, তাই বীজের মধ্যে শাঁসের আকারেই জমা থাকে। ধান হইতে আমরা যে চাল পাই এবং গম গুঁড়া করিয়া যে ময়দা প্রস্তুত করি, তাহাই অঙ্কুরের খাদ্য।

অপুষ্পক গাছ

আমরা এপর্য্যন্ত যে-সব গাছের কথা বলিলাম, তাহাদের ফুল হয়, ফল হয় এবং ফলে বীজ হয়। তার পরে সেই বীজ নানা উপায়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে নূতন গাছ হয়। কিন্তু এ-রকম গাছও অনেক আছে, যাহাদের ফুল হয় না এবং ফলও হয় না। তোমরা বোধ হয়, এ-রকম গাছ লক্ষ্য কর নাই। কিন্তু পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষ রকমের অপুষ্পক গাছ আছে। আমাদের চারিদিকেই এই গাছ রহিয়াছে। পচা জিনিসে যে সাদা সাদা ছাতা ধরে, তাহা খুব ছোটো অপুষ্পক গাছ। ব্যাঙের ছাতাকে তোমরা কি মনে কর, জানি না। আমরা ছেলে বেলায় ভাবিতাম,

ফার্ণ

ব্যাঙেরাই বুঝি কোনো রকমে ছাতার সৃষ্টি করিয়া তাহার তলায় বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নয়, ব্যাঙের ছাতাও

এক রকম অপুষ্পক গাছ। তোমাদের পুকুর ও বিলের জলের উপরে কত পানা এবং কত শেওলা ভাসিয়া বেড়ায়, দেখ নাই কি? গ্রীষ্মকালে এক এক সময়ে সমস্ত জল যেন পানায় সবুজ হইয়া যায়। লোকে ইহাকে সিদ্ধিও বলে। যাহাতে জলের উপরে এই রকম সবুজ সর পড়ে, তাহাও এক রকম অপুষ্পক ছোটো উদ্ভিদ্। ভিজে জায়গায়, দেওয়ালের গায়ে বা পুকুরের পাড়ে, যে-সব রকম রকম পাতা-ওয়ালা ফার্ণ গাছ হয়, সেগুলিও অপুষ্পক উদ্ভিদ্। তোমরা যদি দারজিলিং বা অন্য কোনো পাহাড়ে জায়গায় বেড়াইতে যাও, তবে সেখানে গাছের গায়ে, পাথরের উপরে নানা রকম ফার্ণ দেখিতে পাইবে।

ফুল, ফল এবং বীজ উৎপন্ন করিয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করিতে পারিলেই, গাছদের জীবনের কাজ শেষ হয়। তাই অনেক গাছই একবার মাত্র ফুল, ফল এবং বীজ উৎপন্ন করিয়াই মরিয়া যায়। অপুষ্পক গাছদের ফুল হয় না, কাজেই, ফলও হয় না। তাই ইহাদের চারা উৎপন্ন করিবার মজার মজার উপায় আছে।

ফার্ণ

আমাদের দেশে দেওয়ালের গায়ে, সেঁতা জায়গায় ফার্ণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ গাছকে আমরা ফার্ণ বলিতেছি ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। ভাল

কথায় ইহাকে "পর্ণাঙ্গ" গাছ বলা হয়। অর্থাৎ ইহাদের ফুল ফল কিছুই নাই,—পাতাই সর্ব্বস্ব।

আমরা যে দু'রকম ফার্ণের ছবি দিলাম, তোমাদের পাড়ার কোনো ভাঙা প্রাচীরের গায়ে বা পুরানো পুকুরের ধারে খোঁজ করিলেই দেখিতে পাইবে। তোমরা ইহাদের বহুফলক পাতার উল্টা পিঠ পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, প্রত্যেক পাকা পাতার তলায় যেন কতকগুলি উঁচু জায়গা সারি সারি

ফার্ণ

সাজানো আছে। পরপৃষ্ঠায় একটা ফার্ণের পাতার উল্টা পিঠের ছবি দিলাম। উঁচু জায়গাগুলি ছবিতেও দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক, ফার্ণের পাতার ঐ সব উঁচু জায়গা প্রথমে সবুজই থাকে। কিন্তু বর্ষার শেষে ঐ পাতাগুলি যখন পাকিয়া

যায়, তখন সবুজের বদলে ঐ-সব জায়গায় রঙ্ বাদামী হইয়া

ফার্ণের পাতার উল্টা পিঠ
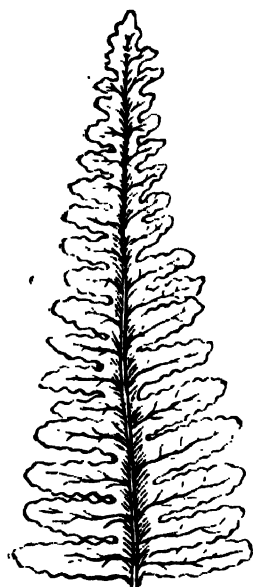
পড়ে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি পাতাটি শুকাইয়া যাইতেছে, তাই তাহার জায়গায় জায়গায় বাদামী রঙ্ ধরিতেছে। কিন্তু তাহা নয়। ঐ উঁচু জায়গাগুলিই ফার্ণের রেণুকোটর। রেণু (Spore) পুষ্ট হইলেই কোটরের রঙ্ ঐ-রকমে বদ্‌লাইয়া যায়। কোটরের ভিতরকার রেণু হইতেই ফার্ণের চারা উৎপন্ন হয়। গাছের বীজে বীজপত্র ও গাছের অঙ্কুর লুকানো থাকে। কিন্তু ফার্ণের রেণুতে ঐ-সব জিনিসের নামগন্ধও থাকে না। সুতরাং সেগুলিকে বীজ বলিলে ভুল হয়। তাই উহাদের রেণু বলা হইল।

যাহা হউক, পাতার তলাকার কোটরে থাকিয়া যখন ফার্ণের রেণুগুলি পুষ্ট হয়, তখন সেই কোটরের ঢাক্‌নি আপনিই খুলিয়া যায় এবং সেখান হইতে ফুলের পরাগের চেয়েও ছোটো হাজার হাজার রেণু বাতাসে উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, এই ছোটো রেণুগুলি মাটিতে পড়িয়া বহু-ফলক পাতাওয়ালা ফার্ণ গাছের উৎপত্তি করে।

কিন্তু তাহা নয়। রেণু হইতে গাছ জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রথমে ফার্ণ গাছের আকৃতি দেখা যায় না। বর্ষার প্রথমে সেঁতা জায়গার দেওয়ালে খোঁজ করিলে তোমরা রেণু হইতে উৎপন্ন গাছ দেখিতে পাইবে। এগুলির আকৃতি ছোটো সবুজ পাতার মতো। দেখিলেই মনে হয়, যেন অন্য কোনো গাছের ছোটো চারা।

যাহা হউক, গাছের সাধারণ ফুলে যেমন পিতৃকেশর ও মাতৃকেশর থাকে, রেণুর ঐ-সব চারার পাতার নীচেও সেই রকম দুইটি পৃথক্ অংশ থাকে। এই দুইয়ের মিলনে যে কোষ জন্মে, তাহাই ফার্ণ গাছের বীজের কাজ করে। প্রকৃত ফার্ণ এই সব কোষ হইতেই উৎপন্ন হয়।

পাখীরা একবারেই ছানা প্রসব করে না। আগে ডিম হয়, পরে ডিম হইতে ছানা বাহির হয়। এই রকমে দুইবার জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া পাখীদের "দ্বিজ" নাম দেওয়া হয়। ফার্ণ জাতীয় গাছও যেন দ্বিজ। ইহাদের রেণু হইতে ফার্ণ গাছ না জন্মিয়া প্রথমে পিতৃকোষ ও মাতৃকোষওয়ালা এক-একটা পাতা জন্মায়। তার পরে সেই দুই রকম কোষের যোগে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত ফার্ণ গাছ।

শুশুনির শাক তোমরা খাইয়াছ। দেখিতে ইহা যেন আমরুলের পাতার মতো। প্রত্যেক বোঁটার ডগায় ইহাদের চারিটি করিয়া পত্রক দেখা যায়। শুশুনির শাক খাল, বিল, এবং পুকুরের খুব ভিজে জায়গায় অনেক জন্মে। ইহাও ফার্ণ

জাতীয় গাছ। তাই শুশুনির ফুল-ফল হয় না। তোমরা খোঁজ করিলে ইহার পাতার বোঁটার নীচে গুঁটির মতো অংশ দেখিতে পাইবে। ইহাতে পিতৃরেণু ও মাতৃরেণু আটকানো থাকে এগুলির মিলনে যে নূতন রেণুর সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেই নূতন শুশুনি গাছ জন্মে।
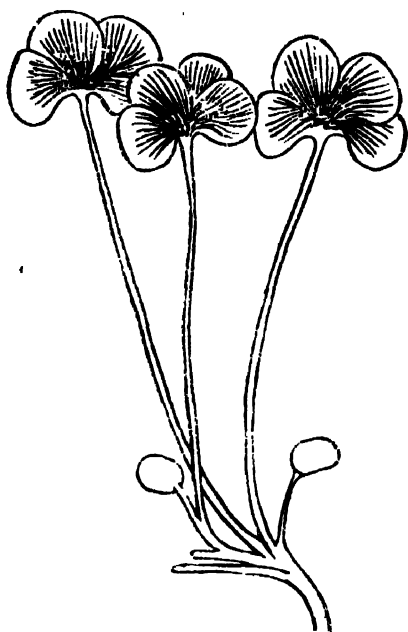
শুশুনী শাক

পুকুরের বা বিলের বদ্ধ জলে যে-সব ছোটো উঝ্কি-পানা ভাসিয়া বেড়ায়, তোমরা হয়ত তাহা দেখিয়াছ। ইহাদের পাতাগুলি প্রায় গোলাকায়। দেখিলে উঝ্কির মতো বলিয়া বোধ হয়, এজন্যই এগুলির নাম উঝ্কি-পানা। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষুদে পানাও বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এগুলিও ফার্ণ জাতীয় গাছ। ইহাদেরো ফুল, ফল এবং বীজ হয় না। পাতার তলায় যে রেণু থাকে তাহাতেই বংশ রক্ষা হয়। এক-এক সময়ে সমস্ত পুকুর

যেন এই সবুজ পানায় ঢাকিয়া যায়। এক-একটা গাছ হইতে ধূলায় চেয়েও ছোটো কোটি কোটি রেণু বাহির হয় বলিয়াই ইহাদের এত বৃদ্ধি।

আমরা সচরাচর যে-সব ফার্ণ দেখিতে পাই, কেবল তাহাদেরি কথা তোমাদিগকে বলিলাম। ফার্ণদের মধ্যে নানা জাতি আছে এবং প্রত্যেক জাতিই ভিন্ন ভিন্ন রকমে রেণু উৎপন্ন করে। সে-সব বলিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড বই হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বাংলা দেশের মাটিতে ফার্ণ ভালো জন্মে না। তাই ইহাদের সকলের নাম আমাদের জানা নাই। ময়ূর-শিখা, হংসরাজ, ময়ূর-পঙ্খী, চাকুলা, দেপু ইত্যাদি নামের অনেক রকম রকম সুন্দর ফার্ণ পাহাড় অঞ্চলে দেখা যায়। তোমরা যখন দারজিলিং বা অন্য কোনো পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবে, তখন ফার্ণের পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়ো। ফার্ণগুলি কি-রকমে রেণু উৎপন্ন করে, উহাদের পাতা পরীক্ষা করিয়া তোমরা বুঝিতে পারিবে।

শেওলা

জলে যে-সব গাছ হয়, তাহাকে লোকে শেওলা বলে। যেমন পাটা শেওলা, ঝাঁঝি শেওলা ইত্যাদি। আমরা এখানে সেই সব শেওলার কথা বলিব না। বর্ষাকালে ভিজে দেওয়ালের গায়ে যে সবুজ রঙের সুন্দর শেওলা (Moss) দেখা যায়, আমরা তাহারি একটু পরিচয় দিব। তোমরা

এগুলিকে দেখ নাই কি? পুরাণো প্রাচীরের গায়ে যখন এগুলি জন্মে, তখন তাহাদিগের দিকে তাকাইলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। এমনি তাদের সবুজ রঙ্‌।

যাহা হউক, শেওলারাও অপুষ্পক গাছ। ভালো আতসী কাজ দিয়া তোমরা যদি শেওলা পরীক্ষা করিতে পার, দেখিবে, ইহাদেরো দেহে পাতা ইস্‌ক্রুপের মতো করিয়া সাজানো আছে। কিন্তু সাধারণ গাছদের মতো ইহাদের শরীরে কোষ-নলিকা নাই। কেবল পত্রহরিতে-ভরা কতকগুলি কোষ লইয়াই ইহাদের দেহ। আমরা যাহাকে শিকড় বলি, ইহাদের শরীরে তাহাও প্রায়ই দেখা যায় না। দেহের যে অংশ লতাইয়া দেওয়ালের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহাই জল ও অন্য খাদ্য চুষিয়া লয়। তোমরা কখনই দেওয়ালের এক জায়গায় একটা বা দু'টা শেওলা দেখিতে পাইবে না। একই জায়গায় ইহারা হাজারে হাজারে জন্মে। তাই বর্ষার জল
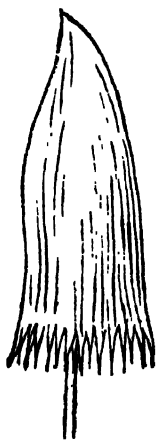
শেওলার শীষ ও তাহার রেণুকোটর

ইহাদের গায়ে সপ্‌-সপ্‌ করে। এই জলও ইহারা চুষিয়া লয়।

ফার্ণের রেণু যেমন পাতার তলায় থাকে, শেওলার তাহা থাকে না। গাছ পুষ্ট হইলে প্রত্যেকটি হইতে এক-একটা শীষ বাহির হয় এবং তাহারি মাথায় রেণুকোটর জন্মে। কোনো কোনো শেওলার রেণুকোটরগুলিকে শেয়ালকাঁটার ফলের মতো দেখায়। পাছে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য প্রত্যেক কৌটরের আগাগোড়ায় এক রকম ঢাক্‌নি থাকে। ভিতরের রেণু পাকিলেই এই ঢাক্‌নি আপনিই খসিয়া পড়ে এবং কোটরে যে কপাট থাকে তাহাও খুলিয়া যায়। তার পরে সেগুলি বাতাসে আপনিই হেলিয়া দুলিয়া ভিতরকার রেণুগুলিকে চারিদিকে ছড়াইতে আরম্ভ করে। এক-একটি কোটরে লক্ষ লক্ষ রেণু থাকে। এই জন্যই শেওলার গাছগুলিকে এক এক জায়গায় হাজারে হাজারে জন্মিতে দেখা যায়।

ব্যাঙের ছাতা

আগেই বলিয়াছি যাহাকে তোমরা ব্যাঙের ছাতা বল, তাহা ব্যাঙেরা তৈয়ারি করে না এবং বৃষ্টির সময়ে তাহারা ঐ ছাতা মাথায় দেয় না। এগুলি একরকম গাছ। কিন্তু ইহাদের ফুল বা ফল হয় না। কাজেই ব্যাঙের ছাতারা অপুষ্পক দলের গাছ। দেহে যে রেণু জন্মে তাহা ছড়াইয়া ইহারা নূতন ব্যাঙের ছাতার উৎপত্তি করে।

ব্যাঙের ছাতার রঙ্ কত রকম হয়, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কতকগুলি রঙ্ দুধের মতো শাদা, কতকগুলির আবার হল্‌দে বা বাদামী রঙের। তা'ছাড়া কালো এবং লাল রঙের ছাতাও অনেক আছে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া তোমরা একটাও সবুজ রঙের ব্যাঙের ছাতা বাহির করিতে পারিবে না। পাতা ও ডালের কোষে যে সবুজ রঙ্ থাকে, সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তাহাই গাছের খাবার তৈয়ারি করে—তোমরা ইহা আগেই শুনিয়াছ। সুতরাং বলিতে হয়, ব্যাঙের ছাতা নিজের খাবার নিজে তৈয়ারি করে না। সত্যই তাহাই। গায়ে পত্রহরিৎ না থাকায় ইহাদের কাহারো খাবার তৈয়ারি করিবার শক্তি থাকে না।

তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, যে মাটিতে পচা গোবর বা পচা গাছপালা আছে, সেখানেই যত ব্যাঙের ছাতা

জন্মিতেছে। এই সব পচা জিনিসই উহাদের খাদ্য, তাই উহারা নূতন করিয়া খাবার তৈয়ারি করে না এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আলো চায় না।

তোমরা পাতাল-ফোঁড় দেখিয়াছ কি? কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ একদিন প্রাতে দেখা যায়, গোয়াল ঘর বা ভাণ্ডার ঘরের মেঝে ফাঁক করিয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এই রকম ছাতাকে পাতাল-ফোঁড় বলে। মেঝের তলায় গরুর চোনা গোবর ইত্যাদি পচে বলিয়াই সেখানে ব্যাঙের ছাতারা খাদ্য পায়, তাই তাহারা মোটা হইয়া এত জোরে মাটি ফাটাইতে পারে। কেবল পচা জিনিস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে বলিয়া ব্যাঙের ছাতাদের গলনজীবী (Saprophytes) নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

কেন জানি না, ব্যাঙের ছাতাগুলিকে যেন ছুঁইতে ঘৃণা করে। কিন্তু ইহাতে ঘৃণার কিছুই নাই। ইহারা আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের মতই এক রকম গাছ। আমাদের দেশের কেহ কেহ কয়েক রকম ব্যাঙের ছাতা তরকারি করিয়া খাইয়া থাকে। আমরা যেমন তরি-তরকারির আবাদ করি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতির লোকেরা সেই রকমে ব্যাঙের ছাতার আবাদ করে এবং লোকে আদর করিয়া তাহা খায়। যাহা হউক, তোমাদের গোয়াল ঘরের ভিতরে বা গোবর-গাদার উপরে যখন ব্যাঙের ছাতা হইবে, তখন ঘৃণা ত্যাগ করিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহাদের অন্য গাছের

মতো শিকড় নাই, কেবল সূতার চেয়েও সরু কতকগুলি লম্বা লম্বা শাদা জিনিস মাটির তলায় বিছানো আছে। জালের মতো করিয়া মাটির তলায় ছড়ানো থাকে বলিয়া সেগুলিকে জালতন্তু (Mycelium) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই ব্যাঙের ছাতাদের প্রকৃত গাছ। এগুলি মাটির তলাকার পচা জিনিস খাইয়া পুষ্ট হয় এবং চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণ গাছ যখন প্রচুর খাবার পাইয়া বড় হয়, তখন বংশরক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া কেবল ফুল-ফলই উৎপন্ন করিতে থাকে। ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। মাটির তলাকার জাল-তন্তুগুলি যখন খুব পুষ্ট হয়, তখন তাহাদেরো ঐরকম চেষ্টা হয়। কিন্তু ইহাদের ফুল, ফল বা বীজ উৎপন্ন করিবার একটুও সামর্থ্য থাকে না। তাই মাঝে মাঝে কিম্ভূতকিমাকার ব্যাঙের ছাতাকে উপরে উঠাইয়া ইহারা বংশ
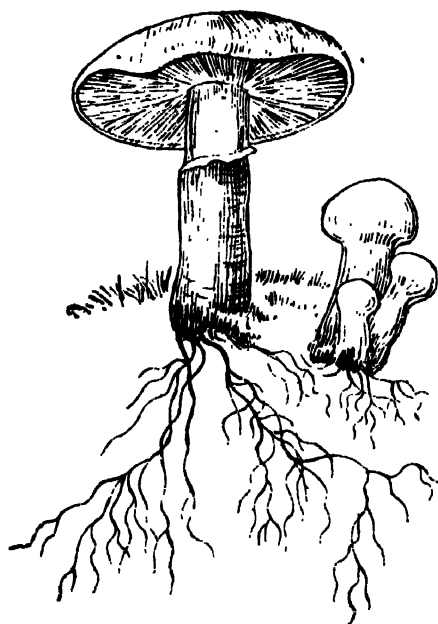
ব্যাঙের ছাতা

রক্ষার চেষ্টা করে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ব্যাঙের ছাতাগুলি সম্পূর্ণ গাছ নয়, ফুল বা ফল যেমন গাছের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ, এগুলিও তাই। জালতন্তুই ইহাদের আসল গাছ। তাহা মাটির তলায় থাকে।

তোমরা বোধ হয় ব্যাঙের ছাতার রেণু দেখ নাই। একটি বড় ছাতা সংগ্রহ করিয়া কাগজের উপরে সেটিকে ঝাড়িয়ো; দেখিবে, কাগজে কতকগুলি কালো রঙের ছোটো ছোটো জিনিস পড়িয়াছে। এইগুলিই ব্যাঙের ছাতার রেণু। ছাতার তলায় যে সব খাঁজ-কাটা দেখা যায়, এই সব খাঁজের ভিতরে রেণুগুলি লুকানো থাকে।

তা' ছাড়া পাছে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়, সেজন্য ছাতার ডাণ্ডার মাঝামাঝি জায়গা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার নীচে পর্য্যন্ত একরকম আবরণে ঢাকা থাকে। রেণু পুষ্ট হইলে এই আবরণ আপনি ছিঁড়িয়া যায়। তখন রেণুগুলি ছাতা হইতে বাহির হইয়া বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তোমরা ব্যাঙের ছাতা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, তাহার ডাণ্ডার চারিদিকে চাকার মতো একটি চিহ্ন রহিয়াছে। ইহাই ব্যাঙের ছাতার আবরণের চিহ্ন।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, যেখানে রেণু পড়ে সেখানেই বুঝি এক-একটা ছাতা গজাইয়া উঠে। বটের এক একটা ফলে কত বীজ থাকে তোমরা দেখ নাই কি? কিন্তু তাহার

প্রত্যেক বীজেই গাছ হয় না। এক একটা গাছের কোটি কোটি বীজের মধ্যে যে কয়েকটি উপযুক্ত সময়ে ভালো জায়গায় পড়ে, কেবল সেইগুলি হইতে বীজ বাহির হয়। ব্যাঙের ছাতার রেণুগুলিতে ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। এক একটা ছাতা হইতে যে কোটি কোটি রেণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার অধিকাংশই রৌদ্রে, বৃষ্টিতে এবং আগুনে নষ্ট হইয়া যায়। যেগুলি পচা জায়গায় পড়ে, কেবল তাহারাই মাটির তলায় জালতন্তুর সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙের ছাতা উৎপন্ন করে।

ব্যাঙের ছাতার যে কত জাতি আছে তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না। পচা খাবার, বাসি পাঁউরুটি এবং পচা ফলের গায়ে যে লোমের মতো খুব সরু সরু ছাতা ধরে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? এগুলিও ব্যাঙের ছাতাদের জ্ঞাতি। ইহাদের রেণু বাতাসে উড়িয়া সব জায়গাতেই আনাগোনা করে, কিন্তু সুবিধামত জায়গা না পাইয়া সেগুলি
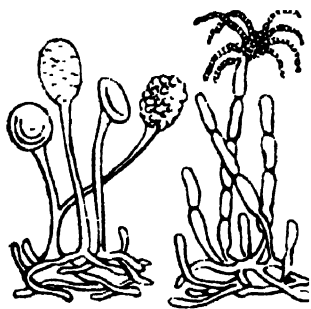
অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তাই পচা ও বাসি জিনিসে অনেক খাবার পাইয়া সেখানে তাহারা জন্মায়। খাবারের উপরকার ছাতার একটি ছবি খুব বড় করিয়া আঁকিয়া

এখানে দিলাম। এই ছাতা হইতে কি-রকমে রেণু বাহির হয়, তাহাও ছবিতে দেখিতে পাইবে।

গাছ কাটিয়া অনেক দিন ফেলিয়া রাখিলে তাহার গায়ে থাকে-থাকে সাজানো এ-রকম নানা রঙের জিনিস দেখা যায়। এগুলিকে তোমরা কি মনে কর, জানি না,—কিন্তু ইহারাও ব্যাঙের ছাতা জাতীয় গাছ। গুঁড়ির পচা ছালে ও কাঠে খাবার থাকে, তাই ইহারা সেখানে জন্মায়।

ব্যাঙের ছাতা মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না, বরং যেখানে লতাপাতা বা গোবর প্রভৃতি খারাপ জিনিস পচিতে থাকে সেখানে জন্মিয়া সেগুলিকে নষ্ট করে। ইহাতে লোকের উপকারই হয়। কিন্তু গাছের তাজা ডালে বা পাতায় সময়ে সময়ে যে-সব ব্যাঙের ছাতা জন্মে, তাহা ভয়ানক ক্ষতি করে। ধান, গম এবং তরিতরকারির গাছ সজোরে বাড়িতেছে, এমন সময়ে পাতার উপরে কতকগুলি দাগ দেখা দিল এবং শেষে পাতাগুলি শুকাইয়া গেল। ইহা ফসলের ক্ষেতে এবং তরকারির বাগানে কখনো কখনো দেখা যায়। লোকে ইহাকে গাছের ব্যারাম বলে। কিন্তু আসলে ইহা ব্যাঙের ছাতারই কাজ। এই ছাতাগুলি এত ছোটো জিনিস যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাহাদের কোনো বিষয় জানাই যায় না।

মদ্যাণু

খেজুর, তাল বা আখের রস কয়েক ঘণ্টা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে, তাহা গাঁজিয়া উঠে। তখন তাহাতে ফেনা হয় এবং মিষ্ট স্বাদ থাকে না। খেজুর ও তালের রস এই রকম গাঁজিয়া গেলে তাড়ি হয়। যাহা আগে এত সুমিষ্ট ছিল, তাহা ইহাতে বিস্বাদ এবং বিশেষ অপকারী হইয়া দাঁড়ায়। লোকে ইহা খাইলে মাতাল হইয়া পড়ে। গুড়, মধু এবং বাসি ভাতকেও এই রকমে গাঁজিতে দেখা যায়। যাহা হউক, এই গাঁজানো কাজটাও ব্যাঙের ছাতা-জাতীয় এক রকম অতি ছোটো উদ্ভিদ্ দ্বারা হয়। সুমিষ্ট খাদ্যকে মদ করিয়া ফেলে বলিয়া এই ছাতাকে মদ্যাণু (Yeast) নাম দেওয়া হইয়াছে। মদ্যাণু খুব ছোটো জিনিস, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহা নজরেই পড়ে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে মদ্যাণুগুলিকে সাধারণ কোষের আকৃতির মতো দেখায়। ইহা দেখিলেই বুঝিবে মদ্যাণু এবং ব্যাঙের ছাতার চেহারার মধ্যে একটুও মিল নাই। মাছের ডিমের মত এক-একটি কোষ লইয়াই ইহাদের দেহ। গাছ পুষ্ট হইলে তাহার পাতার গোড়া হইতে যেমন ডাল বা ফুলের কুঁড়ি বাহির হয়, প্রত্যেক পুষ্ট মদ্যাণুর শরীর হইতে সেই রকম গ্যাজ বাহির হয়। কিন্তু

এগুলি চিরকাল তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে না। একটু বড় হইলেই গ্যাঁজগুলি মদ্যাণুর গা হইতে পৃথক্ হইয়া এক-একটি নূতন মদ্যাণু হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, একটি হইতে দুটি, দুটি হইতে চারিটি এবং চারিটি হইতে আটটি, এই রকমে অল্পক্ষণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নূতন মদ্যাণু উৎপন্ন হইয়া পড়ে। যাহাকে আমরা চিনি বলি, তাহাকে ইহারাই মদ ও অঙ্গারক বাষ্পে পরিবর্ত্তিত করে। গাঁজানো রসে যে ফেনা উঠে তাহার প্রত্যেক বুদ্‌বুদ্‌টিই অঙ্গারক বাষ্পে বোঝাই থাকে এবং রস মদ হইয়া দাঁড়ায়। তাই তাড়ি খাইলে লোকের বুদ্ধি লোপ পায় এবং তাহারা মাতাল হয়।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ মদ্যাণুর কোষ কেবল নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়াই বুঝি বংশ বিস্তার করে। কিন্তু তাহা নয়। মদ্যাণুরা রেণু উৎপন্ন করিয়াও বংশ বিস্তার করে। এই সব রেণু সর্ব্বদাই আমাদের চারিদিকের বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। তার পরে যেই খেজুর রস, তালের রস বা অন্য কোনো খাদ্যের উপর আসিয়া পড়ে, অমনি সেগুলির বংশবিস্তার আরম্ভ হয়। এই জন্যই কিছুক্ষণ বাহিরের বাতাসে রাখিলে খেজুর প্রভৃতির রসে মদ্যাণুর রেণু আশ্রয় লয় এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে সমস্ত জিনিসটাকে গাঁজাইয়া তোলে। এই রকমে গাঁজিয়া বা মাতিয়া উঠাকে বিজ্ঞানের কথায় "উৎসেক" (Fermentation) বলা হয়।

ব্যাঙের ছাতার যেমন অনেক জাতি আছে, মদ্যাণুদের

মধ্যেও সেই রকম অনেক জাতিবিভাগ আছে। কয়েক রকম মদ্যাণু আমাদের সংসারের অনেক কাজে লাগে।

জিলাপি তোমরা সকলে খাইয়াছ, কিন্তু কি-রকম মাল-মসলা দিয়া উহা তৈয়ারি হয়, তাহা বোধ হয় জানো না। জিলাপির পাঁপের ভিতরটা কি-রকম ফাঁপা থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? ময়রা-দোকানের কারিকরেরা জিলাপিকে ঐ-রকম ফাঁপা করে না। উহা এক রকম মদ্যাণুরই কাজ। ময়রারা ব্যাসন, চালের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়া প্রথমে জিলাপির গোলা প্রস্তুত করে এবং তাহাতে "খামী মিশাইয়া গাঁজিতে দেয়। "খামীতে" মদ্যাণুর রেণু থাকে। ইহা জিলাপির গোলাতে অনেক খাদ্য পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে যে চিনির অংশ থাকে, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অঙ্গারক বাষ্প ও মদের সৃষ্টি করে। এই অঙ্গারক বাষ্পই জিলাপির গোলার ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া গরমে তাহাকে ফাঁপাইয়া তোলে।

গরমের দিনে আমরা পান্তা ভাত খাই। টাট্‌কা ভাত কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলেই পান্তা হইয়া যায়। তখন ভাতের স্বাদ থাকে না, বেশ টক হইয়া পড়ে। বাতাসে যে নানা জাতের মদ্যাণু উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহাদেরি মধ্যে এক জাত ভাতে আশ্রয় লইয়া তাহাকে টক্ করিয়া ফেলে। আজকাল সকল দেশেই মদ্যাণুর বীজ বিক্রয় হয়। ইহা তোমরা বোধ হয় জানো না। পাঁউরুটি ও বিস্কুট তৈয়ারির

সময়ে লোকে ঐ বীজ কিনিয়া ব্যবহার করে। আমরা ছেলে বেলায় যখন পাঁউরুটি খাইতাম, তখন তাহার ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র দেখিয়া অবাক্ হইতাম এবং ভাবিতাম, বুঝি দোকানদার কষ্ট করিয়া ঐ সব ছিদ্র তৈয়ারি করে। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়। ময়দা ও চিনি মিশাইয়া যখন পাঁউরুটির লেচি তৈয়ারি করা হয়, তখন তাহার সহিত মদ্যাণুর রেণু বা তাড়ি মিশাইয়া রাখা হয়। তার পরে উনুনের গরম পাইলেই তাহা হইতে লেচির ভিতরে অনেক মদ্যাণু জন্মিয়া তাহার চিনিকে নষ্ট করিয়া অঙ্গারক বাষ্প ও মদ প্রস্তুত করে। অঙ্গারক বাষ্প বাতাসেরই মতো একটি জিনিস, লেচির ভিতরে জন্মিয়া তাহা সেখানে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। তাই বাহিরে আসিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া লেচিগুলিকে ফাঁপাইয়া তুলে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, মদ্যাণু দ্বারা যে মদ উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝি পাউরুটির ভিতরেই থাকিয়া যায়। কিন্তু তাহা থাকে না, উনুনের তাপে এবং অন্যান্য কারণে রুটির ভিতরে মদ প্রস্তুত হইবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

পানা

কোথাও কিছু নাই, চৈত্র-বৈশাখ মাসে এক ছাট্ বৃষ্টি হইল, আর তোমাদের বাড়ীর কাছের পুরাণো পুকুরটার জল সরের মতো সবুজ পানায় ঢাকিয়া গেল। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? কেহ কেহ এই পানাকে সিদ্ধি বলেন। আমরা তাহাকেই পানা বলিতেছি। পানা যে কেবল পুকুরের জলেই হয়, তাহা নয়। ইট্, পাথর, কাঠ অনেক দিন জলে ডুবিয়া থাকিলে সেগুলির গায়েও পানা জন্মে। বর্ষাকালে তোমাদের বাড়ীর পৈঠা ও কূয়ো-তলা কি-রকম পিছল হয়, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এক রকম পানা জমিয়াই অনেক সময় সান্-বাঁধানো জায়গাকে পিছল করে।

যে-সব পানার কথা বলিলাম, তাহাদের প্রায় সকলেরই রঙ্ সবুজ। সুতরাং ইহারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই পত্র-হরিৎ দিয়া প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাদের কাহারো ফুল বা ফল হয় না। জলের তলায় যে সূতার মতো নানা আকারের পানা দেখা যায়, তাহারাও অপুষ্পক।

পানারা যে-রকমে বংশ-বিস্তার করে, তাহা বড় জটিল। আমরা তোমাদিগকে এখানে সে-সম্বন্ধে কেবল কয়েকটি মোটামুটি কথা বলিব।

বর্ষাকালে কূয়ো-তলায় বা রোয়াকের উপরে বাদ্‌লার

আঠার মত এক রকম পানা দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? এগুলি আঁকারে এক-একটি বোতামের চেয়ে বড় হয় না। আঠার মতো জিনিসটা পানার বাহিরের আবরণ। উহারি ভিতরে সূতার আকারে আসল পানাটি গুটাইয়া থাকে। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন তোমরা উহা দেখিতে পাইবে না। এই সূতার মতো অংশটি খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। কখনো কখনো সূতার এক-একটা জায়গা মোটা হইয়া পড়ে এবং তাহাই রেণুর কাজ করে। এই রকম রেণু হঠাৎ নষ্ট হয় না। তাই সেগুলি যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকিয়া সুযোগ পাইলেই গজাইয়া নূতন পানার সৃষ্টি করে।

আমরা যাহাকে সিদ্ধি-পানা বলি, তাহারো আকৃতি সূতার মতো। এইগুলিই অনেক জন্মিয়া আমাদের পুকুরের জলকে সবুজ করিয়া তুলে। যাহা হউক, ইহাদের সূতার মতো দেহটি কতকগুলি লম্বা কোষ দিয়া প্রস্তুত দেখা যায় এবং সেই সব কোষের গায়ে ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচের মতো করিয়া পত্রহরিৎ সাজানো থাকে। ইহারাও নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বংশ বিস্তার করে। আবার দুইটা পানা জোট বাঁধিয়া রেণুও উৎপন্ন করে। যখন পানা মরিয়া যায়, জল শুকাইয়া যায়, তখন ঐ-সব রেণুই বংশের ধারা বজায় রাখে। রেণুগুলির উপরে ডিমের খোলার মতো এক রকম আবরণের সৃষ্টি হয়। এই জন্য জলহীন জায়গায় বহুকাল পড়িয়া থাকিলেও তাহারা মরে না।

জীবাণু

খুব ছোটো উদ্ভিদের কথা তোমরা অনেক শুনিলে, কিন্তু সেগুলির চেয়েও ছোটো আর এক জাতের গাছ আছে। ইহাদিগকে জীবাণু (Bacteria) নাম দেওয়া হয়। ফার্ণ, ব্যাঙের ছাতা, শেওলা প্রভৃতির মতো ইহাদের ফুল, ফল বা বীজ হয় না। তাই জীবাণুরা অপুষ্পক জাতির গাছ। পঁচিশ হাজার জীবাণু পর পর সাজাইলে তবে এক ইঞ্চি লম্বা হয়! ভাবিয়া দেখ, তাহারা আকারে কত ছোটো। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ইহাদের দেখাই যায় না। জীবাণুরাই পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম জীব।

এক-একটি কোষ লইয়াই ইহাদের দেহ—কিন্তু তাহাতে পত্রহরিতের নাম-গন্ধও থাকে না। তোমরা সাধারণ গাছের যে-রকম আকৃতি দেখিতে পাও, কোনো জীবাণুরই সে-রকম আকৃতি দেখা যায় না। অণুবীক্ষণে কাহাকে ইস্‌ক্রুপের মতো প্যাঁচ-ওয়ালা, কাহাকে গোলাকার, কাহাকে আবার লম্বা ধরণের দেখা যায়। অদ্ভুত নয় কি ?

সাধারণ-কোষ যেমন নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করিতে করিতে সংখ্যায় বাড়িয়া যায়, জীবাণুদিগকে ঠিক্ ঐ-রকমেই বাড়িতে দেখা যায়। ইহাই জীবাণুদের বংশবিস্তারের প্রণালী। কিন্তু ইহারা এত শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করে যে, তাহা শুনিলে

তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, একটিমাত্র জীবাণু ছয় দিনের মধ্যে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সংখ্যায় এত অধিক হইয়া যাইতে পারে যে, সেগুলি একত্র হইলে আমাদের পৃথিবীর মতো একটা প্রকাণ্ড জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বদাই অসংখ্য জীবাণু আছে। আমাদের শরীরের ভিতরেও জীবাণুর অভাব নাই। ইহারা শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিবার মতো খাদ্য এবং অন্য সুযোগ পায় না,—এইজন্যই উহারা ঐ-রকম তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করিতে পারে না। এই সকল বাধা না থাকিলে এই পৃথিবীতে কেবল জীবাণুরাই রাজত্ব করিত।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, যে-সব গাছের গায়ে পত্র-হরিৎ থাকে না, তাহারা অতি অধম শ্রেণীর উদ্ভিদ। ইহারা নিজেদের খাবার নিজেরা তৈয়ারি করিতে পারে না। তাই কেহ অন্য গাছের রস চুষিয়া. কেহ পচা জিনিসের উপরে জন্মিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। পরের তৈয়ারি খাবার এবং পচা জিনিসই ইহাদের খাদ্য। জীবাণুদের গায়ে পত্র-হরিৎ নাই, তাই ইহারাও নিজেদের খাবার নিজেরা তৈয়ারি করিতে পারে না। যেখানে পচা জিনিস থাকে, সেখানে জীবাণুরা বাসা বাঁধিয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশ বিস্তার করে। কুকুর বিড়াল ইত্যাদি মরিয়া পচিতে থাকিলে, তাহা হইতে কি দুর্গন্ধ বাহির হয়, তোমরা তাহা সকলেই জানো। ইহা এক রকম জীবাণুরই কাজ। মরা প্রাণী বা গাছপালার

আশ্রয় লইয়া জীবাণুরাই সেই সব জিনিসকে পচাইয়া ফেলে।

তাহা হইলে দেখ, জীবাণুরা অতি-ছোটো উদ্ভিদ্ হইলেও সংসারের অনেক উপকার করে। ইহাদের দ্বারা ময়লা এবং মরা জিনিস নষ্ট হয় বলিয়াই আমাদের চারিদিকের জল, স্থল, আকাশ এখনো নির্ম্মল রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম হইতে যত জীব মরিয়াছে, তাহাদের দেহ যদি জীবাণু দ্বারা পচিয়া নষ্ট না হইত, তাহা হইলে গাদা গাদা মরা প্রাণীই সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত না কি? আমরা তখন এত বড় পৃথিবীতে চলিবার ফিরিবার মতো জায়গাটুকুও পাইতাম না!

গাছের গোড়ায় আমরা সার দিই। সার মাটির তলায় থাকিয়া পচে এবং সেই পচা সার শিকড় দিয়া চুষিয়া গাছ-পালারা পুষ্ট হয়। ইহাতেও আমরা জীবাণুর কাজ দেখিতে পাই। তাজা সার গাছের গোড়ায় দিলে গাছের উপকার হয় না। কারণ, তাহা গাছের খাদ্যের আকারে থাকে না। তাই তাজা সারে গাছ মরিয়া যায়। জীবাণুরাই সারকে পচায় এবং সেই পচা জিনিসকে খাদ্যের আকারে পাইয়া গাছেরা তাহা চুষিয়া লয়।

ইহা ছাড়া দুধকে দই করা এবং পাট, শণ প্রভৃতির গাছকে পচাইয়া আঁশগুলিকে পৃথক্ করা ইত্যাদি অনেক কাজ জীবাণু দ্বারা হয়।

জীবাণুর যে-সব কাজের কথা তোমরা শুনিলে, তাহার

সকলি ভালো কাজ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের সব কাজই যে ভালো, তাহা বলা যায় না। জীবাণুর দ্বারা প্রাণীদের যে অনিষ্ট হয়, তাহাও নিতান্ত কম নয়। জ্বরাতিসার, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওলাউঠা, ধনুষ্টঙ্কার, নিউ-মোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি অনেক রোগই এক এক রকম জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। জীবাণুরা কত ছোটো জিনিস, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ, তাই বাতাসে উড়িয়া এবং জলে ভাসিয়া তাহারা সর্ব্বদা সব জায়গাতেই যাওয়া-আসা করে। তার পরে এই রকমে চলিতে ফিরিতে উহাদের কয়েক জাতি যখন প্রাণীর শরীরে আশ্রয় লয়, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শরীরে পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বংশ-বিস্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে
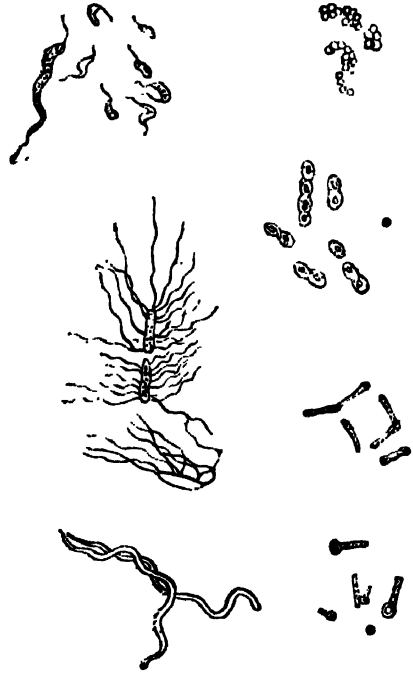
উপরের বাম হইতে ডান দিকে (১) কলেরা (২) পুঁজ (৩) টাইফায়েড (৪) নিউমোনিয়া (৫) ডিপ্‌থেরিয়া (৬) পালাজ্বর (৭) ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু।

ভয়ানক বিষ উৎপন্ন করিয়া আশ্রয়দাতার শরীরে ঢালিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই প্রাণীর দেহে ওলাউঠা, বসন্ত, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে বৎসরে যত লোক মরে, তাহার প্রায় আট ভাগের এক ভাগ কেবল যক্ষ্মা রোগেই মারা যায়। তা'ছাড়া ধনুষ্টঙ্কার, ওলাউঠা, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যুও আছে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুর অন্ততঃ ছয় ভাগের এক ভাগ কেবল জীবাণুদের উৎপাতেই হয়।

গাছপালার শ্রেণীবিভাগ

প্রতিদিন আমাদের যে-সব জিনিসের দরকার, সেগুলিকে গুছাইয়া রাখিলে অনেক হাঙ্গামার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তোমাদের বাড়ীতে কত বই আছে জানি না। হয়ত পঞ্চাশ, ষাট বা এক শত খানা আছে। যদি এই বইগুলির কয়েকখানিকে ভাণ্ডার ঘরে এবং বাকিগুলিকে রান্নাঘরে ও গোয়াল ঘরে রাখা যায়, তবে কি মুস্কিলেই পড়িতে হয়, ভাবিয়া দেখ। তখন বই খুঁজিবার জন্য রান্নাঘর হইতে ভাণ্ডার ঘরে এবং ভাণ্ডার ঘর হইতে গোয়াল ঘরে ছুটাছুটি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। তাই তোমাদের ইংরাজি, বাংলা এবং সংস্কৃত বইগুলিকে ঐ রকমে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া না রাখিয়া পড়িবার ঘরের আলমারিতে থাকে-থাকে সাজাইয়া রাখা হয়। ইহার জন্যই যখন যে বইয়ের দরকার হয়, তোমরা ফস্ করিয়া তাহা বাহির করিতে পার। কেবল বই নয়, খোঁজ করিয়ো, দেখিবে, তোমাদের ঘরকন্নার প্রত্যেক জিনিসই এলোমেলো ভাবে যেখানে-সেখানে পড়িয়া নাই। রান্নার জিনিস রান্নাঘরে, পড়িবার সরঞ্জাম পড়ার ঘরে এবং বিছানাপত্র শুইবার ঘরে সাজানো আছে। প্রত্যেক জিনিস এই রকমে ঠিক্ জায়গায় সাজানো থাকে বলিয়াই, আমাদের কোনো জিনিস খোঁজ করিতে কষ্ট বোধ হয় না।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, প্রায় দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার রকমের জানা-শুনা গাছ পৃথিবীতে আছে। তা' ছাড়া অজানা গাছ বনজঙ্গলের কোথায় যে কত আছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। যাহা হউক, আমাদের জানাশুনা গাছদের মধ্যে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার গাছ সপুষ্পক এবং প্রায় এক লক্ষ অপুষ্পক। একগুলি গাছের সব কথা তোমরা মনে রাখিতে পার কি? কখনই পার না। যাহারা সমস্ত জীবনটাই গাছপালা নাড়িয়া চাড়িয়া কাটাইতেছেন, তাঁহারাও পারেন না। তাই বাড়ীর বইগুলিকে এবং ঘরকন্নার জিনিসগুলিকে আমরা যেমন ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখি, বৈজ্ঞানিকেরা গাছপালা-গুলিকে সেই রকমে ভাগ করিয়া রাখেন।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অভিধানে "ক" "খ" প্রভৃতি অক্ষর অনুসারে যেমন কথা সাজানো থাকে, গাছের নাম বুঝি সেই রকমেই সাজানো থাকে। কিন্তু তাহা নয়। আমাদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মল্লিক, সেন প্রভৃতি যে-সব উপাধি আছে, সেগুলি যে কি, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। অনেকদিন আগে ভারতবর্ষে একজন মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহারি সন্তান-সন্ততি সমস্ত বাংলা দেশে ছড়াইয়া এখন মুখোপাধ্যায় হইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, বাংলা দেশের মুখোপাধ্যায় মাত্রেই একই পূর্ব্ব-পুরুষের সন্তান-সন্ততি,—তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের যোগ আছে। সুতরাং মুখোপাধ্যায়,

চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি উপাধি নিরর্থক নয়। একই উপাধিযুক্ত লোকেরা একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান।

মানুষদের পরস্পরের মধ্যে যেমন রক্তের সম্বন্ধ আছে, খোঁজ করিলে গাছপালাদের মধ্যে প্রায় সেই রকমেরই সম্বন্ধ পাওয়া যায়। নানা গাছের ফুলে ফলে কেমন মিল আছে তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। এই মিলই কতকটা রক্তের মিলের সঙ্গে সমান। তাই রক্তের মিল খুঁজিয়া আমরা যেমন কতকগুলি লোককে মুখোপাধ্যায়, কতকগুলিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, কতকগুলিকে ঘোষ ইত্যাদি উপাধি দিই, বৈজ্ঞানিকরা সেই রকমে ফুল, ফল প্রভৃতির মিল খুঁজিয়া আমাদের জানাশুনা দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার গাছকে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দিয়া থাকেন। এই উপাধিগুলিকে বিজ্ঞানের ভাষায় গণ (Division) বলা হয়। মানুষের যে কত উপাধি আছে তাহা বোধ হয় গুণিয়াই শেষ করা যায় না। কিন্তু গাছপালাদের মোটামুটি ভাগ করার পক্ষে ছত্রক (Thallophytes), শৈবাল (Bryophytes), ফার্ণ (Pteridophytes) এবং বীজজ (Spermatophytes) এই চারিটি গণই যথেষ্ট হয়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, গাছের শ্রেণীবিভাগ লইয়া এত হাঙ্গামা কেন? ফুলের বা পাতার রঙ্ ও আকৃতি অনুসারে ভাগ করিলেই তো চলিতে পারে; কিন্তু তাহা চলে

ন। একই উপাধি-ওয়ালা মানুষের যেমন রকম-রকম আকৃতি ও রকম-রকম গায়ের রঙ্ দেখা যায়, একই দলের গাছদের মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। কাজেই, রঙ্ বা আকৃতি অনুসারে গাছদের ভাগ করিলে ভুল হয়। তাই রক্তের যোগের মতো সম্বন্ধ বাহির করিয়া পণ্ডিতরা গাছপালাকে দলে দলে ভাগ করিয়া থাকেন।

কেবল উপাধি দ্বারা মানুষের সব পরিচর পাওয়া যায় না। মনে কর, কোনো একটি লোকের নাম ভুবনমোহন মিত্র। নাম শুনিলেই তিনি মিত্র-বংশীয়, কেবল ইহাই বুঝা যায় মাত্র। তিনি এখন কুলীন, কি ভঙ্গ, কি বংশজ তাহার একটুও খোঁজ পাওয়া যায় না। তাই মানুষের বংশের পরিচয় লইতে হইলে, উপাধি ছাড়া তাহার আরো অনেক পরিচয় লইতে হয়। গাছপালা সম্বন্ধেও ঠিক ইহাই বলা যাইতে পারে। কেবল গণের উল্লেখ করিলে গাছ চেনা যায় না। তাই পণ্ডিতরা, একই গণের গাছগুলির ভিতরকার আরো মিল দেখিয়া প্রথমে তাহাদিগকে শ্রেণীতে (Classes) ভাগ করিয়া থাকেন। তার পরে আরো খুঁটিনাটি মিল খুঁজিয়া প্রতেক শ্রেণীকে ক্রমে বর্গ (Order), গোষ্ঠী (Family), জাতি (Genus), উপজাতি (Species) এই চারি দলে ভাগ করিয়া থাকেন।

গাছপালাকে এই রকমে ভাগ করা হয় বলিয়াই কোনো গাছের বৈজ্ঞানিক নাম শুনিলে তাহার জাতি, উপজাতি

বুঝা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে উহার গোষ্ঠী, বর্গ, শ্রেণী এবং গণ জানিতে অসুবিধা হয় না।

যাহা হউক এ-সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশেষ আলোচনা করিব না। আমাদের জানাশুনা গাছগুলিকে যদি ঐ-রকমে ভাগ করিয়া লিখিতে হয়, তাহা হইলে একখানি প্রকাণ্ড বই হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা বড় হইয়া যখন গাছপালা সম্বন্ধে বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সব কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র

এই বইয়ে আমরা গাছপালাসম্বন্ধে যে-সব কথা লিখিলাম, তাহার অধিকাংশই গত চারি শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতরা দেখিয়া শুনিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গাছপালা সম্বন্ধে যে কিছুই জানিতেন না, একথা তোমরা মনে করিয়ো না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে অন্য দেশের লোকেরা যাহা জানিতেন আমাদের দেশের লোকেরা তাহার চেয়ে একটুও কম জানিতেন না। বরং কি-রকমে গাছপালা পালন করিতে হয়, কোন্ গাছের কি গুণ, কোন্ গাছ হইতে আমরা কি উপকার পাই, এবং কোন্ গাছ হইতে কি ওষুধ হয়, এসব কথা তাঁহারা প্রাচীন পুঁথিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে শুক্রাচার্য্য নামে এক জন ঋষি ছিলেন। তাঁহার রচিত নীতি-শাস্ত্র নামক একখানি পুস্তক আছে। ইহাতে ভারতবর্ষের গাছপালা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া অথর্ব্ব বেদ, চরক-সংহিতা, বরাহমিহির-রচিত বৃহৎ-সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং মহকবি কালিদাসের রঘুবংশে আমাদের দেশের গাছপালার অনেক পরিচয় আছে।

হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর এবং পূর্ব্ব-ভারতের অনেক জায়গারই গাছপালার বিবরণ নীতিশাস্ত্রে রহিয়াছে।

শুক্রাচার্য্য সমস্ত গাছপালাকে ফলীন, আরণ্যক এই দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং আর এক ভাগে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য গাছের উল্লেখ করিয়াছেন।

যে-সব গাছে ফল হয় এবং যাহাদের ফল লোকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, বা অন্য কাজে লাগায় শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকেই ফলীন গাছ বলিয়াছেন। যগ্‌ডুমুর, অশথ, বট, তেঁতুল, চন্দন, নাগরঙ্গ (কমলা লেবু), কদম, অশোক, বকুল, বেল, অমৃত (নাসপাতি), কপিত্থক (কত্‌বেল), আম্র, তুঁত, চম্পক, আমড়া, দাড়িম, কুল, নিম, নেবু, খেজুর, সুপারি, নারিকেল, কলা ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশ-রকমের ফলীন গাছের বিবরণ শুক্রনীতিতে দেখা যায়।

শাল, তমাল, কূটজ, অর্জ্জুন, পলাশ, সেগুন, ছাতিম, শমী, দেবদারু, ভূর্জ্জ, হরীতকী, ভেলা আকন্দ, শিমূল, ইত্যাদি গাছের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এগুলি ভারতের অতি প্রাচীন গাছ। শুক্রাচার্য্য তাঁহার নীতি-শাস্ত্রে এইগুলিকেই আরণ্যক নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকে প্রায় চল্লিশ রকমের আরণ্যক গাছের বিবরণ পাওয়া যায়।

ঘরকন্নার কাজে প্রতিদিনই আপনাদের যে-সব গাছের দরকার হয়, তাহা তোমরা জানো। ধান, সরিষা, বাঁশ, আক, পান, মুগ, কড়াই, যব, তিল, ছোলা, মসূর, রসুন, নীল

তূলা, গম, মটর, কুঁচ, রাই,—এই সব গাছ না পাইলে আমাদের সংসার চলে না। শুক্রাচার্য্য এই রকম প্রায় পঁচিশটি গাছকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

অথর্ব্ব বেদ ভারতের খুব প্রাচীন পুস্তক। অনেক হাজার বৎসর আগে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মানুষের উপকারী অনেক গাছ-গাছড়ার উল্লেখ আছে এবং সেই সব গাছের স্তব-স্তুতিও উহাতে লিখিত আছে। পিঁপুল, ডুমুর, অশথ, কুশ, কুল, শিমূল, বট প্রভৃতি অনেক গাছের বিবরণ অথর্ব্ব-বেদে দেখা যায়।

চরক-সংহিতাও ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাও বহু শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। যে-সব গাছ হইতে ঔষধ তৈয়ারি হয়, সেই রকম পাঁচ শত গাছের কথা ইহাতে লেখা আছে। এইগুলিকে দশটি বর্গে ভাগ করিয়া চরক ঋষি তাহাদের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থখানি প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বরাহমিহির রচনা করিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। তাই তিনি সেই দেশেরই গাছপালার বিষয় বৃহৎ-সংহিতার তিনটি অধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সব প্রাচীন পুঁথির মধ্যে শুক্রনীতিতেই গাছপালা পালন করার বিষয় বিশেষভাবে লেখা আছে। এমন কি বাগানে কত হাত অন্তর গাছ পুঁতিতে হয়, কোন্ গাছের গোড়ায় কোন্ সার দিলে ফল ভালো ধরে, গাছের শীঘ্র ফল

ধরাইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য এবং বাড়ীর কোন্ দিকে কোন্ গাছ পোঁতা উচিত, ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি কথাও শুক্রনীতিতে লেখা আছে।

আজকালকার উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে প্রত্যেক গাছের এক-একটি বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই নাম শুনিলে গাছটির প্রকৃতি কি-রকম তাহা একটা অনুমান করা যায়। শুক্রাচার্য্য ফুল, ফল এবং পাতার আকৃতি লক্ষ্য করিয়া কতক-গুলি গাছের বিশেষ বিশেষ নামও দিয়াছেন। অপরাজিতার ফুলের আকৃতি কতকটা গরুর কানের মতো নয় কি? তাই তিনি ইহাকে গো-কর্ণ নাম দিয়াছেন। ধুতুরার ফুলের চেহারা প্রায় ঘণ্টার মতো। তাই ধুতুরার ফুলকে ঘণ্টাপুষ্প নাম দেওয়া হইয়াছে। তা' ছাড়া গাছের গুণ অনুসারে—বিশেষ বিশেষ গাছকে উগ্রগন্ধা, জ্বরান্তক, বাতবৈরী, কৃমিঘ্ন প্রভৃতি বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

পাতা বুঁজিয়া গাছরা কি-রকমে ঘুমায়, তাহা তোমা-দিগকে আগে বলিয়াছি। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতরা ইহা লক্ষ্য করিয়া পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তা' ছাড়া সূর্য্যের আলো অনুসারে গাছরা কি-রকমে নড়া-চড়া করে তাহারো বিবরণ দিয়াছেন। প্রাণীদের মতো গাছদেরও ব্যারাম হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যারামের চিকিৎসা কি, তাহা সকলে জানে না। তাই গাছের চিকিৎসার কথা কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে।

প্রাচীন ভারতে গাছপালার শ্রেণীবিভাগ

অতিপ্রাচীন কালের বড় বড় ঋষিরা গাছপালা সম্বন্ধে কি লিখিয়া গিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ঐ-সব ঋষিদের পুঁথির উপরে বড় বড় পণ্ডিতরা যে-সব টীকা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও গাছপালা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞানের কথা জানা যায়।

বহুকাল আগে আমাদের দেশে চক্রপাণি নামক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি চরকসংহিতার যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত গাছপালাকে বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি এবং বিরুধ এই চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। যে-সব বড় গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল হয় না তাহারাই বনস্পতি। যাহাদের ফুল হয় এবং ফলও হয়, তাহারা বানস্পত্য। যে-সব গাছ ফল হইবার পরে মরিয়া যায়, তাহারা ওষধি। যে-সব গাছের গুঁড়ি এবং ডালপালা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারা বিরুধ। সুতরাং লতা এবং ছোটো-খাটো ঝোপ জঙ্গলকে বিরুধ বলিতে হয়। তা'ছাড়া যে-সব ছোটো গাছকে আমরা গুল্ম বলি, তাহারাও বিরুধ। দূর্ব্বা, ধান, গম, যব ইত্যাদির গাছ ওষধি। কারণ, ফল দিয়াই ইহারা মরিয়া যায়।

সুশ্রুত ও ডহ্লন মিশ্রের গ্রন্থ আমাদের দেশের খুব প্রাচীন পুঁথি। যাঁহারা এগুলির টীকা করিয়াছেন, তাঁহারাও গাছ-পালাকে প্রায় ঐ-রকমে ভাগ করিয়াছেন। আম, জাম, প্রভৃতি যে-সব গাছে ফুল হয় এবং ফল ধরে, তাহাদিগকে ইঁহারা বৃক্ষ নাম দিয়াছেন। গম, যব প্রভৃতি গাছ একবার ফল দিয়াই মরিয়া যায়, তাঁহারা এই সকল গাছকেই ওষধি বলিয়াছেন। দূর্ব্বা ঘাস, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি গাছ ফুল বা ফল না দিয়াই অনেক সময়ে শুকাইয়া যায়। টীকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ এ-গুলিকেও ওষধির কোঠায় ফেলিয়াছেন।

আমরা অনেক গাছের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যাহাদের ফুল হয় না অথচ ফল হয়, এ-রকম গাছ আমরা দেখি নাই। যে-সব ফুলে রঙিন মুকুট নাই এবং যাহাদের ফুল হঠাৎ নজরে পড়ে না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই-গুলিকেই অপুষ্পক গাছ মনে করিতেন। তাঁহারা এই জন্যই পাকুড় (প্লক্ষ) এবং যজ্ঞডুমুর গাছকে "বনস্পতি" অর্থাৎ ফুলহীন ফলের গাছ বলিয়াছেন।

প্রশস্ত-পাদ নামে আমাদের এক অতি প্রাচীন পণ্ডিতের লিখিত একখানি অনেক পুরানো পুঁথিআছে। ইহাতে সমস্ত গাছপালাকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এই ছয় শ্রেণীর নাম,—তৃণ, ওষধি, লতা, অবতান, বৃক্ষ ও বনস্পতি।

কোন্ কোন্ গাছকে ঐ-সব নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রীধর যে টীকা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে।

তাঁহার মতে উলু খড় প্রভৃতি গাছ "তৃণ"। আম প্রভৃতি গাছ "অবতান", রক্ত-কাঞ্চন প্রভৃতি গাছেরা "বৃক্ষ" এবং যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি গাছ বনস্পতি।

মহাপণ্ডিত উদয়ন কুমড়াকে লতার উদাহরণ এবং তাল প্রভৃতিকে তৃণেরই রূপান্তর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

তোমরা বোধ হয় জানো না—আমাদের দেশে অমর-কোষ নামে একখানি খুব প্রাচীন অভিধান আছে। মহা-পণ্ডিত অমরসিংহ বহু শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিয় গিয়াছেন। ইহাতে তিনি নানা রকমের বুনো গাছকে "বনৌষধি" এবং যে-সব গাছ হইতে আমরা ধান, যব, গম ইত্যাদি খাদ্য-শস্য পাইয়া থাকি, তাহাদিগকে "বৈশ্য" নাম দিয়াছেন। তার পরে আবার সমস্ত গাছপালাকে, বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা, ওষধি, তৃণ, তৃণদ্রুম,—এই ছয়টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

অমরকোষের মতে যে-সব গাছে কাঠ জন্মে এবং ফল হয় তাহারি নাম "বৃক্ষ"। যে-সব ঝোপের মতো ছোটো গাছে ফুল ও ফল হয়, তাহারাই ক্ষুপ। ফুল-ওয়ালা লতানো গান এবং যাহাদের দেহে কাঠ জন্মে না, তাহারাই "লতা"। ধান, যব, গম প্রভৃতি গাছেরা ওষধি। ঘাস প্রভৃতি গাছেরা "তৃণ"। তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছেরা "তৃণদ্রুম"। বাঁশগাছের আকৃতি প্রায়ই ঘাসের মতো। তাই অমর-কোষে ইহাকে তৃণধ্বজ অর্থাৎ তৃণদের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে।

গাছপালার জীবনের কাজ

গাছের শরীরে কি-রকমে কোষ সাজানো থাকে, তোমাদিগকে তাহা বলিয়াছি। তা' ছাড়া উহারা কি-রকমে মাটি হইতে রস শোষণ করে এবং বাতাস হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করে, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এত খুঁটিনাটি ব্যাপার জানিতেন না। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া যাহা জানা সম্ভব, তাহার সকলি তাঁহারা জানিতেন।

প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা "সদ্দর্শন সমুচ্চয়" নামে আমাদের একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। গাছরা কখন শিশু থাকে, কখন যুবা হয় এবং কখনই বা বুড়ো হইয়া পড়ে, এই পুঁথিতে তাহার আলোচনা আছে। তা'ছাড়া গাছের খাদ্য-গ্রহণ, বৃদ্ধি, পীড়া, পীড়ার চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধেও নানা কথা ইহাতে লেখা আছে। তা'ছাড়া কোন কোন্ গাছ রাত্রিতে পাতা বুঁজাইয়া ঘুমায় এবং কোন্ গাছরা ছোঁয়াচ পাইলে লজ্জাবতী লতার মতো পাতা গুটায়, এই সব কথাও তাহাতে আছে।

পিতৃফুল-মাতৃফুল এবং পিতৃগাছ-মাতৃগাছ সম্বন্ধে অনেক বিষয় তোমরা শুনিয়াছ। পিতৃকেশরের পরাগ মাতৃকেশরে না ঠেকিলে ফুলে ফল ধরে না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহা জানিতেন। কিন্তু পিতৃফুল-মাতৃফুল এবং পিতৃগাছ-মাতৃগাছ

সম্বন্ধে তাঁহাদের যে জ্ঞান ছিল, তাহার সহিত এখনকার জ্ঞানের মিল দেখা যায় না। তাঁহারা বড় বড় ফুল-ওয়ালা গাছকে পুরুষ এবং ছোটো ফুল-ওয়ালা গাছকে স্ত্রী বলিতেন। তাঁহাদের মতে লতা গাছমাত্রেই স্ত্রী।

জন্তু-জানোয়ারের যেমন চেতনা আছে, আমরা গাছপালার হঠাৎ সে-রকম চেতনা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন, প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও তলায় তলায় গাছপালাদের চেতনা এবং সুখদুঃখের জ্ঞান আছে। আমাদের দেশের মহাপণ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় নানা যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কথারই সমর্থন করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যখন জগদীশচন্দ্রের বইগুলি পড়িবে এবং তাঁহার পরীক্ষা দেখিবে, তখন গাছপালাদের যে সত্যই চেতনা আছে তাহা বুঝিতে পারিবে।

সম্পূর্ণ

নির্ঘণ্ট

ক